বীর বিদ্রোহী

মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা
শিবাজীর জীবন আলেখ্য

ডেনিস্ কিন্‌কেয়্যাড

অনুবাদক :
শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য



ন্যাশন্যাল বুক ট্রাষ্ট, ইণ্ডিয়া,
নিউ দিল্লী

১৯৬০

PUBLISHED BY THE SECRETARY, NATIONAL BOOK TRUST, INDIA, NEW DELHI
AND PRINTED AT THE I. M. H. PRESS (P) LTD. CHANDNI CHOWK, DELHI-6

উৎসর্গ

ডেভিড ফেরার

সমীপেষু

প্রিয় ডেভিড,

তোমার সঙ্গে একত্রে গ্রীসদেশ ভ্রমণ কালে এই পুস্তকের অধিকাংশ লেখা হয়। ইহা তোমার নামে উৎসর্গ করাই শোভন।

চিরন্তন তোমারই

ডেনিস্

ভূমিকা

অধিকাংশ ইংরাজের নিকট সাধারণ জনশ্রুতি এই যে বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ মুঘলদিগের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিতে পান যে ভারতবর্ষে আগত প্রথম যুগের ইংরাজ নেতারা মুঘল-দিগের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া মারাঠাদের সহিত নানা প্রকার বিবাদে রত থাকিতেন তখন তাঁহারা স্বভাবতঃই বিস্মিত হন। তখন হয়তো তাঁহাদের মনে পড়ে স্কুলে পঠিত রোমের ইতিহাসের কথা। ঐ ইতি-হাসের রঙ্গমঞ্চে যদিও রোমকগণই প্রধান অভিনেতা, তথাপি মাঝে মাঝে পিরাস (Pyrrhus), মিথ্রিডাটিস (Mithridates), জুগার্থা (Jugartha) প্রভৃতি বিদেশী বীরগণ ঠিক সময় উপস্থিত হইয়া বাহবা লাভ করিয়াছেন। রঙ্গালয়ে আবির্ভাবের পূর্ব্বে নেপথ্যে তাঁহারা কি করিতেছিলেন তাহা অস্পষ্টই থাকিয়া যায়। অনুরূপ ক্ষেত্রে, ভারতবর্ষের ইতিহাসেও সাধারণভাবে মারাঠা নামে অভিহিত বিবিধ উপজাতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অভ্যুত্থান যখন বলপূর্ব্বক দমন করার প্রয়োজন হয় কেবল তখনই তাহাদের নামের উল্লেখ দেখা যায়। উহাদের মধ্যে যে সব নায়ক দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের ইতিহাসে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন ইতিহাসে তাঁহারা বিদ্রোহী বলিয়া বিকৃত। তাঁহাদের নাম ঠিক ভাবে লেখার আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও উহার বিকৃত বানান করা হইয়াছে। গুয়েডালার (Guedalla) মত বর্তমানকালের উৎসাহী ঐতিহাসিকেরাও ঐ সব নামের ইংরাজী শব্দের উদ্ভট্ উচ্চারণের সমালোচনা করিয়া আমোদ পান। কিন্তু স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় রোমকদিগের অপেক্ষা তাহাদের পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী-দিগের অসম সাহসী কার্য্যকলাপের বৃত্তান্ত জানিবার জন্যই যেমন মনে স্বাভাবিক কৌতূহল জাগ্রত হয় তেমনই ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিবার সময় মারাঠাদিগের অলৌকিক বীরত্বের কাহিনীতে অনেকের মনেই একটা অস্পষ্ট বিস্ময়ের ভাব জাগিয়া উঠে। কারণ, এই মারাঠা

জাতির অভ্যুত্থান ও ভারতবর্ষে ইংরাজ শক্তির প্রতিষ্ঠা প্রায় একই সময় ঘটিয়াছিল, এবং এই মারাঠারাই মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া ইংরাজ ও ফরাসীদিগের সহিত ভারতবর্ষের উপমহাদেশে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের জন্য পুনরায় তীব্র প্রতিযোগিতা করে। ইহারাই আবার সিপাহী বিদ্রোহ নামক স্বাধীনতার যুদ্ধে ইংরাজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ইহাদের মধ্য হইতেই চতুরতম সুদক্ষ বিদ্রোহী নেতা নানাসাহেব ও বীরশ্রেষ্ঠা বিদ্রোহিনী ঝান্সীর রাণীর আবির্ভাব হয়। সর্ব্বজন সম্মানিতা ও ইন্দোরের সুযোগ্যা মহারাণী অহল্যাবাঈ এবং বরোদা রাজ্যের বর্ত্তমান গায়কোয়াড় ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি একান্ত অনুরক্ত গোয়ালিয়ারের ও কোলাপুরের নৃপতিদ্বয়েরও ইহাদের মধ্য হইতেই উদ্ভব।

যে মহান নেতার স্মৃতি ও কার্য্যকলাপ বর্তমান কালের হিন্দুদিগের নব জাগরণে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা দিয়াছে এই পুস্তক মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সেই মহামানবের পরিচয় বর্ণনা করার প্রচেষ্টা মাত্র। জার্মানজাতির দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের প্রতি ও ইতালিয়দিগের গ্যারিবল্ডির প্রতি যেরূপ সশ্রদ্ধ মনোভাব, ভারতবর্ষে অধিকাংশ হিন্দু তাঁহার প্রতি তদনুরূপ মনোভাব পোষণ করে।

সূচীপত্র

"বীর বিদ্রোহী শিবাজী ... ..."

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিঠি পত্রে (বহুবার উল্লিখিত) আখ্যা

"আওরঙ্গজেব শিবাজীকে পার্ব্বত্যমূষিক বলিয়া অভিহিত করিতেন। কি প্রকার সাদৃশ্যের জন্য তিনি এইরূপ আখ্যা দিয়াছিলেন তাহা জানিতে উৎসুক হইয়া আমরা অনেক সময় অবাক হইয়া চিন্তা করিয়াছি ----ব্রেট্ (Brett) লিখিত ফেয়জু (Feyjoo) নামক পুস্তকে ফেয়জু যাঁহাকে ভারতবর্ষের মূষিকরূপে বর্ণনা করিয়াছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা এখন কিছু আভাস পাইয়াছি। উহাতে বুঝিতে পারা যায় যে এই আখ্যা শিবাজীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক এবং তাঁহার সামরিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। তবে এই প্রকার জন্তু ভারতবর্ষে সত্যই আছে কিনা ইহা জানিতে না পারা পর্য্যন্ত আওরঙ্গজেব যে ইহারই সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন এ বিষয়ে যেন আমরা নিঃসন্দেহ না হই।"

ওর্ম্ম (Orme)

প্রস্তাবনা

মারাঠা জাতি

ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্র নামক এক ত্রিকোণ প্রদেশে মারাঠাজাতির বাস। এই তেকোণা প্রদেশের তলার দিক দামন হইতে কারওয়ার পর্য্যন্ত সমুদ্র উপকূলে চলিয়া গিয়াছে এবং ইহার মাথার দিক নাগপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রদেশের উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে প্রায় একটানাভাবে অবস্থিত পশ্চিমঘাট নামক পর্ব্বতশ্রেণী ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চিম দিকের নীচু জমি উর্ব্বরা ও একটু সেঁতসেঁতে। পূর্ব্বদিকের ভূমি শুষ্ক এবং সাধারণতঃ অনুর্ব্বরা। মাটি এবং নগ্ন পাথর পরস্পর যেন এই অঞ্চলে পালা দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। মারাঠা জাতির প্রতিষ্ঠাতাদিগের প্রকৃত আবাসস্থান ছিল ঘাটের পর্ব্বত-শ্রেণীর ঠিক পূর্ব্বদিকের ছায়াতলে উচ্চ পাহাড়মণ্ডিত সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত।

শিবাজীর অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে মারাঠা জাতির বা মহারাষ্ট্র রাজ্যের বিশেষ কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্য এবং পশ্চিম ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে কেহ কেহ মারাঠা প্রদেশে বড় বড় শহর পত্তন করেন এবং খৃষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দীতে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ পশ্চিম ভারতের অসাধারণ সমৃদ্ধির অংশ উপভোগ করিতেন। ইউরোপের সঙ্গে ইহাদের পুরাদমে ব্যবসা বাণিজ্য চলিত। উপকূলের সমস্ত বন্দর নগরীতে গ্রীক বণিকগণের যাতায়াত ছিল এবং বেতনভুক গ্রীক সেনাপতিদিগকে স্থানীয় রাজাদের দরবারে দেখা যাইত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই রাজারা পারস্যের স্থানীয় রাজগণের সহিত দূত বিনিময় করিতেন। তাঁহারা অজন্তার পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া অতি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর মন্দির নির্ম্মান করেন।

দরবারের এবং বাণিজ্যকেন্দ্র সমূহের উদার হালচালের বৈশিষ্ট্যমূলক আবহাওয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও মারাঠাদিগের চরিত্র বর্ত্তমানে যেমন

দেখা যায় অথবা শিবাজীর সময়ও যেমন ছিল তখনও প্রায় সেইরূপই ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে জনৈক চীনদেশীয় পর্য্যটক তাহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:

"আচার-ব্যবহারে তাহারা সরল ও সৎ প্রকৃতির। তাহারা স্বল্পভাষী ও আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন। সদয় ব্যবহারের প্রতিদানে তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কিন্তু কেহ তাহাদের ক্ষতি করিলে তাহারা উহার প্রতিশোধ লয়। আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য তাহারা প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত। বিপদে পড়িয়া কেউ তাহাদের সাহায্য চাহিলে তাহারা নিজ স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া বিপন্নকে সাহায্যে করিতে ব্যস্ত হয়। অপমানের প্রতিহিংসা লইতে হইলেও তাহারা শত্রুকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দেয়। যুদ্ধের সময় তাহারা পরাজিত শত্রুর প্রতি ধাবিত হয় বটে, কিন্তু যাহারা আত্মসমর্পন করে তাহাদিকে ইহারা ক্ষমা করিয়া অব্যাহতি দেয়। .... ইহারা লেখাপড়া করিতে ভালবাসে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন।"

এই পর্য্যটক নিজদেশে প্রত্যাগমন করার অনতিকাল পরে ইরাক হইতে এক আরব সেনাপতি সিন্ধুনদের তীর অনুসরণ করিয়া একদল বিজয়ী সৈন্যের নেতারূপে সিন্ধুপ্রদেশের নিম্নভাগ অধিকার করিয়া উহা ৭২০ খৃষ্টাব্দে বোগদাদের খালিফার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

মুসলমানদিগের ভারতবিজয়ের ইহাই প্রথম সোপান। উত্তর ভারতের হিন্দুরাজ্যগুলি এক এক করিয়া মুসলমানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইল। ভারতবর্ষের আয়তন এত প্রকাণ্ড যে পোপ দ্বিতীয় পিয়াসের (Pius II) সময় ইউরোপের রাজ্যসমূহের পক্ষে মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রতিরোধ করার কাজে যেরূপ অসুবিধা দেখা গিয়াছিল, এখানকার রাজ্যগুলির পক্ষেও মুসলমান বিজেতাদিগের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়া উহা অপেক্ষা অনেক বেশী কষ্টকর হয়। পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সভ্যতা ভারতবর্ষকে জাতীয় সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তির ও আন্তর্জাতিক মিলনের সেতুর সন্ধান দেয়। কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যায় এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতীয় রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে সভ্যতা ও

সংস্কৃতিগত পার্থক্য প্রকট হইয়া পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের যে সম্পর্ক ছিল তাহাও মুসলমানবিজয়ের ফলে বিনষ্ট হইয়া গেল। মহারাষ্ট্র দেশের রাজাদিগের দরবারের চাকচিক্য অনেক কমিয়া যায় এবং উহাতে প্রাদেশিকতার ভাব প্রবল হয়। প্রতিবেশীদিগের ভাষা হইতে মারাঠি একটা পৃথক ভাষায় পরিণত হয়। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে মারাঠি ভাষায় অনুদিত গীতা প্রকাশিত হয়। ইহাই এই ভাষায় প্রথম উল্লেখযোগ্য পুস্তক। ইহার ঠিক চারি বৎসর পরে আফগানদিগের মারাঠা দেশে অভিযান আরম্ভ হয়। সার্দ্ধ তিন শতাব্দী অপেক্ষা করার পরে মারাঠারা শিবাজীর নেতৃত্বে পুনরায় স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়।

মুসলমানবিজয়ে মারাঠা রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান বিলম্বিত হইলেও ইহার ফলে মারাঠারা স্বধর্ম্মের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। এই ধর্ম্ম স্থানীয় কৃষ্ণভক্ত সাধুদিগের প্রবর্ত্তিত মূলনীতি কেন্দ্র করিয়া ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হয়। তাঁহারা প্রচার করিতেন যে সংযম ও ত্যাগদ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব। মারাঠাদের এই ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত এবং বিদেশীদের দ্বারা বহু সমালোচিত নানা প্রকার দেবতা ও উপদেবতার পূজাপদ্ধতির সহিত সাদৃশ্য খুবই কম। ঐ সব পূজা প্রণালী বা আচার বিচার যে হিন্দুধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ তাহাও বলা চলে না। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে করিন্থ (Corinth) নগরীর মন্দিরের পরিবেশের সহিত গ্রীকদিগের ধর্ম্মের যে সম্পর্ক হিন্দুদিগের বাহ্যিক আচার প্রণালীর সহিত প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের সম্পর্কও অনেকটা অনুরূপ। সুমেরিয়া, মিশর, ক্রীট, প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত প্রাচীন ধর্ম্ম ও সভ্যতার সমাবেশে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে হিন্দু ধর্ম্ম তাহারই অদ্যাপি বর্ত্তমান ও অবশিষ্ট শাখা। বিদেশী আর্য্যদিগের প্রবল আক্রমণের সংঘাতে পাশ্চাত্য জগতের ভারসাম্য গভীরভাবে আলোড়িত হয়। ঐ অঞ্চলে স্বর্গের দেবতা বা মহাবীর পুরুষদিগের আবির্ভাবের কল্পনা বন জঙ্গলের দেবতা উপদেবতার অস্তিত্ব লুপ্ত করিয়া দেয়। কিন্তু ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের সহিত সংমিশ্রণের ফল হয় ক্ষণস্থায়ী। ভারতীয় মহাকাব্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত গ্রীক কবি হোমারের বর্ণিত

বিষয়বস্তুর যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও, বর্ত্তমান ভারতের স্তব্ধ গ্রাম্য আবহাওয়া অনেকটা সিন্ধুনদের উপকূলের নাগরিক সভ্যতার সহিত তুলনীয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুভূতি, স্থানীয় দেবদেবতার উপাসনা, সর্প এবং অপদেবতার পূজা, নির্ব্বিবাদে অদৃষ্টবাদ মানিয়া লওয়া, স্ত্রী জাতির প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আদি মনোবৃত্তির বিকাশই উভয়ক্ষেত্রে প্রকাশমান। এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে হরপ্পার পুরাতন সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগুলি ভাবধারা চলিয়া আসিতেছে। সামন্তনীতিতে প্রভাবান্বিত রাজপুতদিগের বীরত্বের ও প্রাসাদের চাকচিক্যের পশ্চাতে রহিয়াছে আর্য্যযুগের আদর্শ, তৃণাবৃত প্রান্তরবাসী গোষ্ঠিসমূহের ঐতিহ্য এবং হিন্দুদিগের দৈনন্দিন জীবনের শান্ত গ্রাম্য আবহাওয়া। এই দেশে মোঙ্গল, আরব, তুর্কী প্রভৃতি বিজাতীয়দের স্বৈরশাসনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হঠাৎ এক সামরিক জাতিরূপে মারাঠাদের আবির্ভাব হয়। কিন্তু তাহাদের শক্তির প্রকৃত উৎস ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসের চিরাচরিত ঐতিহ্য এবং অন্তর্নিহিত দৃঢ় চরিত্রবল। ঐ সব গুণাবলী আশ্চর্য্যরূপে যুগের পর যুগ অপরিবর্ত্তিত ভাবে এই দেশের অধিবাসীদিগকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণীটি আজিকার দিনে কোন ইংরাজ পর্য্যটকের দ্বারা লিখিত হইলেও উহার সত্যতা অক্ষুণ্ণ থাকিত।১

বাস্তবিক ইংরাজ ও মারাঠারা পরস্পরের প্রতি বেশ একটা সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষের উপর অধিকার ও প্রতিপত্তি বিস্তারে এই দুই জাতিই প্রধানতঃ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। মারাঠাদিগের ক্ষমতা চূর্ণ করিতে ইংরাজদিগের তিনবার যুদ্ধ করার প্রয়োজন হয়। ইহা সত্ত্বেও ঐ যুদ্ধে বিজেতাদের প্রতি মারাঠাদিগের যেরূপ বিদ্বেষ ও তিক্ততাবিহীন মনোভাব, ইংরাজদিগের প্রতি তদনুরূপ মনোভাব ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের

---

(১) এই সম্পর্কে Bombay Gazetteer (XVIII) এর নিম্নলিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য :—"ইহারা কঠোর পরিশ্রমী, মিতাচারী, অতিথিপরায়ণ, সাহসী, অপত্যবৎসল এবং বিদেশীদিগের প্রতি সদয়।

লোকের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। প্রথম মহাযুদ্ধে মারাঠাদের অবদানে এই বিষয়ে বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রের পাহাড় অঞ্চলে ভ্রমণ করার সময় অনেক ক্ষুদ্র গ্রামে পর্য্যন্ত যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন ও স্মারকলিপি দেখা যায়। উহা পাঠ করিলে হৃদয় স্বভাবতঃই বিচলিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে কোন গ্রাম হইতে হয়তো এগারটি লোক ইরাক দেশে ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। (অথচ, এই গ্রাম এতই ক্ষুদ্র যে এখান হইতে এতগুলি সুস্থদেহ ও সবল ব্যক্তি কি করিয়া যুদ্ধ করিতে গেল ইহা সত্যই বিস্ময়কর)। অনেক মারাঠা গ্রাম্যযুবক কাট (Kut) অঞ্চলে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে একবার যাহারা বন্দী হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রায় কেহই ফিরিয়া আসে নাই। সাফাই করিয়া যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত তুরস্কেরা এ বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত ছিল।

মারাঠাদের দেহের বর্ণ সাধারণতঃ ময়লা বা তামাটে, কিন্তু তাহাদের মাংসপেশী বেশ দৃঢ় ও শক্ত। তাহাদের চেহারা মোটের উপর মানানসই ও বলিষ্ঠ। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এক বা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে যে পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন আজিও গ্রামাঞ্চলে তাহারা ঐরূপ বেশভূষা পরিধান করে। হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা দ্বিধাবিভক্ত বস্ত্র, বুকের উপর রঙ্গীণ ফিতায় আবদ্ধ এক রকমের কোট, সাধারণতঃ লালরঙের চ্যাপটা পাগড়ি, চটি অথবা লাল জুতা—ইহাই তাহাদের সাধারণ ব্যবহার্য্য পোশাক। মিতব্যয়িতার অজুহাতে অনেক সময় জুতাজোড়া হাতে লইয়াই তাহারা চলাফেরা করে। বৃষ্টির দিনে তাহারা আপাদমস্তক মোটা কালো কাপড়ে আবৃত করিয়া স্কন্ধের একদিকে উহা ভাল করিয়া বাঁধিয়া চলাফেরা করে। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে তাহারা খুব খুঁতখুঁতে। বাসগৃহের সুব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা, সুমার্জিত মেঝে, নিত্য নূতন করিয়া লেপা পোছা, বাড়ীর পাঁচিল, রান্নাঘরে সারিবদ্ধ উজ্জ্বল পিতলের বাসন—ইত্যাদি সব জিনিষই তাহাদের গর্ব্বের বস্তু। স্বীয় দারিদ্র্য বাহিরে প্রকাশ করিতে তাহারা এত লজ্জিত বোধ করে যে ইহা প্রায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। কোন মারাঠার নিকট মাত্র একটি পয়সা অবশিষ্ট থাকিলে সে ঐ পয়সায় মাখন কিনিয়া উহা আঙ্গুলের ডগায় মাখিবে এবং পরে বাসগৃহের সদর

দরজায় বসিয়া এমন ভাবে হাত ধুইবে যে তাহার প্রতিবেশীরা মনে করিবে যেন এই মাত্র সে ভুরিভোজ করিয়া উঠিল।১

মারাঠা স্ত্রীলোকেরা স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা বলে। তাহারা খুব স্পষ্ট বক্তা। তাহাদের মধ্যে পর্দ্দা প্রথা প্রচলিত নাই। বাস্তবিক তাহাদের সাহস, সহিষ্ণুতা ও অদ্ভুত রকমের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ ছুঁড়িবার ক্ষমতার কাহিনী প্রায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। মারাঠা রমণী অনায়াসে কোন অপরিচিত বা বিদেশী ব্যক্তির সহিত কথা বলিবে কিন্তু ঐ ব্যক্তির স্ত্রীলোকের তীক্ষ্ণ বাক্য শুনিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগের তিক্ত-মধুর কথা শুনিয়া মারাঠা পুরুষেরা হাসিয়া আনন্দ উপভোগ করে। উগ্রভাষিণী রমণী তাহার প্রতি অতিশয় তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তরেও অসন্তোষ প্রকাশ করিবে না; বরং তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কেহ ঠাট্টা করিলে সেও অন্য সকলের সঙ্গে হাসি তামাসায় যোগ দিয়া আমোদ অনুভব করিবে। মারাঠা রমণীকে দেখিয়া কেহ 'আহা মরি সুন্দরী' বলিয়া আখ্যা দিবে না, তবে একথা স্বীকার্য্য যে প্রায়ই তাহাদের চেহারায় অসাধারণ সৌষ্ঠব ও সুসামঞ্জস্য দেখা যায়। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সযত্নে পরিহিত তাহার লম্বা শাড়ীর পোশাকে তাহাকে গ্রীক দেশীয় টানাগ্রায় (Tanagra) নির্ম্মিত মর্ম্মর মূর্ত্তির মত মাধুর্য্যমণ্ডিত দেখায়।

মারাঠা গ্রামগুলি সাধারণতঃ স্থানীয় মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ভাস্কর্য্য শোভিত মন্দিরটি সাধারণতঃ পিঙ্গলবর্ণের পিপুল গাছের ছায়ার তলে অবস্থিত। প্রায় সব বাড়ীই একতলা। উহাদের ছাদ খড়ে প্রস্তুত। কিন্তু মাঝে মাঝে কতকগুলি ছাদ খাড়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। উহা অনেকটা সুইট্জারল্যাণ্ডের ঢেউখেলান টালির কুটিরের মত দেখায়। জানালার, বারান্দার এবং দরজার কাঠের কাজের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ঐগুলির মধ্যে খোদাই করা কারু-কার্য্য অতি সুন্দর। ধনীগৃহস্থের বাটিতে (অবশ্য গ্রাম্য জীবনের

---

(১) "Tribes and Castes of the Bombay Presidency" (Bom. Govt. Press)

মাপকাঠিতে ধনী) দেওয়ালের গায়ে রঙ্গীণ চিত্রাঙ্কণ দেখা যায়। সাধারণতঃ এই সব চিত্রের বিষয়বস্তু হইল পীতবর্ণের গোক্ষুর শাপ, ঈষৎ নীল রঙের হাতী, অথবা বংশী-বাদনরত বালক শ্রীকৃষ্ণ।

দিবসে অধিকাংশ সময় কর্ম্মব্যস্ত পুরুষেরা শষ্যক্ষেত্রে কাটায়। সন্ধ্যায় তাহারা মন্দিরের সম্মুখ প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া ধূমপান করে ও পরস্পরের মধ্যে এলাচি দানা প্রভৃতি মসলা বিনিময় করিয়া চিবায়। গ্রামের নেতৃস্থানীয় বৃদ্ধ পূর্ব্বস্মৃতি মন্থন করিয়া আগেকার দিনের শস্যের আপেক্ষিক উৎকর্ষ ও বৃষ্টির প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে গল্প করেন। গ্রাম্য শিক্ষক উচ্চৈস্বরে কুঞ্চিত সংবাদপত্র পাঠ করেন। সন্ধ্যার পর রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে গ্রামের গায়ক বীণা তুলিয়া স্বজাতীয় বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজীর জীবন কাহিনী গান করেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া শোনে।

প্রথম খণ্ড

বাল্য ও যৌবন

প্রথম অধ্যায়

শিবাজীর পরিবারবর্গ রাজা পুরু এবং উদয়পুরের রাণাদিগকে মিশ্র বংশ বলিয়া দাবি করেন। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়ে ভারতবর্ষে রাজা পুরুই প্রথম বাধা দেন। আপাতঃদৃষ্টিতে কিন্তু শিবাজীর পরিবারের এই দাবি জুলিয়ান্ বংশ যেমন ট্রয় রাজবংশ হইতে অভ্যুদয়ের দাবি করিতেন তেমনই অলীক বলিয়া মনে হয়। কারণ, সেকেন্দর শাহের বীরত্ব কাহিনী আজিও ভারতীয়দের মনে বিস্ময় ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। বেলুচিস্থানে এখনও নাট্যমঞ্চের নৃত্যরত সুলতানদের মত সুবৃহৎ পাগরি পরিহিত ভূস্বামীগণ বলিয়া থাকেন যে বিগত শতাব্দীর কোন সময়ে সেকেন্দর শাহ তাঁহাদের গ্রামের ভিতর দিয়াই বিজয় অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা সত্য কথা বলিবার ভান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহাও বলিবেন, "আমার অবশ্য সব কথা স্মরণ নাই কারণ আমি তখন খুবই ছোট ছিলাম।" কাজেই উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এ বিষয়ে সুবিচারক ঐতিহাসিক ওর্মের উক্তিই মানিয়া লওয়া সমীচীন। তাঁহার মত এই যে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ চিতোর রাজবংশ পুরু হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন বটে কিন্তু উহা কোন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না।

তবে শিবাজীর শত্রুপক্ষ ব্যতীত অনেকেই তাঁহার বংশ যে উদয়পুর রাণাবংশের সহিত সম্পর্কিত একথা অস্বীকার করেন না; শিবাজীর সমসাময়িকেরাও এই মতের উপর আস্থা প্রকাশ করিতেন। উদয়পুর রাজ্যে ভোসাবেত জমিদারীতে ভোঁসলে নামক এক শাসক পরিবার বাস করিতেন। উদয়পুর মুসলমানদিগের দ্বারা প্রথম বিজিত হওয়ার পরে সজনসিংহ নামক ভোঁসলে পরিবারের এক যুবক রাজপুরুষ ভাগ্যের অন্বেষণে দক্ষিণ দিকে পলায়ন করেন। পরে এই ভোঁসলে পরিবার মহারাষ্ট্র

দেশে বেতনভূক সৈন্য হইয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহারা কোন কোন স্থানীয় মুসলমান রাজাদের পক্ষে অর্থের বিনিময়ে কখনও কখনও যুদ্ধ করিতেন।

নীতিগতভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমানগণই দিল্লীর বাদ্‌শাহের আনুগত্য স্বীকার করিতেন। পরবর্ত্তী রোমক সম্রাটগনের মত দিল্লীতেও বিভিন্ন রাজবংশ হইতে বাদশাহগণের উদ্‌ভব হইতে থাকে। কিন্তু মহম্মদ তোগলক বাগদাদের খলিফার নিকট হইতে সার্ব্বভৌম সনদ পত্র লাভ করার পরে দিল্লীর বাদশাহ নামতঃ ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া গণ্য হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে প্রান্তিক প্রদেশগুলি সর্ব্বদাই অল্পবিস্তর স্বাধীনতা দাবী করিত। রুশ দেশের সম্রাট প্রথম পলের ন্যায় মহম্মদ তোগলকের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক ভাবে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলে বাহমনি নামক একটি নূতন রাজবংশ স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতালী দেশে রোমকসাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার পরে পূর্ব্ব এবং পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল বাহমনি রাজ্যের সহিত দিল্লীর সুলতানদের সম্পর্ক প্রায় সেইরূপই ছিল। খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রধান নেতৃবর্গ সাময়িক ভাবে পশ্চিম ইউরোপের কোন কোন প্রদেশ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য গথ (Goth) নামক আক্রমণকারীগণের হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু জাষ্টিনিয়ানের ন্যায় পরাক্রান্ত সম্রাটেরা সুযোগ পাইলেই ঐ সব প্রদেশের উপর সার্ব্বভৌম দাবি পুনরুত্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, ঐ প্রদেশগুলিতে তাঁহারা সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতেন।

প্রায় দুইশত বৎসর দুর্ব্বল শাসকগণ দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় থাকায় দেশে প্রায়ই অরাজকতা লাগিয়া থাকিত। তৈমুরলঙ্গের আক্রমণে ও ব্যাপক হত্যার ফলে কখনও কখনও নৃশংস উত্তেজনার সৃষ্টি হইত। উত্তর ভারতের এই ভয়াবহ অবস্থার সহিত দক্ষিণে বাহমনি রাজ্যের শান্তিপূর্ণ শাসন পদ্ধতির তুলনামূলক বৈষম্য স্বভাবতঃই দৃষ্টিগোচর হইত। ইতালীতে সম্রাট থিওডরিকের সুশাসনের সহিত সমসাময়িক বলকান রাজ্যে অ্যানাস্টাসিয়াসের কুশাসনের সহিতই ইহার তুলনা চলে। কিন্তু

পরে একদিকে যেমন গথিক রাজ্যসমূহ ভাঙ্গিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল ও বাইজেনটিয়াম সাম্রাজ্য পরাক্রান্ত নূতন রাজবংশের অধীনে তরুণ ও সুস্থশক্তিতে উদ্‌ভূত হয়, অপর দিকে তেমনই একদা শক্তিমান বাহমনি রাজ্য গোলকোণ্ডা, বিজাপুর, আহমদনগর, বেরার এবং বিদার নামক পাঁচটি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে; এবং ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মুঘল রাজবংশের প্রথম সম্রাট বাবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। দাক্ষিণাত্যের এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে একটিরও পুনরুজ্জীবিত মুঘলসাম্রাজ্যের সহিত সমকক্ষতা করিবার ক্ষমতা ছিল না। এই রাজ্যগুলির মধ্যে সর্ব্বদা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। কেবল দক্ষিণের শেষ হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধ করিবার উদ্দেশে তাহারা স্বল্পকালের জন্য নিজেদের কলহ বন্ধ করে এবং একযোগে এই রাজ্যটি আক্রমণ করিয়া উহা একেবারে বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু বৃহৎ মুঘলসাম্রাজ্য ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে প্রসারতা বিস্তার করা স্বত্ত্বেও বাহমনি রাজ্যগুলি নিজেদের একতা রক্ষা করিতে পারিল না। বেরার রাজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়াই মুঘল সাম্রাজ্যের আয়ত্তে চলিয়া যায়; বিজাপুর রাজ্য বিদার জয় করিয়া উহা নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। অতঃপর একদা বিশাল বাহমনি সাম্রাজ্যের অবশিষ্ঠ মাত্র তিনটি অংশ—গোলকোণ্ডা, বিজাপুর ও আহমদনগর স্বাধীন রহিল।

শিবাজীর পিতামহের নাম মালোজি। উদয়পুর হইতে আগত তাঁহার অন্যান্য পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় মালোজিও একজন বেতনভূক সৈনিক ছিলেন। তিনি আহমদ্‌নগরের নবাবের সেনাদলে ভর্তি হইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার প্রার্থনা শীঘ্রই পূর্ণ হয় এবং তিনি ঐ রাজ্যের একজন বিশিষ্ট অমাত্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর পিতা শাহজীর জন্ম হয়।

আহমদনগর দরবারে তখন অনেক মারাঠী রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। লাখোজী নামক একজন ধনী ভূম্যধিকারী ছিলেন তাহাদের মধ্যে প্রধান। স্থানীয় হিন্দুসমাজের তিনি বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। যে কোন বৃহৎ উৎসবে তাঁহার গৃহ ও প্রাঙ্গন হিন্দুগণের নিকট উন্মুক্ত থাকিত। ১৫৯৯

সালে লাখোজীর বাড়ীতে মহা আনন্দে হোলী বা বসন্ত উৎসব সম্পন্ন হইতেছিল। তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গনে বাদ্যের তালে তালে নৃত্যরত বালকগণ বিশ্বস্রষ্টার উদ্দেশে নাচগান করিতেছিল। আমোদ-উন্মত্ত নিমন্ত্রিত অতিথিগণ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী হাসি তামাসার সহিত একে অন্যের বস্ত্রে উজ্জল রঙ্গীন বারি সিঞ্চন করিয়া পরস্পরের অনুধাবন করিতেছিলেন। ছোট ছোট ছেলেরা কারুকার্য্যমণ্ডিত তোরণ শ্রেণীর স্তম্ভের চারিদিকে বসিয়া বয়োবৃদ্ধদের লঘু আমোদপ্রমোদের মাতামাতির দৃশ্য অবাক হইয়া দেখিতেছিল। এইসময় গৃহস্বামীর পাঁচ বৎসর বয়স্কা কন্যা জীজাবাই বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুকরণে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া সকলের গায়ে রঙ ছিটাইতে লাগিল। তরুণ শাহজীও দেখাদেখি মেয়েটির সবুজ ও সাদা পোষাকে রঙ ছড়াইয়া দিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এই দুই বালক-বালিকার পোষাক একেবারে রঙীণ হইয়া গেল। তাঁহাদের হাস্যোজ্জল চোখ ও লাল টুকটুকে মুখ দেখিয়া লাখোজী মুগ্ধনেত্রে বলিয়া উঠিলেন "আহা এই দুইটি ছেলে মেয়েকে কি সুন্দরই না মানাইয়াছে।"

অবিবেচক ও উচচাভিলাষী মালোজী এরূপ সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লাখোজির এই উচ্ছ্বসিত বাক্যের প্রতি উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ঘোষণা করেন যে ইহা দ্বারা তাহার ছেলের সঙ্গে লাখোজীর মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল।

অল্প বয়সের ছেলেমেয়ের বিবাহে বাগ্‌দান প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত বটে তবে এই প্রকার বাগ্‌দানের পর বিবাহ সাধারণতঃ অনেক বৎসর পরে অনুষ্ঠিত হয়। এমন কি বিবাহ হওয়ার পরেও স্বামী এবং স্ত্রী নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যায় এবং পরিণত বয়স প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের মিলনের সুযোগ হয় না। কিন্তু একবার বাগ্‌দান হইয়া গেলে উভয়পক্ষের প্রতিশ্রুতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। এ বিষয়ে হিন্দু সমাজের অনুশাসন খুবই কঠোর।

আহমদনগর রাজদরবারের প্রধান হিন্দু আমির লাখোজী কোন বেতনভুক সৈনিকের পুত্রের সহিত নিজ কন্যার বিবাহের কথা স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। তাঁহার সাময়িক উচ্ছ্বাসের এরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। প্রথমতঃ তিনি কথাটা প্রায়

হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পরদিন প্রাতে মালোজী তাঁহার নিকট আনুষ্ঠানিক ভাবে বাগ্‌দান প্রস্তাবের সমর্থন দাবি করেন। লাখোজী এই প্রস্তাব অস্বীকার করায় মালোজী অপমানে ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন।

ক্রমে কথাটা নবাবের কানেও পৌঁছিল। লাখোজীর মত অনুগত ও সম্ভ্রান্ত আমির এবং মালোজীর মত দক্ষ—সৈনিক্। এই দুইজনের মধ্যে কাহাকেও হারাইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এই অবস্থায় আপোষ মীমাংসার মনোভাব লইয়া সুলতানের পদের মধুর মর্য্যাদা অনুযায়ী তিনি মালোজীকে পাঁচহাজারী মনসব্‌দারের পদে উন্নীত করিলেন এবং তাঁহাকে একটি জায়গীর উপঢৌকন দিলেন। পদমর্য্যাদায় ও সম্পদে লাখোজীর সমান না হইলেও মালোজী অগৌণে বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। নবাবের অনুরোধে লাখোজীর মন ক্রমে নরম হইয়া আসিল এবং তিনি শাহজীর সহিত তাঁহার কন্যা জীজাবাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবে প্রথামত রাজী হইলেন। বছর ছয়েক পরে এক শুভলগ্নে বিবাহ কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইল। আরও তিন চার বৎসর পর বিবাহিত দম্পতি একসঙ্গে বাস করিতে লাগিল। অল্পদিন পরে জীজাবাইয়ের একটি পুত্র সন্তান হইল। তাহার নাম হইল শম্ভুজী।

পিতার ন্যায় শাহজীও আহমদনগরের নবাবের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৬৩৬ সালে আহমদাবাদ রাজ্যের পতন হইলে শাহজী বিজাপুর রাজ্যের সৈন্য বিভাগে যোগ দিলেন। বিজাপুর নবাবের অনুমতিক্রমে পৈত্রিক জায়গীরের উপর শাহজীর স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল।

দক্ষিণ ভারতের মূল পাঁচটি মুসলমান রাজ্যের মধ্যে এখন গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর এই দুইটি রাজ্য মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এই দুইটি সামন্তরাজ্য নামতঃ দিল্লীর বাদ্‌শাহের হইলেও কার্য্যতঃ তাহারা স্বাধীন ছিল। নামমাত্র প্রভুত্বকে কার্য্যতঃ পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাট শাজাহান আহমদনগর রাজ্যের প্রায় সমস্ত অংশ অধিকার করিয়া আরও দক্ষিণে বিজাপুর রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাদশাহী সৈন্যের অগ্রগতির পথে পড়িল শাহজীর পৈত্রিক জায়গীর। শাহজী কিছুকাল বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া পরে দক্ষিণ দিকে বিজাপুর রাজ্যে চলিয়া

গেলেন। সঙ্গে লইয়া গেলেন তাঁহার শিশুপুত্র শম্ভূজীকে। কিন্তু পিছনে পড়িয়া রহিল তাহার জায়গীর আর তাঁহার পত্নী জীজাবাই। জীজাবাই তখন দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিবনের গিরিদুর্গে জীজাবাই আশ্রয় লইলেন। দুর্গের অর্দ্ধভগ্ন প্রাচীরের চারিপাশে কতিপয় বিশ্বাসী অনুচরেরা সর্ব্বদা পাহারা দিত। প্রাচীরের বাহিরে ছিল শ্বাপদ-সঙ্কুল বন এবং বসতি-শূন্য অনুর্ব্বর ও আগাছায় পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় কেমন যেন একটা হতাশার ভাব। প্রভাতে দুর্গদ্বার অতি সতর্কতার সহিত খোলা হইত। ঐ সময় দলবদ্ধভাবে মেয়েরা কুয়াশার মধ্য দিয়া গিরি নির্ঝরিণী হইতে কলসীতে করিয়া পানীয় জল আনিবার সময় প্রায়ই লালমাটিতে বন্য ভল্লুকের পরিষ্কার পদচিহ্ন দেখিতে পাইত।

জীজাবাইয়ের বর্ত্তমান বাসস্থান ছিল সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ গিরিদুর্গের মধ্যে একটি জীর্ণ কুটির। লুঠতরাজকারী দস্যু ও হিংস্র জানোয়ারের ভয়ে কেহ দুর্গের দরজার বাহিরে বেশীদূর আসিতে সাহস করিত না। এই নির্জন বন্য পরিবেশের মধ্যে তাঁহার ক্ষুদ্র বাসস্থানের দারিদ্র্যের সহিত পৈত্রিক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বিশাল অট্টালিকার পার্থক্য মাঝে মাঝে জীজাবাইয়ের মনে পীড়া দিত। কিন্তু নিম্নের সমতলভূমি অপেক্ষা এই স্থান অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল। কারণ ওখানে সীমান্ত দেশের প্রতি মাইল ভূমির জন্য বাদশাহী ও বিজাপুরের সুলতানের সৈন্যগণ সর্ব্বদা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। দুই দলের সৈনিকগণের অধিকাংশই ছিল বেতনভুক ও বিদেশী। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ছিল আরব, পাঠান্, তুর্কী, আফগান ও হাবশী জাতীয়। ভাগ্যের অন্বেষণে এদেশে ইহারা চাকুরী করিতে আসিত। তাহাদের বেতন প্রায়ই বাকি পড়িয়া থাকিত। এ অবস্থায় তাহারা হিন্দুচাষীদিগকে ধাওয়া করিয়া তাহাদের শস্য সামগ্রী বিধ্বস্ত করিত ও তাহাদের গরুবাছুর, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি লইয়া পলায়ন করিত। অত্যাচারিত জনগণ ঐ সৈনিকগণের শত্রুরাজ্যের প্রজা কিংবা মিত্ররাজ্যের

প্রজা তাহা ইহারা কখনও ভাবিয়া দেখিত না। এইরূপ অত্যাচারের ফলে জমির চাষ অনতিবিলম্বেই বন্ধ হইয়া যাইত এবং শেষ পর্য্যন্ত যাহারা টিকিয়া থাকিত তাহাদের পক্ষে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না।

এইরূপ অস্থায়ী নিরাপত্তার আবহাওয়ায় জীজাবাই নিজকে কোনরূপে মানাইয়া লইয়া পুত্রের জন্মের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি ছিলেন অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণা রমণী। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকগণের জন্য নির্দ্ধারিত নিয়ম তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে লাগিলেন। কুটি-রের প্রাচীর গাত্রে এবং দেরাজে তিনি সিঁদুর দিয়া ত্রিকোণ আঁকিয়া তাঁহার উপর বিশ্বজননীর পূজার জন্য প্রতিদিন মধু, গুড়, ঘি প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজাইয়া রাখিতেন।১ দুর্গের সৈন্যগণ উদ্বিগ্নভাবে সর্ব্বদা গিরিশ্রেণীর পাহারায় ব্যস্ত থাকিত। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে জীজাবাই কেমন একটা পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়াই দিন কাটাইতেন। স্বপ্নে তিনি শুনিতে পাইতেন তাঁহার অনাগত পুত্রের খ্যাতি এবং গৌরবের ভবিষ্যত বাণী।

সমসাময়িক ভারতবর্ষে একমাত্র জীজাবাই-ই যে এইরূপ জল্পনা-কল্পনার বশবর্ত্তী হইতেন এমন নহে। দক্ষিণ ভারতের জনগণের মনে তখনও হিন্দুদিগের স্বাধীনতার স্মৃতি জাগরূক ছিল এবং হিন্দু-রাজত্বের পুনরভ্যুত্থানের আশা তখনও নির্বাপিত হয় নাই। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিদ্যুৎবেগে এবং রহস্যজনকভাবে গুজব ও সতর্কবাণী গতায়াত ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে সিপাহী যুদ্ধের অনতি-পূর্ব্বে চাপাটির মাধ্যমে সংবাদ প্রচারের কাহিনী স্মরণীয়। শিবাজীর জন্মের কয়েকমাস পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতের অনেক গ্রামে সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে একটি অদ্ভুত বাণী প্রচার হইতেছিল। তাহার মর্ম্মার্থ :—
"মুক্তি আগত। রমণীগণ আনন্দ সঙ্গীতে উহা অভিনন্দন করুন; স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পুষ্পবৃষ্টি হউক - - - -" ২

---

(১) এই সব আচার ব্যবহারে সম্বন্ধে Enthoven-কৃত "Folklore of Bombay Presidency (O. U. P.) এই গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(২) Wilkes : Mysore, Ranad.

১৬২৭ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে জীজাবাইয়ের দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। তিনি পুত্রের নাম রাখিলেন শিবাজী। হিন্দুগণের জীবন-নাট্যের রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন সময়ে অনেক অনুষ্ঠান পালিত হয়। পুত্রের জন্ম উপলক্ষ্যেও নানাপ্রকার জাঁকজমক সহ উৎসব ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। ইহা সম্পন্ন করার প্রধান অধিকার হইল পিতার। কিন্তু জীজাবাইএর দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম সময়ে এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হইল কারণ শিবাজীর পিতার তো শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন তখন বহু দূরে। এদিকে জানালা দরজা বন্ধ প্রভৃতি আগার আগুন জ্বালাইয়া পবিত্র করা হইতেছিল। উহার অনিশ্চিত শিখায় পুরোহিতগণের পর্য্যবেক্ষণশীল মুখমণ্ডল কখনও কখনও অদ্ভূত রকম পরিষ্কার ভাবে প্রতিভাত হইতে-ছিল। দুঃসহ বেদনার অবসানের পর জীজাবাই যখন নীরবে শায়িত ছিলেন তখন তিনি হয়ত পতির অনুপস্থিতি ও নিজের অসহায় নিঃসঙ্গতা নূতন করিয়া অনুভব করিতেছিলেন। নবজাত পুত্র সন্তানকে কুলার উপর শয়ন করাইয়া তাহার মস্তক চুম্বন এবং সোনার আংটির মধ্য দিয়া শিশুর মুখে মধু গলাইয়া দেওয়া প্রভৃতি হিন্দুপ্রথানুযায়ী পিতার করণীয় কর্ত্তব্যগুলি শাহজীর প্রতিনিধিরূপে নিশ্চয়ই অন্য কেহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১

শিশুর জন্মগ্রহণের কিছুকাল পরে অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হইল ভবিষ্যতে তাঁহার কি বৃত্তি হইবে পরীক্ষা করা। ইউরোপীয় দেশ সমূহে অবশ্য ইহার প্রচলন নাই। ভারত-বর্ষের ইহা একটি আঞ্চলিক অনুষ্ঠান। বালকটিকে একটি কার্পেটের আসনে বসাইয়া তাঁহার সম্মুখে কলম, তরোয়াল প্রভৃতি খেলনা ছড়াইয়া রাখা হয়। ঐ জিনিষগুলি ভবিষ্যত মানুষের বৃত্তির প্রতীক। যেমন, কেরাণীর পেশা হইল কলম, সৈনিকের পেশা তরোয়াল, ইত্যাদি। এই অনুষ্ঠানের মর্ম্ম এই যে ছেলেটি যে জিনিষটি হাত দিয়া ধরিতে উদ্যত

(১) Kincaid and Parasnis', *History of the Maratha People.*

হইবে তাহার মাতাপিতা তাহাকে তদনুযায়ী বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা দিবেন। ছেলেটির হাত কোনদিকে চলা উচিত, ইহা অনেক সময়ে পুরোহিতগণ আকার ইঙ্গিতে নির্ণয় করিয়া দেন। কিন্তু শিবাজীর সম্বন্ধে একথা অনায়াসে বলা যায় যে কোনরূপ ইঙ্গিত না পাওয়া সত্ত্বেও তিনি তরোয়ালের দিকেই হাত বাড়াইয়াছিলেন। বাস্তবিক তরোয়ালই ছিল তাহার বংশের ও জাতির মর্য্যাদানুযায়ী যুদ্ধ ব্যবসায়ের প্রতীক।

এদিকে মুঘল বাদশাহের প্রধান সেনাপতি শাহজীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে তখনও খুব ব্যস্ত। কারণ স্থানীয় জমিদারগণকে গেপ্তার করিয়া সম্রাটের বশ না করা পর্য্যন্ত কোন এলাকা সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইত না। শাহজী ঐ অঞ্চল হইতে চলিয়া গিয়া বিজাপুর শহরে নিরাপদে অবস্থান করিতেছেন এই সংবাদ পাওয়া মাত্র মুঘল সেনাপতি শাহজীর স্ত্রী ও পুত্রকে ধরিবার জন্য নিকটস্থ এলাকায় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

শিবাজীর মাতা যে দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন উহার পক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। শুধু একমাত্র ভরসার কথা এই যে বাদশাহের পর্য্যবেক্ষণকারী সৈন্যদলের পক্ষে জীজাবাইয়ের আশ্রয়স্থল অনুসন্ধান করিয়া বাহির করার সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত। কাজেই জন্মিবার কিছুকাল পরে শিবাজী প্রথম প্রথম যে সব কথা শুনিতে পাইতেন তাহা ছিল অতিশয় ভয় ও উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক। বিপদাশঙ্কা এবং ক্ষণকালের জন্য উহার নিবৃত্তি এই অবস্থার মধ্য দিয়া শিবাজীর বাল্যকাল অতিবাহিত হইতে লাগিল।

শিবাজীর ছয়বৎসর বয়সের সময় একদিন আকস্মিক ভাবে বিপদ উপস্থিত হইল। উৎকোচের বসে পার্ব্বত্য উপজাতি কোনদলের লোকেরা জীজাবাইয়ের গোপন বাসস্থানের সংবাদ মুঘলদিগের নিকট বেফাঁস করিয়া দিয়াছিল অথবা মুঘলেরা দৈবক্রমে উহার সন্ধান পাইয়াছিল----ইহা এখনও অজ্ঞাত। তবে একথা ঠিক যে মুঘলেরা জীজাবাইকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইল বটে কিন্তু তাহারা শিবাজীর সন্ধান পাইল না। সম্ভবতঃ এইটুকু জানা যায় যে আসন্ন বিপদের সংবাদ যথাসময়ে দুর্গে পৌছায়।

এবং জীজাবাই যখন আক্রমণকারীদের সহিত বাদানুবাদ করিতেছিলেন সেই অবসরে কোন বিশ্বাসী ও অনুগত ভৃত্য শিবাজীকে কোলে করিয়া দুর্গের পিছনদিকের দরজা দিয়া দৌড়াইয়া জঙ্গলের ভিতর চলিয়া যায়।

মুঘল সেনাপতি এই সময় তাঁহার প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিলেন ত্রিম্বক নামক একটি সহরে। এই নগরীর পিছনে বিশাল গিরিমালার একটি নির্ঝর হইতে পুণ্যতোয়া গোদাবরীর নদীর উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া এই স্থানটি হিন্দুগণের নিকট বিশেষ পবিত্র। কৃষ্ণ পাথরে নির্ম্মিত অনাড়ম্বর সারিসারি বিশাল মন্দিরের অট্টালিকা, মন্দির প্রাঙ্গনে পুষ্প-শোভিত জাকরন্দা (শালবনি) বৃক্ষ, শহরের প্রধান রাজপথের গায়ে প্রবাহিনী প্রভৃতির মিলনে বর্ত্তমানকালেও এই স্থানটি অতিশয় মনোরম কিন্তু যেদিন মুঘল সৈনিক পরিবৃত শিবিকায় আরোহন করিয়া জীজাবাই বিশাল সিংহদ্বারের উন্মুক্ত দরজার মধ্য দিয়া এই নগরে প্রবেশ করেন তখন ইহার গৃহ সমূহ ছিল ধ্বংসোন্মুখ ও রাজপথ ছিল জনহীন। ভয়ে ও হতাশায় জীজাবাইয়ের প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছিল। যে শত্রু-পক্ষ তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে তাহারা কি তাঁহার ছেলেকে খুঁজিয়া বাহির করিবে না?

মুঘল সৈন্যাধ্যক্ষ অবশ্য এই শ্রেণীর সেনাপতিগণের অপেক্ষা অনেক দয়ালু ছিলেন। কিন্তু এই ঘটনাটির প্রতি উদাসীনতাই তাঁহার দয়া প্রদর্শনের প্রকৃত কারণ। জীজাবাইকে শাহজীর প্রতিভূরূপে বন্দী করিয়া রাখাই ছিল তাঁহার আসল উদ্দেশ্য। সম্ভবতঃ তিনি বিজাপুরে শাহজীর দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্র শিবাজীর কথা স্বতন্ত্র। পুত্রটিকে করায়ত্ব করিতে পারিলে পিতাকে সঙ্গে সঙ্গে আসিতেই হইবে। তিনি পাহাড়ে পাহাড়ে পর্য্যবেক্ষণকারী সৈন্য-দিগকে দ্বিগুন করিয়া এ বিষয়ে স্বচেষ্ট হইতে আদেশ দিয়া জীজাবাইকে প্রহরীগণের জিম্মায় নগরদুর্গে পাঠাইয়া দিলেন।

মুঘলদিগের অনুসরণ সত্ত্বেও অনুরক্ত ভৃত্যেরা শিবাজীকে তিন বৎসর ধরিয়া নির্জন পার্ব্বত্য ভূমির অভ্যন্তরে স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া বেড়াইতে লাগিল। পাহাড়ের উচ্চ উচ্চ চূড়ার পাদমূলে এই সঙ্কীর্ণ গিরিপথগুলি আজিও পথিকের নিকট গোলকধাঁধার মত মনে হয়।

এখানকার বদ্ধ স্যাঁতস্যাঁতে হাওয়ায় শ্বাস প্রশ্বাস লওয়াও কষ্টকর। তরঙ্গায়িত মালভূমির উপর চলিতে গেলে পীতবর্ণের কাঁটাঘাসে পায়ের হাটু অবধি কাটিয়া যায়। জমিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের মধ্যে পাতাবিহীন ঝাড় গাছ কোনরকমে গুড়ি সুরি দিয়া পাথরগুলিকে সঙ্কটাপন্নভাবে আঁকড়াইয়া আছে। ঘনবিন্যস্ত বনের মধ্যে অসংখ্য তরু-বীথিকা চলিয়া গিয়াছে। মাটিতে পচা গলিত পাতার গালিচায় প্রতি পদক্ষেপে প্যাচ প্যাচ শব্দ হইতে থাকে। চারিদিকেই যেন কেমন একটা মধ্যাহ্নকালীন রুদ্ধশ্বাস ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ অনিশ্চয়তার ভাব সর্ব্বদা বিরাজমান।

এই পার্ব্বত্য দেশে বড় কনকনে শীত। প্রায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বৃক্ষাদি ঘন কুয়াশায় ঢাকিয়া থাকে। ফলে পাহাড়ের লোকগুলিও দুপুর বেলায় অসাড় মাছির মত ধীরে ধীরে রৌদ্রে বাহির হইয়া শীতক্লিষ্ট হাত পা ছড়াইয়া স্বস্তি পাইতে চায়। মে মাসের শেষার্দ্ধ হইতে আরম্ভ হয় দীর্ঘকালব্যাপী বর্ষণ। রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষতার পর ইহা বেশ ভালই লাগে। কিন্তু অনতিকাল পরেই গিরিগহ্বরগুলি ঘন কুয়াশায় আবৃত হইয়া যায় এবং পেচকের সঙ্গে সঙ্গে তমসাবৃত বনের মধ্যে হইতে পেচকের আর্ত্ত চীৎকার আসন্ন ভয়াবহ ঝটিকার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে। আকাশে রক্তাভ মেঘমালা ক্রমে উঠিতে থাকে। হঠাৎ চারিদিকে নিস্তব্ধতা ও চাপা আবহাওয়া। তারপরেই প্রথম বজ্রনির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য সমুদ্রের মর্ম্মভেদী বাত্যার ন্যায় প্রবল ঝড়ে বৃক্ষাদি লুণ্ঠিত হইয়া নিনাদ করিতে থাকে এবং বর্ণহীন শুষ্কপ্রায় ডালপালা ভেদ করিয়া প্রবল বারিপাত নীচের তৃণদল ভাসাইয়া ও পাহাড়ের চূড়া ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র-কুটিরের চালের উপর জয়ঢাকের বাদ্যের মত কলরব ধ্বনিতে দিগন্ত কম্পিত করিয়া দেয়।

শীত, বর্ষায় এবং স্বল্পস্থায়ী প্রখর গ্রীষ্মের শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় পলায়নপর অনুরক্ত সঙ্গীগণ শিবাজীকে লইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইত। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগপূর্ণ মনে তাহারা কখনও এক গৃহে বেশীক্ষণ বাস করিত না। এই তিন বৎসরের অভিজ্ঞতার স্মৃতি শিবাজীর মনে যে বিভীষিকার সৃষ্টি করে তাহা অতিরঞ্জিত করা দুঃসাধ্য। অবস্থাপন্ন

হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই তখন মুসলমান রাজত্বের সার্ব্বভৌম শাসন অপরিহার্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল এবং মুসলমান রাজদরবারের বিলাসিতা ও ভোগের লালসায় প্রলুব্ধ হইত। কিন্তু শিবাজীর বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল নির্জন গ্রামবাসী বন্য উপজাতীয় লোকের সাহচর্য্যে। তাহারা তখনও অপরাজিত। এই শ্রেণীর অন্যান্য হিন্দু-যুবকেরা সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের সহিত প্রতিবেশীরূপে বাস করিত। সমাজে অবহেলিত ও কখনও কখনও নির্য্যাতিত হইলেও তাহারা খুব বেশী অভিযোগ না করিয়া এই সব অসুবিধাগুলি স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু শিবাজীর চোখে মুসলমানেরা ছিল মাতৃ-অপহারী ও অনবরত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনকারী। শৈশবে সে মুসলমানগণকে প্রায় রাক্ষসের মতই মনে করিত।

শিবাজী দশবৎসর বয়সের সময় তাহার মাতা দুর্গ হইতে পলায়ন করেন কিন্তু আজিও তাঁহার পলায়ন পদ্ধতির বিশদ বিবরণ আমরা সঠিক জানিনা। পার্ব্বত্য অঞ্চলে তিনি পুত্রের সহিত মিলিত হইলেন। পুত্রকে পুনরায় দেখিতে পাইবেন এই আশা তিনি প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কারাবাসের নির্জন পরিবেশে সান্ত্বনা পাইবার জন্য তিনি ক্রমশঃ ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হন। পুত্রের সহিত পনর্মিলন তাঁহার আরাধনালব্ধ আলৌকিক ফলরূপে তাহার নিকট প্রতিভাত হইল। বিজাপুর রাজ্য ও মুঘল সাম্রাজ্য উভয় পক্ষই ক্লান্ত হইয়া পড়ায় যুদ্ধের অবসান হইয়া আসিতে লাগিল এবং মুঘলেরা শিবাজীর অনুসন্ধান পরিত্যাগ করেন। সাময়িক বিশ্রামের সুযোগে মাতা এবং পুত্র পার্ব্বত্য অঞ্চলে একটি গৃহে আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় শিবাজী মায়ের নিকট হিন্দুদের যে সব গৌরব কাহিনী শুনিয়াছিলেন তাহা তিনি কখনও ভুলিয়া যান নাই। গ্রীকগণের আগমনের পূর্ব্বেও তাঁহাদের পরিবারবর্গ যে স্বাধীন ছিলেন এবং হিন্দুস্থান যে হিন্দুদিগেরই দেশ ছিল এই সব উপাখ্যান তিনি শিবাজীকে বলিতেন।

ইতিমধ্যেই দিল্লীর সম্রাট ও বিজাপুরের নবাবের মধ্যে দূত বিনিময় হইল। বৃদ্ধবয়সে সম্রাট শাজাহান যুদ্ধের দৈনিক অভিযানের গতিবিধির সংবাদ অপেক্ষা সঙ্গীত এবং সুন্দরী নর্ত্তকীদের সাহচর্য্যে অধিকতর আনন্দ

পাইতেন। তিনি দীর্ঘকালীন যুদ্ধে ক্লান্তি বোধ করিতেছিলেন। পারস্য-দেশীয় কূটনীতি দ্যৌত্য বিদ্যার বিশিষ্ট যথোপযুক্ত আখ্যা স্থানকাল পাত্র অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার সচিবেরা বিজাপুরের নবাবকে চিঠি লিখিলেন। এই চিঠি পূর্ণ এক পৃষ্ঠাব্যাপী। বিজাপুর রাজকে নানা প্রকারের উপাধিতে বিভূষিত করা হইল যথা—"রাষ্ট্রাকাশের সূর্য্য, পবিত্রতার রত্ন ও প্রতীক, মহত্বের আশ্রয়স্থল; মহান ব্যক্তি যাঁহার প্রতি সম্রাটের পবিত্র মন সর্ব্বদাই অনুরক্ত"—ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু তাঁহাকে মাত্র খাঁ বা আমীর ব্যতীত কখনও সুলতান বা রাজার আখ্যা দেওয়া হইল না (১)। সুলতানও যথাযোগ্য বিনয় সহকারে উত্তর দিলেন। তিনি সম্রাটকে পৃথিবী পালক, ঈশ্বরের প্রতনিধি, সৌষ্ঠবের প্রধান, হে সলোমন—প্রভৃতি বিশিষ্ট উপাধিতে ভূষিত করিয়া যথাযোগ্য বিনয় সহকারে চিঠির উত্তর দিলেন। মুঘল সম্রাট সুলতানকে উপহার স্বরূপ একটি ঘোটক পাঠাইলেন। আনন্দে বিমুগ্ধ সুলতান উহার স্বীকৃতি পত্র পাঠাইলেন। তিনি উহাতে লিখিলেন, "চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর এই অশ্ব জ্যোতিষীর কল্পনার মত স্বর্গলোকে বিচরণ করে। ইহার পৃষ্ঠ-দেশের জিনের নীচের গদি তুরস্কদেশে প্রস্তুত মখমলে মোড়া। ইহা পারস্য দেশেরই মূর্ত্তিমান প্রতীক। ইহা মাজনানের (Majnun) ন্যায় বনে বিচরণ করে। ইহার লেজ লায়লার (Laila) কেশগুচ্ছ হইতেও মনোরম।"

ইহার পর সম্রাটের নিকট হইতে আর একখানা চিঠি আসিলে সুল-তান উহা মস্তকে ছোঁয়াইলেন এবং উহার স্পর্শেই প্রবুদ্ধ বোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি এত মহিমান্বিত বোধ করিতেছি যে আমি ইহার উর্দ্ধে আর কিছু কল্পনা করিতে অসমর্থ।"

এইসব মার্জিতরুচি চিঠিপত্রের বিনিময়ের ফলে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় ইহার সর্তানুযায়ী সুলতান সম্রাট শাজাহানের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া তাহাকে কর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন।

---

(১) These letters may be read in the *Archaeological Survey of India*, Vol. XXXVII, under "Bijapur Sanads."

শিবাজীর পিতামহ মালোজীকে যে জমি দেওয়া হইয়াছিল তাহারই উত্তরে মুঘল সাম্রাজ্য এবং বিজাপুর রাজ্যের সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট হইল।

যুদ্ধ বিরতি হওয়া মাত্র শাহজী তাঁহার পুত্র ও পত্নীকে বিজাপুর আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সুতরাং যে পার্ব্বত্যদেশে শিবাজী যাযাবরের ন্যায় শৈশব জীবন যাপন করিয়াছেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া এই প্রথম তিনি বাহিরে যাত্রা করিলেন। পথে পড়িল যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চল, ভস্মীভূত গ্রাম, সুচিন্তিত ভাবে অপবিত্র করা মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ, ধোঁয়ায় আবৃত ও বর্দ্ধন-ব্যাহত বৃক্ষ, ক্রোশের পর ক্রোশ গৃহহীন ভূমি, পদপবিহীন অসমতল উচ্চভূমি, গিরিমাটির উপর বাতাসে শোঁ শোঁ শব্দে দোলায়মান বল্লনের মত তৃণদল। কেবল বিজাপুরের সন্নিকটে পৌঁছিলে তাঁহারা প্রাণের চাঞ্চল্য ও সম্পদের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিলেন। এখানে দেখিলেন উদ্যান, স্রোতস্বতী নদী, ফলের বাগান এবং আম্রকুঞ্জের মধ্যে শুভ্র মসজিদের সৌধ। চোখ একটু উচু করিলেই পথিকেরা দেখিতে পাইতেন অদূরে গগনস্পর্শী গম্বুজ ও সুউচ্চ অট্টালিকার মস্তকশ্রেণী। ইহাই প্রসিদ্ধ বিজাপুর নগরী—ভারতের প্যালমীড়া (১) (Palmyra)।

তৃতীয় অধ্যায়

সপ্তদশ শতাব্দীর বিজাপুর নগরীতে প্রবেশ করা মাত্র আগন্তুকের দৃষ্টিতে সম্ভবতঃ প্রথমেই পড়িত প্রতি সরকারী গৃহে উড্ডীয়মান অর্দ্ধচন্দ্রাকার পতাকা। ইহা যে বিজাপুর শাসক বংশের পারিবারিক প্রতীক এ কথা সহজেই জানা যাইত। বিজাপুরের নবাব বংশ কনস্টানটিনোপোলের খলিফাদের সহিত পারিবারিক সম্বন্ধের দাবী করিতেন এবং তাহাদের অনু-করণে অর্দ্ধচন্দ্র প্রতীকের প্রবর্ত্তন করেন। মুঘল বাদশাহ এবং নিম্নস্তরের অন্যান্য ভারতীয় মুসলমান শাসকদিগের উদ্ভব ইন্দো-পারস্য অথবা মধ্য এশিয়া হইতে। সুতরাং তুরস্ক রাজবংশ হইতে উদ্ভূত ভারতে এই একমাত্র

(১) দামস্কাসের নিকট কারুকার্য্যমণ্ডিত প্রসিদ্ধ পুরাতন নগরী।

শাসক পরিবারের ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক এবং ইহার উৎপত্তির কাহিনীর সামান্য আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কসোভোর (Kossovo) যুদ্ধক্ষেত্রে সার্ভিয়াকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়া অশনিপরাক্রম ওসমানলি (Osmanli) বংশের দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা বায়োজিদ তুরস্কের সুলতান পদে বিঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইবার মানসে স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিবার আদেশ দেন। এই অনন্যসাধারণ হিংস্র ও বর্ব্বর আচরণে তুরস্কের পরবর্ত্তী প্রত্যেক সুলতানের সিংহাসনে আরোহনের সংবাদ বিঘোষিত হওয়ার সময় এক নজীরের সূচনা হয়। নূতন সুলতানের রাজত্ব যাহাতে নিষ্কণ্টক হয় সেই জন্য একমাত্র আইনতঃ উত্তরাধিকারী ব্যতীত শাসক বংশের অন্য সকল রাজপুত্রদিগকে হত্যা করা হইত। পরবর্ত্তীকালে বিজয়ী আখ্যাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় মহম্মদ ১৪৫১ সালে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই যথারীতি নির্ব্বিচারে পাইকারী হত্যার আদেশ দেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ইউসুফ্ ছিলেন মাতার সর্ব্বাপেক্ষা আদরের সন্তান। মাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে নূতন সুলতান ইউসুফের হত্যা একদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে স্বীকৃত হন। ভাগ্যক্রমে গার্গাস্তানি (Gargastini) নামক এক সওদাগর এই সময়ে রাজদরবারে ককাসস্ দেশীয় কতিপয় ক্রীতদাস বিক্রয় করিতে আনিয়াছিলেন। রাজমাতা রাত্রিবেলায় গার্গাস্তানিকে ডাকিয়া পাঠান ও তাহার নিকট হইতে ইউসুফের সমবয়স্ক একটি ক্রীতদাসকে উপযুক্ত অর্থ বিনিময়ে ক্রয় করেন। প্রতিদানে সওদাগর তরুণ রাজপুত্রকে নিজ বাটিতে প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হন। পরে রাজমাতার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ঐ রাত্রেই ককাসস্ দেশীয় ক্রীতদাসটিকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা হইল। সরকারী ঘাতকেরা প্রভাতে তাহাদের আদিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিতে আসা মাত্র তিনি তাহাদিগকে ক্রীতদাস বালকের শব দেখাইয়া বলিলেন যে উহাই তাঁহার পুত্রের মৃতদেহ। তিনি আরও বলেন যে নিজ পুত্রকে জহ্লাদের হাতে সমর্পন করা অপেক্ষা তিনি তাহাকে স্বীয় তত্ত্বাবধানে মারিয়া ফেলাই শ্রেয় মনে করিয়াছেন। হয়তো এই কৈফিয়তের সঙ্গে সঙ্গে ঘাতকদিগকে কিছু উৎকোচও দিয়া থাকিবেন। অথবা ঘাতকেরা সম্ভবতঃ তাহাদের নিধনকার্য্যের দরুণ অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায় বিশেষ বাদ প্রতিবাদ না করিয়া এই অসম্ভাবনীয় কাহিনী হয়তো বা

সত্যই সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিল। রাজপুত্রের পরিবর্ত্তে ক্রীতদাস বালকের মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভাযাত্রা নগর পরিভ্রমন করিল।

সওদাগর গার্গাস্তানি ইতিমধ্যে তরুণ কুমারকে লইয়া সাভে (Saveh) নামক শহরে নিজদেশে চলিয়া গেলেন। শুধু কৌশলক্রমে ছেলের প্রাণ বাঁচাইয়াই যদি সুলতানা সন্তুষ্ট থাকিতেন তবে এই কাহিনী হয়তো চির-কালের তরে লুক্কায়িত থাকিত এবং ইউসুফ সাভে নগবে মালিকের শিক্ষানবীস রূপে বড় হইয়া তাঁহাব ন্যায় ক্রীতদাস ক্রয় বিক্রয় করিয়া একজন ধনী ব্যবসায়ীরূপে জীবন অতিবাহিত করিত। কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহাকে কখনও ভুলিতে পারেন নাই। প্রতি বৎসর তিনি গোপনে সাভেতে লোক পাঠাইয়া পুত্রের খববাখবর সংগ্রহ করিতেন। প্রাচ্যদেশে কাহাবও গুপ্ততথ্যই একেবাবে গোপন থাকে না। এই সুদূব নগরীতে সুলতানার কি আকর্ষণ থাকিতে পারে ইহা লইয়া ইতিমধ্যে চুপি চুপি অনেক রকম জল্পনাকল্পনা চলিতে লাগিল। নগরের শাসকের উপর অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইল। সময়মত সঙ্কেত পাইয়া ইউসুফ্ পারস্যদেশের মধ্য দিয়া পূর্ব্বদিকে ভারত অভিমুখে পলায়ন করেন। অবশেষে ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে পৌছিলেন। নির্ব্বান্ধব ও কপর্দ্দকহীন অবস্থায় তিনি সহজেই এই ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর ফাঁদে পড়েন। ঐ বনিক তাঁহাকে মহম্মদ গাওয়ান নামক মধ্যভারতের এক আমীরের নিকট বিক্রয় করে। চতুর ও সুদর্শন ইউসুফ্ সহজেই নূতন মালিকের প্রীতি ও স্নেহ আকর্ষন করেন এবং অনতিবিলম্বে মহম্মদ গাওয়ান তাঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

মামুদ গাওয়ান ছিলেন বাহমনি সম্রাটের একজন বিশিষ্ট অমাত্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বাহমনি সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে ছিল সমগ্র মধ্যভারত। ভাগ্যদোষে মামুদ গাওয়ান সম্রাটের বিরাগভাজন হন ও সম্রাট তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। যথারীতি তাঁহার শিরচ্ছেদ হইল বটে কিন্তু ইউসুফ শাসকবর্গের দৃষ্টি এড়াইয়া মামুদ গাওয়ানের পরিচালিত সৈন্য দলের সহিত মিলিত হন ও তাহাদিগকে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করেন। সৈন্য দলের নেতৃত্ব লাভ করিয়া ইউসুফ সম্রাটের নিকট হইতে জোর করিয়া বিজাপুর প্রদেশের শাসকের পদ কাড়িয়া

লইলেন। রাজ্যপাল হওয়াব অনতিপরেই তিনি নিজেকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বিজাপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বিজাপুরের পরবর্ত্তী রাজারা বিজাপুর নগরীতে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া উহার পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি করেন। কালে বিজাপুর এসিয়া মহাদেশের একটি শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হইল। ১

উত্তর দিকের সিংহদ্বার দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে এই নগরীতে প্রবেশ করিবার সময় বালক শিবাজী যে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রবেশ পথে বড় বড় হরফে খোদাই করিয়া লেখা ছিল যে "যে সুলতানের আদেশ পৃথিবীর সপ্তখণ্ড জুড়িয়া পালিত হয় তিনিই এই দুর্গ প্রাচীর নির্ম্মান করিয়াছেন। ইহা দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের নির্ম্মানকার্য্যের সহিত সমতুল্য।" অধুনা ধ্বংসমুখ হওয়া সত্ত্বেও এই বিশালায়তন প্রাচীর ও গম্বুজ শ্রেণী অতিমানবীয় সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। শিবাজী নিশ্চয়ই অবাক হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে ইহাদের দিকে তাকাইয়া থাকিবেন। প্রচীবের গায়ে কামান বসান ছিল। বিজাপুরের কামান ছিল বিখ্যাত, কারণ তুরস্ক হইতে আগত এই রাজ্যের শাসকেরা কামান প্রস্তুতের কাজে অতিশয় অনুরাগী ও দক্ষ ছিলেন। অদ্ভুত রকমের নক্সায় পরিকল্পিত ও বহুমূল্যে মনি রত্নাদি পরিশোভিত এই কামানগুলিকে লোকে প্রায় অলৌকিক সামগ্রী বলিয়া মনে করিত। কুচকাওয়াজের সময় সেনাবাহিনী ইহাদিগের প্রতি সামরিক কায়দায় সম্মান প্রদর্শন করিত এবং রাজকীয় ছত্র দ্বারা ইহাদিগকে সূর্য্যতাপ হইতে রক্ষা করা হইত। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম কামানটির নাম ছিল 'মালিক-ই-ময়দান্' অথবা সমতল ভূমির অধীশ্বর। প্রসিদ্ধ তোপ-শিল্পী খাঁ মুরাদ এই কামান নির্ম্মান করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ইহা কতদূর কার্য্যকরী হইবে এই প্রশ্নের উত্তরে যেন মামুদ খাঁ ইহার এক পার্শ্বে পাল্টা প্রশ্নরূপে কতকগুলি কথা খোদাই করাইয়াছেন, যথা— "হে আল্লার দূত আপনি কি আমাকে কখনও পরখ করিয়া দেখিয়াছেন?" অপর পার্শ্বে আত্মপ্রসাদ পরিচায়ক এই

For the history of Bijapur, Consan's Bijapur and Arch. Survey of India.

এই কথাগুলি খোদানো ছিল, "আমি এই নৃপতিকে বশ করিয়াছি।" এই কামানটির হাঁ-মুখ ছিল এত বড যে উহার অভ্যন্তরে একটি মানুষ অনায়াসে বসিতে পারিত।

সহসা দেখিলে ইহাকে উন্মুক্ত চোয়াল এবং নগ্নবিষদাঁত যুক্ত একটা অতিকায় ভুজঙ্গের মাথার মত মনে হইত। কর্ণমূলদ্বয়ের মধ্যে ছিল মাকড়ি পরাইবার জন্য দুইটি প্রকাণ্ড ছিদ্র। এই কামানটি এত যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত হইত যে সুলতান ইহাকে সোণালী রঙের বস্ত্রের দ্বার আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেন এবং প্রতি বৎসর একবার মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া ইহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিতেন। ১ এমন কি বর্ত্তমান কালে যদিও কারুকার্য্যময় আভরণ ও সাজপোষাক বিহীন এই কামানটি অসহায় অবস্থায় বিধ্বস্ত প্রাচীরের গায়ে পড়িয়া রহিয়াছে তথাপি জনসাধারণ আজও ইহার পূজা করিয়া থাকে। তাহারা উহার পায়ে লাল সীসা ঢালিয়া দিয়া ও সুগন্ধি তেল মাখিয়া গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দেয় এবং ইহার বিকট আস্যের সম্মুখে নত হইয়া পিতলের থালায় করিয়া মুঠি মুঠি গোলাপের পাপড়ি অর্ঘ্য দিয়া থাকে।

সিংহদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবার সময় শিবাজী ও তাঁহার মাতা নিশ্চয়ই মসজিদ্, প্রাসাদ ও সমাধির সৌধ সমূহ একদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে ছিল মধুর রঙে অঙ্কিত ছাদসহ বিখ্যাত গোলগম্বুজ নামক ইমারত। নীলকান্তমণিখচিত বিশ্বের বৃহত্তম এই গম্বুজের গায়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে "স্বর্গীয় উদ্যান নিবাসী সুলতান মহম্মদের সমাধি।" আর ছিল ইব্রাহিম রৌজা নামক মনোরম অট্টালিকা। ইহার চিক্কণ মিনার হইতে প্রস্তর নির্ম্মিত অসংখ্য ঝালর মৃদু হাওয়ায় দুলিয়া ঝন্‌ঝন আওয়াজ করিত। ইহার সৌন্দর্য্য উত্তর ভারতের মুঘল বাদশাহদিগের নির্ম্মিত যে কোন শ্বেত মর্ম্মরের অট্টালিকা অপেক্ষা মনোমুগ্ধকর। প্রাসাদের চারিদিকের উদ্যানে পুষ্প-মুকুলিত তরু বীথিকার মধ্য দিয়া স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর শীতল জল রঙিন

(১) Pietro della Valle, 'Travels', London, Hakluyt Society, Vol. I.

পাথরের পূর্তনালীর পথে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া প্রবাহিত হইত। দুগ্ধ-শুভ্র গম্বুজের নীচে ঈষৎ অন্ধকার কক্ষে সুলতান ও সুলতানাদের সমাধিগুলি বিরাজিত ছিল। পুরুষদের সমাধির উপর থাকিত একটি করিয়া লেখনীর বড় শ্বেতবর্ণের আধার। উহা দ্বারা জীবিতাবস্থায় তাহাদের বিদ্যাচর্চ্চার প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হইত। কারণ লেখাপড়ার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠি। স্ত্রীলোকদের পক্ষে অন্যরূপ বিধি প্রচলন ছিল। তাহাদের সমাধির উপরিভাগে সমতল ও মসৃণ করিয়া তাহাতে নানা প্রকার প্রশংসাসূচক কথা লিপিবদ্ধ করা হইত। উপমাস্বরূপ রাণী তাজসুলতানার স্মৃতিফলকের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কারণ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই এই সমাধি-সৌধ প্রথম প্রস্তুত হয়। ঐ স্মৃতিফলকের ভাষা এইরূপ, "সলোমনের রাজ্ঞী বিল্‌কিসের (Bilkis) ন্যায় মহীয়সী ও গৌরবান্বিতা, অমায়িকা ও স্নেহশীলা, শালীনতার পরাকাষ্ঠা----এই রমণী ইহলোক ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন।" উত্তর দিকের দরজার মাথায় এবং সূক্ষ্ম মার্বেল পাথরের কারুকার্য্যখচিত মুক্তবায়ু প্রবেশ-পথের নীচে শিল্পী মালিক স্যাণ্ডাল (Malik Sandal) সাধারণ সৌজন্যের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়াই লিখিয়াছেন, "স্বর্গবাসীগণ এই অট্টালিকা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। স্বর্গের নন্দনকাননে এ উদ্যানের সৌন্দর্য্য অনুকরণ করা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি স্তম্ভ স্বর্গের পবিত্র উদ্যানের সাইপ্রেস্ বৃক্ষের ন্যায় সৌষ্ঠবপূর্ণ। স্বর্গীয় দূত তারস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিল, "হৃদয় মুগ্ধকর এই অট্টালিকা সত্যই রাণী তাজ সুলতানার উপযুক্ত স্মৃতি-সৌধ।"

সম্ভবতঃ সমুদয় অট্টালিকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ছিল "আসার মহল"। ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের দুটি কেশ একটি রৌপ্য কৌটায় সযত্নে রাখিয়া উহা সংরক্ষণের জন্য এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। উহার প্রাচীর চিত্রনের জন্য সুলতান ইতালি দেশ হইতে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া চিত্রকর আনাইয়াছিলেন।

মনুষ্যাকৃতির কোনরূপ প্রতিকৃতি বা ছবি চিত্রণের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্ম্মের শাসন বড়ই কঠোর। কিন্তু চারুশিল্পের প্রতি অনুরাগী সুলতান

এই প্রকার প্রাচীনপন্থী সেকালের কুসংস্কারেব কোন ধার ধারিতেন না। ইতালিয়ান শিল্পীদের চিত্রণের মনোনীত বিষয়বস্তু ছিল অদ্ভূত রকমের কৌতুহলোদ্দীপক এবং উহা সময়ে সময়ে উত্তর ভারতের গোড়া মুসলমানদিগেব মনে আতঙ্ক ও ভীতির স্বষ্টি করিত। তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রেব মধ্যে নানাবকমেব ভোজখানাব দৃশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভোজসভায় ফুলেব মুকুট পরিয়া সুদর্শনা রমনীবা ভেনিস্ শহরে প্রস্তুত স্বচ্ছ কাচেব থালায় রক্ষিত ফল আহাব কবিতেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া ক্রীতদাসী নটিরা, বেহালা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে সঙ্গীত কবিতেছে—এইরূপ দৃশ্য অনেক দেওয়ালে চিত্রিত ছিল। আরও ছিল পদলেহনরত কুকুরসহ বৃহৎ টুপি ও কারুকার্যময লেসেব কলারযুক্ত জামা পরিহতি সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়দিগের ছবি। কোথাও বা ছিল গোলা-পের মুকুট মাথায় ও মুক্তার মালা গলায় সুন্দরী রতি দেবী ভেনাসের পীনাঙ্গী ছবি। ক্লান্তিজনিত অবসাদে তাঁহার দেহ যেন পশ্চাতে একটু হেলিয়া পড়িয়াছে। আর তাঁহার সুন্দর মুখেব সন্মুখে দর্পন ধরিয়া দণ্ডাযমান নীল রঙ্গের ডানাবিশিষ্ট কোমরে মেখলা, মণিবন্ধে ব্রেসলেট ও কর্ণে মুক্তাঙ্গুরী পরিহিত অনিন্দ্যসুন্দর দেববালক কামদেব (কিউপিড্)। এদিকে একহাতে পেখমযুক্ত শিবস্ত্রাণ লইয়া ও অন্য হাত উর্দ্ধে তুলিয়া রণদেবতা মারস্ প্রণয়দেবী ভেনাসকে প্রেম নিবেদন করিতেছেন। আর এক দৃশ্যে ভেনাস প্রিয়দর্শন যুবক এডোনিসের সহিত প্রেমবিহারে নিযুক্ত। কোনও চিত্রে জনৈক ফার্সি গায়ক ইউরোপীয় ও ভারতীয় একমিশ্র যুবতীদলের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়া মাঝে মাঝে মস্তক দোলাইতেছেন, কিন্তু যুবতীরা তাহাকে উপেক্ষা করিয়া স্বচ্ছন্দে পরস্পর গল্পে মগ্ন।

শহরের অনেক অঞ্চলে সাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত স্নানাগার প্রতিষ্টিত। কারণ এই নবাববংশ ব্রুশা (Brusa) ও নিকিয়া (Nicaea) হইতে বাইজানটিয়ম সাম্রাজ্যের বিলাসিতার ভাবধারা বিজাপুরে প্রচলন করেন। মুক্তস্থানে অবস্থিত একটি স্নানাগারের প্রবেশপথে এই কথাগুলি লেখা ছিল, "আহা কি মনোরম সরোবর। ইহার স্বচ্ছ ও পরিস্কার জল স্বর্গের ঝর্ণার সলিল অপেক্ষাও বিশুদ্ধ, গোলাপজল অপেক্ষা সুস্বাদু,

ইহার প্রতিটি বুদ্বুদ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও পবিত্র।" অন্যান্য স্নানাগার গুলিও ছাদ দিয়া আচ্ছাদিত ছিল। চূণকামকরা ও খাঁজকাটা চিত্রিত প্রাচীর শ্রেণী ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানের উপরে মুক্তাখচিত গম্বুজ শোভা পাইত। প্রধান, প্রধান রাস্তাগুলিতে সর্ব্বত্রই সাধারণ লোকের জন্য পানীয় জলের ফোয়ারা ছিল। ঝর্ণার নলের উপরে প্রচীরগাত্রের লেখাগুলি এখনও বিদ্যমান। সাধারণত লেখার ধরণ এইরূপ—"সলোমনের মত মহামহিম প্রবল প্রতাপান্বিত ও সমৃদ্ধিপন্ন সুলতান এই ফোয়ারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তৃষ্ণার্ত জনগণ ইহার বারি পানে তৃপ্ত হইয়া সর্ব্বজনের আশ্রয়স্থল এই সুলতানের রাজত্ব যাহাতে চিরদিন সুদৃঢ় থাকে এই উদ্দেশে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে।"

সংস্কৃতি, বিলাসিতার জাকজমক অতিমনোরম কারুকার্য্যময় সৌধ প্রভৃতি সভ্যতার সমুদয় সামগ্রীই প্রচুর পরিমানে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও খুব কম রাজ্যেই এত বেশী হিংসাত্মক মৃত্যু সংঘটিত হইত। ছুটির দিনে অথবা উৎসবাদি উপলক্ষে শোভাযাত্রার ন্যায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্য-দিগের শোভাযাত্রাও অতি ঘন ঘন দেখা যাইত। পর্ণহীন বিশীর্ণ গ্রন্থিলীকৃত শাখা ও স্ফীতিতে প্রায় পঞ্চাশফুট পরিধিযুক্ত কুখ্যাত বাওবাব (Baobab) ১ বৃক্ষের তলায় হাবসী জহ্লাদেরা দণ্ডিত ব্যক্তিদের অপেক্ষায় থাকিত। তাহারা নিকটস্থ হওয়া মাত্র হাবসীরা নৃশংস কার্য্যের জন্য ভারী তরোয়াল কোষোন্মুক্ত করিবার পূর্ব্বে একবার তাহাদিগকে সেলাম করিত। ২

---

(১) It is still standing and is perhaps naturally belived to be haunted not only by Indians but also by Europeans, many of whom tell apparently well attested stories of unpleasant manifestations.

(২) Consen's 'Bijapur'. *Abyssinians were widely employed in India. Most were Mahomedans but there were a few Christians, remarkable for the great cross that they had burnt on their fases stretching from forehead to chin and ear to ear (Linschoten, Voyage an Indies).

জনাকীর্ণ রাস্তায় শিবাজীর পাশ দিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহগণ যাতায়াত করিতেছিলেন। তাঁহাদের অনুচরেরা জীজাবাঈ এর জীর্ন শিবিকা এড়াইয়া দ্রুত চলিতেছিল। নাকাড়া বাজনা ও সোনালী ঝালর যুক্ত ছত্র সমভিব্যাহারে জীজাবাইয়ের শিবিকা নগরে প্রবেশের সময় একজন সম্মানিত ব্যক্তির আগমনের বার্ত্তা লোক সহজেই অনুভব করিতেছিল। কিন্তু স্থানীয় আমীরদের মনে শান্তি ছিলনা। তাঁহারা একটা চাপা উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতেন। যে কোন গুজবে তাহারা বিচলিত হইতেন ও পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখিতেন। এমনকি প্রাসাদের অধিবাসীদের মধ্যেও অনেক সময় উত্তেজনাপূর্ণ তিক্ত বাগবিতণ্ডা হইত এবং সভাসদ্‌গনের ঝগড়া প্রায়ই গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করিত। এইরূপ অস্থির ও অনিশ্চিত আবহাওয়ার প্রধান কারণ এই যে ছোটবড় নির্বিশেষে সকলেরই ভাগ্য নির্ভর করিত সুলতানের উপর অথবা তাঁহার নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ও ক্ষনিকের জন্য প্রশ্রয়প্রাপ্ত মন্ত্রীর খেয়ালের উপর।

শিবাজীর পিতা শাহজী ছিলেন প্রধান আমীরদের মধ্যে অন্যতম। বিজাপুর রাজ্যের সেনাবিভাগে কাজ করিয়া তিনি বেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন। মুঘলসাম্রাজ্যের প্রান্তে তাঁহার যে সমস্ত জায়গীর ছিল সে সবের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি দেখিতে সুদর্শন কিন্তু একটু স্থূলাকৃতি ছিলেন ও অতিরিক্ত বেশভূষা পছন্দ করিতেন। সুদৃশ্য দরবারের পোষাকে তাঁহার ললাটে হিন্দুধর্ম্মের জাতি নির্দ্দেশক রক্তবর্ণের তিলক না থাকিলে তাহাকে মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইত। বিজাপুরের আমলাতান্ত্রিক অমাত্যদের মধ্যে তিনি আপন পদগৌরবে বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন। মুসলমান অমাত্যগন তাঁহার বিরুদ্ধে প্রায়ই চক্রান্ত করিলেও তিনি এ পর্য্যন্ত সুলতানের অনুকুল্যের উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তিনি দ্বিতীয়-বার দার পরিগ্রহ করেন। এই মহিলা জীজাবাইয়ের অপেক্ষা বয়সে ছোটছিলেন এবং তাহার স্বভাবও শাহজীর মনোবৃত্তির অধিকতর উপযোগী ছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে ব্যাঙ্কাজী নামে একটি পুত্র সন্তান

জন্ম গ্রহণ করে। শিবাজীর জীবনের প্রায় শেষের দিকে ছাড়া ইহার কথা আমরা পুনরায় শুনিতে পাইব না। স্বামী দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করায় হিন্দু সংস্কার অনুযায়ী জীজাবাইয়ের স্বামীর প্রতি বিরক্ত হওয়ার বিশেষ কারণ ছিলনা এবং ইহার জন্য শাহজীর ও জীজাবাইয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা বা স্নেহহীনতা প্রদর্শনের কোন যুক্তি সমর্থনযোগ্য নহে। কিন্তু জীজাবাই-এর প্রতি শাহজীর যে সত্যিকারের ভালবাসা ছিল না তাহা এখন বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিল। বাস্তবিক জীজাবাইয়ের সহিত শাহজীর বিবাহে কোন প্রেমের বন্ধন ছিল না। ইহার মূলে ছিল বালসুলভ চপল ভাবাবেগ এবং তাঁহার পিতার রাতারাতি বড়লোক হওয়ার প্রয়াস ও আকাঙ্ক্ষা। কয়েক বৎসরের বিচ্ছেদের ফলে জীজাবাইয়ের আচার ব্যবহার এমনই কঠোর আকার ধারণ করিয়াছিল যে তাঁহাদের অতীত দাম্পত্যজীবনের যেটুকু স্বল্পঘনিষ্ঠতা ও পরস্পরের প্রতি দরদ ছিল তাহাও বিলীন হইয়া গেল। জীজাবাই আর পূর্ব্বের মতন সুন্দরী ছিলেন না। সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে তিনি তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুসলমান বিলাসিতায় প্রভাবিত এবং নীতিবিগর্হিত আবহাওয়া পূর্ণ নাগরিক জীবনের প্রতি তাঁহার অস্বস্তি ও বিরাগ তিনি গোপন করিতেন না। ফলে শাহজী ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি অধিকতর বিরূপ হইতে লাগিলেন।

জীজাবাইয়ের সাহচর্য্য লাভের জন্য শাহজী তাঁহাকে বিজাপুরে আহ্বান করেন নাই। শাহজীর আসল উদ্দেশ্য ছিল পুত্রকে নিজের সন্নিকটে পাওয়া। পুত্রের যথোপযুক্ত শিক্ষা ও চারিত্রিক উন্নতির জন্য তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাবে শিবাজী যাহাতে বিজাপুর রাজসরকারে উপযুক্ত চাকুরীলাভ করিয়া উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারেন তিনি এইজন্য সচেষ্ট ছিলেন। অধিকন্তু শিবাজীর বিবাহেরও তখন একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু ইহা প্রকাশ হওয়া মাত্র জীজাবাই বিজাপুর নগরীতে শিবাজীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে ঘোরতর অমত প্রকাশ করেন। তাঁহার আসল ভয় এই যে হয়তো মুসলমানদিগের উপস্থিতিতে এই উৎসব অপবিত্র হইয়া যাইবে। মাতা এবং পিতা উভয়েই শিবাজীকে পরস্পরের দিকে টানিতে লাগিলেন কিন্তু শিবাজীকে কিছুতেই তাঁহার মাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা

গেল না। শিবাজীতো পিতাকে ভাল করিয়া জানিতেই পারেন নাই। পুত্রের প্রতি মাতার গভীর অনুরক্তি, তাঁহার মাতার নিঃসঙ্গ জীবন, মুঘলদের শিবিরে তাঁহার কারাবাস, মাতার প্রতি পিতার অবহেলা, এই সব স্মৃতির প্রভাবে হিন্দুসমাজে গৃহকর্ত্তার আদেশ নির্ব্বিবাদে পালন করিবার যে বিধি আছে শিবাজীর নিকট তাহা একেবারে নগন্য বলিয়া মনে হইল।

অকালপক্ক এবং একগুঁয়ে ছেলের ভবিষ্যত ভাবিয়া শাহজী এক মানসিক সংঘর্ষের সম্মুখীন হইলেন। শোনা যায় যে সমবয়স্ক বালকগণের সহিত খেলাধূলা করা অপেক্ষা শিবাজী রাষ্ট্রের শাসন ও সামরিক বাহিনী পরিচালনা সম্বন্ধে নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করিয়া পিতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। এই সব বিষয়ে পুত্রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া শাহজী বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হইতেন। অথচ মুসলমান শাসনের প্রতি শিবাজীর অশ্রদ্ধার মনোভাবে তিনি ক্রোধে বিচলিত হইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিজাপুর রাজদরবারে শিবাজীর ব্যবহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দরবারের রীতিনীতির সহিত পুত্রের প্রাথমিক পরিচয়ের উদ্দেশে তাহাকে সঙ্গে লইয়া শাহজী সুলতানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাজপ্রাসাদে গেলেন। তাঁহারা প্রাসাদের সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া বাহিরের প্রাঙ্গন ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে জল মণ্ডপ নামে একটি উচচ অট্টালিকা ছিল। জলপূর্ণ একটি দীঘির মধ্যে অবস্থিত ও ইহার কারুকার্য্যখচিত কাষ্ঠনির্ম্মিত ঝুলাবারান্দার দেওয়ালে পদ্মের পাপড়ির মত খোদাই করা জানালা হইতে পাঁচরঙ্গের আলো প্রতিফলিত হইত। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সভাসদেরা এই বারান্দায় বসিতেন। শুশুক মাছের দেহের মত আকৃতির ফোয়ারা হইতে প্রবাহিত রূপার টুকরার মত জলবিন্দু তাঁহাদের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া দীঘির জলে মিশিয়া যাইত। প্রাসাদের দেওয়ালে বিজাপুর রাজ্যের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের আলেখ্য শোভা পাইত। এই সমস্ত চিত্রের মধ্যে ষষ্ঠ সুলতান মহম্মদের ছবি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। একটি কৌচে দেহ এলাইয়া দিয়া তিনি শায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছেন, সঙ্গে তাঁহার প্রিয় একটি নর্ত্তকী। পাশে এক ঝুড়ি ফুল একটি বীণা ও একখানা ফারসী পুস্তক।

চিত্রটি দেখিতে এত বেশী জীবন্ত ছিল যে মনে হইত দীর্ঘকাল পূর্ব্বের মৃত এই নৃপতি যেন হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া কিছু বলিতেছেন। ১

দরবার কক্ষে বিজাপুরের সুলতান একটি পা বাঁকা অবস্থায় রাখিয়া অপর পা সম্মুখে প্রসারিত অবস্থায় একটি ভূ-গোলকের উপর রাখিয়া নীচু সিংহাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার এক হাতে সোনার চাবি ও অপর হাতে তরবারি। তাঁহার মাথায় কারুকার্য্যমণ্ডিত পাগড়ি, দেহে তাতার দেশের রীতি অনুযায়ী প্রস্তুত বুটিদার কিংখাবের রেশমী পোষাক ও পায়ে ফুল আঁকা জুতা। তাঁহার মস্তকোপরি একটি অতি বৃহৎ রাজছত্র; অমাত্যেরা সোনার হাতলওয়ালা চামর দিয়া মাছি তাড়াইতেছে এবং সিংহাসনের উভয়পার্শ্বে পত্রাকারে নির্ম্মিত দুইটি পাখা একবার করিয়া উঠিতেছে ও নামিতেছে। অমাত্যেরা একে একে সিংহাসনের নিকটস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্পেটের মেঝের উপর পাগড়ি নামাইয়া উপুড় হইয়া সুলতানকে সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। শাহজীও তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার নাবালক পুত্র মাথা অবনত না করিয়া মারাঠাদিগের রীতি অনুযায়ী যুক্ত দুই হাত চিবুকের কাছে ধরিয়া সুলতানকে অভিবাদন করেন। শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদিগকে এই পদ্ধতিতে অভিবাদনের প্রথা তিনি পূর্ব্বে পার্ব্বত্য গ্রামাঞ্চলে মারাঠাদিগের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শিবাজীর এই আচরণে উপস্থিত অমাত্য-বর্গের আত্মশ্লাঘা বিশেষভাবে খর্ব্বিত হইল। কিন্তু তাঁহারা যাহা প্রথম গ্রাম্যতাদোষ ও অজ্ঞতাজনিত অসভ্য আচরণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহাই পরে দৃঢ়নিষ্ঠ অবাধ্যতারূপে প্রকাশ পাইল। সুলতানের সিংহা-সনের সম্মুখে শিবাজীকে কোন প্রকারেই ঐতিহ্যিক নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা মানিয়া লইতে সম্মত করা গেলনা। কিম্বদন্তী এই যে তাঁহার পিতা সুলতানের সেবা করিয়া যে প্রশ্রয় ও অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাই এযাত্রার শিবাজীকে আসন্ন দণ্ডপ্রয়োগ হইতে রক্ষা করিল।

---

১ Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. I, P 375.

এই অবাঞ্ছনীয় ঘটনার পরে পুত্রের ভবিষ্যত জীবনে কর্ম্মধারার প্রতি শাহজীর উৎসাহ ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে লাগিল। শিবাজী যে রাজ দরবারে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিবেন না তাহা বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা গিয়াছিল। মাতার চরিত্র বৈশিষ্ট্যের তিনি একটু অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তরাধিকারী হইযাছিলেন, ফলে হয় একাকী নতুবা মাতার সান্নিধ্যে তাঁহাকে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হইত। ইহা স্বভাবতঃই মনে হয় যে শাহজী যদি পুত্রের সম্বন্ধে একটু অধিকতর উৎসাহ লইয়া তাহাকে স্নেহ ও সহানুভূতির দ্বারা প্রভাবান্বিত করিতে চেষ্টা করিতেন, অথবা (যাহা আরও ভাল হইত) তিনি যদি জীজাবাইয়েব মতের সহিত নিজের মতেব খানিকটা সমন্বয় করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত পদমর্য্যাদা দিতেন তাহা হইলে হয়ত শিবাজীও সময়মত বিজাপুরের জায়গীবদারের জীবনযাত্রা প্রণালী মানিয়া লইতেন এবং তাঁহাব বাল্যজীবনের প্রথম স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া ক্রমশ বিলীন হইতে পারিত। এই সম্বন্ধে শিবাজীর অপেক্ষা চারি বৎসরের বড় তাঁহার ভ্রাতা শম্ভুজীর কথা উল্লেখযোগ্য। জীজাবাই ও শিবাজী যে সময়ে গিরি অঞ্চলে লুক্কায়িত অবস্থায় ছিলেন তখন শম্ভুজী বিজাপুরে বাস করিয়া তথাকার রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হইযাছিলেন এবং বিজাপুর সরকারেব রাজভক্ত কর্মচারীরূপে কাজ করা ভিন্ন তাঁহার আব কোনও উচ্চাকাঙ্খা ছিল না। তিনি সুলতানের সমরবাহিনীতে যোগদান করার কয়েক বৎসর পরে সুদূর দক্ষিণে কোন এক অখ্যাত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

শিবাজীর আচরণ কিন্তু শীঘ্রই শাহজীর সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল। বালক শিবাজী একাকী বিজাপুরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ঘুরিয়া এই শহরের হাবভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। প্রাকৃতিক পরিবেশে বর্দ্ধিত এই বালক তীব্র দৃষ্টিতে তাহার চারিপাশের জীবন-যাত্রার প্রণালীর সর্বদিকই খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতে লাগিলেন। 'ক্ষৌরকার, গন্ধকার, চিত্রকর, প্রভৃতির সুসজ্জিত দোকান ও বিলাসদ্রব্যের বিপনি-শ্রেণী শোভিত প্রশস্ত রাস্তা; কোমর পর্য্যন্ত নগ্নদেহ কারিগরদের বিজা-পুরের প্রসিদ্ধ পিতলবাসন ঢালাইয়ের কাজ; উদ্ভাসিত কারিগরদের রক্ত বর্ণ পৃষ্ঠদেশ, পিতল বাসন নির্ম্মাণে নিযুক্ত সারিবদ্ধ কারিগরদের

মধ্য দিয়া পোষা হরিণের মৃদুমন্দ গমনাগমন; পথিকদিগের নিমিত্ত মাশুলহীন বিশ্রামাগার—কিছুই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল না। বিশ্রামাগারগুলি এতই বিলাস সামগ্রীপূর্ণ ছিল যে লোকে বলিত ক্লান্ত জনেরা ওখানে বাস করিলে সুখলাভের উপকরণের আস্বাদ পাইত।(১)

ঐ সব বিশ্রামাগারে ইউরোপদেশীয় বণিকরাও থাকিতেন। পরবর্ত্তী জীবনে শিবাজী পাশ্চাত্য জগতের সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য যেরূপ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন তাহাতে মনে হয় যে বিজাপুর শহরে পরিভ্রমণকালে তিনি নিশ্চয়ই বিদেশীর অদ্ভুত পোষাক, মাথার পরচুলা, পাখির পালক-শোভিত চওড়া টুপি, পরণে সিল্কের কোচকান থাক কাটা জামা এবং ভারী গোড়ালী সমন্বিত জুতা প্রভৃতি খুবই কৌতূহলের সঙ্গে দেখিয়া থাকিবেন। বিজাপুরের আমীর ওমরাহদের জাকজমকের বৈচিত্র্য কিন্তু বিদেশীদের সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদের ঔজ্জ্বল্য একেবারে ম্লান করিয়া দিয়াছিল। সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, বল্লম, রৌপ্যনির্ম্মিত ঘণ্টা, পালকবৎ তীর সহ আদবকায়দাদুরস্ত পোষাকে বিভূষিত আমীরদের গমনাগমন শিবাজী লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বিলাসীতায় মগ্ন বিজাপুরী আমীরদের এমনই অবস্থা হইয়াছিল যে তাঁহারা লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ ছাড়িতে প্রস্তুত, কিন্তু ভোজ ছাড়িতে রাজী হইতেন না; সম্মুখে অস্ত্রবাহিনী এবং পশ্চাতে অনতিদূরে বনিতাবৃন্দ সহ তাঁহারা সারা পথ আনন্দ ও উল্লাস মুখরিত করিয়া রাজসমারোহে অশ্বপৃষ্ঠে শোভাযাত্রা করিতেন। (২) আমীর ওমরাহ ও সৈনিকেরাই শুধু আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিলেন তাহা মনে করা ভুল হইবে, কারণ শহরের বণিকগোষ্ঠীও নানা প্রকারের সুগন্ধি, তৈল, চন্দন ও অন্যান্য দ্রব্যাদির নির্য্যাসে অবয়ব প্রসাধন করিয়া বহমূল্য পোষাকে ও অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া আরব, পারস্য এবং তুরস্কদেশের ঘোড়ায় চড়িয়া শোভাযাত্রার অঙ্গপুষ্ট করিতেন।(৩) বণিক এবং অমাত্যদিগের সঙ্গে আবার মাঝে

(১) *Archaeological Survey of India*, Vol. XXXVII.

(২) Fryer's *Accounts of India*, Letter IV

(৩) Fryer

মাঝে উল্লাসে উন্মত্ত এক এক ফকীরের দল থাকিত। ইহাদের পরণে থাকিত তালি দেওয়া জাফরান রংয়ের এক প্রকারের জামা। আপাতঃ-দৃষ্টিতে মনে হইত ইহারা যেন সঠিক বাসস্থানহীন সংসার বিরাগী। কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে অনেকে ছিল লম্পট, উচ্ছৃঙ্খল ও ব্যভিচারী, অতিশয় দুশ্চরিত্র এবং মাতাল। ভগবান বা মহম্মদের সম্বন্ধে কটূক্তি বা অভিশাপ বাক্য বর্ষণ করিতে ইহারা দ্বিধা বোধ করিত না। কিন্তু এই ছদ্মবেশে সুলতানের নিযুক্ত অনেক গোয়েন্দা অতি প্রয়োজনীয় গোপন সংবাদও সংগ্রহ করিত।(১)

রোমকদের শাসক সীজার অথবা মিশরীয়দের সম্রাট ফ্যারাওর ন্যায় প্রভাবশালী বিজাপুরের সুলতানের প্রতি বাহ্যতঃ সার্ব্বজনীন সম্মান প্রদর্শিত হইলেও আমীর ওমরাহদের দুর্বিনীত অদম্য এবং অনিয়ন্ত্রিত জাঁকজমক উৎসবাদিপূর্ণ নগরীর বহিরাবরণের অভ্যন্তরে ছিল অন্ধকার সমাচ্ছন্ন আর একটা দিক।(২) এই প্রকার সমাজে তীব্র উত্তেজনাময় জীবনযাত্রা ছাড়াও ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইত যে সুলতানের হিন্দু প্রজাদিগের নানা বিষয়ে প্রায়ই যন্ত্রণা এবং অত্যাচার ভোগ করিতে হইত। 'এমনকি মুসলমানেরা হিন্দুদিগের উপর অসহ্য রকমের আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে খেয়ালখুশী মাফিক শাসন করে'—ফ্রায়ারের "ভারতবর্ষ বিবরণ" নামক গ্রন্থে এই প্রকারের উক্তি কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হইলেও ইহা সহজেই প্রতীয়মান যে শাহজীর মত উচ্চপদাধিকারে সন্তুষ্ট স্বল্প কয়েকজন অভিজাত শ্রেণীর খেতাবধারী ব্যক্তি ব্যতীত হিন্দু জনসাধারণ বেশ ভাল করিয়াই বুঝিত পারিত যে রাষ্ট্রের মধ্যে তাহারা নিকৃষ্টতর গোষ্ঠী। কিন্তু বহুকাল যাবৎ তাহারা এই অবস্থা মানিয়া লইয়াছিল এবং হিন্দুদিগের ঘৃণাউদ্রেককারী অনেক মুসলমান প্রথা ও অনুষ্ঠান তাহাদিগকে ভাগ্যদোষে মানিয়া লইতে হইবে—এইরূপ মনোভাবও তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কাজেই শিবাজী যে প্রকাশ্যে গো-হত্যার প্রতিবাদ করিয়াছেন এই

---

(১) Fryer

(২) Idem

সংবাদে খুবই বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। এই সংবাদ প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি দাঙ্গা বাধিয়া উঠে এবং উহাতে কতকগুলি মুসলমান কসাইয়ের উপর আক্রমণ করা হয়।

আবার শিবাজীর প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িল। বালকের উদ্ধত ব্যবহারে শাহজী অস্বোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল যে পুত্রের কাজে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হেয়প্রতিপন্ন হইতেছেন। পুত্রকে বিজাপুর হইতে অপসরণ করিয়া মুঘল অধিকৃত সীমার প্রান্তে অবস্থিত পৈত্রিক জাগীরে সপুত্র বাস করিতে তিনি জীজাবাইকে আদেশ করিলেন। বিজাপুর ত্যাগ করিবার কালে প্রাসাদ ও মন্দিরগুলির দিকে ফিরিয়া তাকাইতে শিবাজীর মনে হয়তো কোনো কষ্ট হয় নাই। মাতার সান্নিধ্যে একাকী বাস করিতে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সন্তুষ্টি লাভ করিতেন। অধিকন্তু তাঁহার বিজাপুরের অবস্থানের সময় এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যাহার স্মৃতি মনে পড়িলে তিনি সুখী হইতেন।

মৃত্যুর পূর্ব্ব বৎসর মাত্র শিবাজী পুনরায় বিজাপুরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তখন অবস্থার ও পরিবেশের বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

দুইটি বৃহৎ কিন্তু ধ্বংসোম্মুখ রাজ্যের প্রান্তদেশের মধ্যখানে নূতন রাষ্ট্রের অভ্যুত্থানে খুব বিচিত্র নয়। এই প্রসঙ্গে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য এবং সেলজুক বংশীয় আমীরের রাজ্যের মধ্যস্থলে তুরস্ক রাজ্যের উদ্ভব অতি সাধারণ দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। উদীয়মান তরুণ রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতার কোনরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্যই যে বৃহত্তর রাজ্য-দ্বয়ের ধ্বংস ঘটে তাহাও বলা চলে না। বৃহত্তর রাজ্যদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে ধ্বংসাত্মক বিদ্বেষভাবই অনেক সময় তাহাদের সর্ব্বনাশ টানিয়া আনিয়াছে। পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরবদের সাফল্যের দৃষ্টান্ত এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ বিজাপুর এবং মুঘল সাম্রাজ্যের উভয়ের সীমান্তে অবস্থিত শিবাজীর পরিজনবর্গের এই জমিদারীর ভৌগ-লিক পরিবেশের গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কারণ

এক মুসলমান নৃপতি শিবাজীর পিতামহকে যে এই ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড দান করেন ইহা আরব্য উপন্যাসের স্মৃতিজড়িত উপাখ্যানের মতই এক ঘটনা এবং পরে এই জমিদারীর ভিত্তি হইতেই এক নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

শাহজীর অস্থির ও উদ্ধত প্রকৃতির পুত্রকে এতদূরে পাঠান হইয়াছে জানিতে পারিয়া বিজাপুরের উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীরা খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে এতদূরে অবস্থান করিয়া সে বিশেষ কোন গুরুতর উপদ্রব করিতে পারিবে না; আর যেকোন অবস্থাতেই প্রতিবেশী রাজ্যের সেনাপতিরা তাহাকে উপযুক্তভাবে শায়েস্তা করিবে। বিজাপুর হইতে এই দূরত্বই যে অবস্থা বিশেষে তাহার পক্ষে একটা সুযোগ হইয়া দাড়াইতে পারে একথা তাহাদের মনে হয় নাই। অপরপক্ষে মুঘল অধিকৃত দেশের সীমান্তবর্ত্তী জাগীরে শিবাজীর অবস্থিতিও প্রণিধানযোগ্য।

মুঘল সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্যের আশা ছিল না। কারণ, সন্ধিপত্র ও মিত্রতার ঘোষণা সত্বেও একদিকে সর্ব্বভারতীয় ঐক্যীকরণে ব্যস্ত উত্তর ভারতের আচারনিষ্ঠ গোঁড়া মুঘল বাদশাহের এবং অপরদিকে বিজাপুরের ভোগবিলাসী মুসলমান ধর্ম্ম-বিগর্হিত অনুষ্ঠান ও চারুকলার প্রতি অনুরাগী শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত স্বাধীন সার্ব্বভৌমত্বের দাবি জাহির করিতে ব্যগ্র সুলতানদিগের মধ্যে পরস্পর সহানভূতির যথেষ্ট অভাব ছিল।

কিন্তু শিবাজীর বিজাপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় এই প্রকারের কোনরূপ চিন্তা উদ্‌ভট কল্পনা বলিয়া মনে হইত। শিবাজীর পক্ষে শাসকশক্তির বিরুদ্ধে অসুবিধার সৃষ্টি করা দূরের কথা তিনি ও তাঁহার মাতা যে ঐ স্থানে বাস করিতে পারিবেন, ইহাও প্রায় অসম্ভব হইবে বলিয়া তখন মনে হইয়াছিল। পরস্পরবিরোধী বেতনভূক সেনা-বাহিনীর আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের ফলে এই জমিগুলি উষর-ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। গ্রামগুলি প্রায়ই বিলীন হইয়া গিয়াছিল। চাষের ক্ষেতের সংখ্যা ছিল অতি সামান্য এবং চাষীদের সংখ্যা সামান্য-তর। ধ্বংসের করালছায়ায় বেপরোয়া হইয়া চাষীদের মধ্যে অনেকেই

দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কখনও কখনও দলবদ্ধ পথিকদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিত। সৈন্যবাহিনীর ধর্ষনের পরেই ঐ দেশে আসিল ১৬৩১-৩২ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ। বাস্তবিক এইরূপ ভীষণ দুর্ভিক্ষ পশ্চিম ভারতে ইতিপূর্ব্বে খুবই কম দেখা দিয়াছে। একদিকে মানুষ সংখ্যায় কমিতে লাগিল আর অপরদিকে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল। নেকড়ে বাঘের অসহনীয় অত্যাচার খুব প্রকট হইল। উহারা দল বাঁধিয়া গ্রামগুলিতে হানা দিত। বুভুক্ষ চাষীরা এই অবস্থায় একেবারে অসহায় হইয়া পড়িয়াছিল।

এই সময় শিবাজীর বয়স তের। দাদাজী কণ্ডদেব নামক ঐ অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণকে তাঁহার পিতা তাঁহার গৃহশিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করেন। ব্রাহ্মণ কথাটার মধ্যে অনেক ইংরেজ কেমন যেন একটা ক্ষীণ অশুভ ইঙ্গিতের আভাষ পাইয়া থাকেন। পুরোহিতের অপকৌশল, জ্ঞানপ্রচারের বিরোধিতা এবং অতিরিক্ত ছলচাতুরী দ্বারা আলোচ্য বিষয় দুর্ব্বোধ্য করিয়া তোলা—ইত্যাদি নানা প্রকারের অপচেষ্টা ইহার সহিত জড়িত। কোন কোন বিদেশী পর্য্যটক তাঁহাদের ভ্রমণ-কাহিনীতে ব্রাহ্মণদের কতকগুলি অনাকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু যাহারা ব্রাহ্মণ পরিবারে বাস করিয়াছেন কিম্বা তাহাদিগকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে সকল প্রকার দোষ ত্রুটি সত্বেও পশ্চিম ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণদের পাণ্ডিত্য, শিষ্টাচার, বন্ধুপ্রীতি, অটলনিষ্ঠা, প্রভৃতি গুণাবলীর সামঞ্জস্য যে কোন লোকের মনেই গভীর রেখাপাত করিবে। তাঁহাদের পারিবারিক জীবন যেমন অপূর্ব্ব মাধুর্য্যপূর্ণ আবার তেমনই তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের কঠোর অনুশাসন শৃঙ্খলিত। পুরুষেরা সাধারণতঃ রাশভারী। তাঁহাদের দেহ লম্বা, মস্তক চওড়া ও চক্ষুদ্বয় ঈষৎ রঙীন। মেয়েরা অতিশয় লাবণ্যবতী ও তাহারা দেখিতে প্রায়ই অতি সুন্দরী।

শিবাজীর শিক্ষক ছিলেন অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশের একজন আদর্শ ব্যক্তি। তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা আজিও প্রবাদবাক্যে ব্যবহৃত হয়। তরুণ মনিবের কাজ অতি সুচারুরূপে করা-ই ছিল তাঁহার একমাত্র কাম্য। তাঁহার সততা প্রায় ব্যক্তিগত খামখেয়ালিতে পরিণত হইয়াছিল। ইহার

উদাহরণস্বরূপ এই গল্পটি প্রায়ই শোনা যায়। শিবাজীর জায়গীরের মধ্যস্থ জমিতে তিনি একটি সুন্দর ফুলের বাগিচা তৈয়ার করান ও ভৃত্যদিগকে এই বলিয়া সাবধান করেন যে কেহ যদি উহা হইতে ফল চুরি করে তবে তাহাকে বিশেষ শাস্তি পাইতে হইবে। ঘটনাক্রমে একদিন দুপুরবেলায় তিনি ঐ বাগিচায় পায়চারি করিবার সময় খুব তৃষ্ণার্ত বোধ করেন। একটি সুপক্ক আম ঐ সময় বেশ লোভনীয় ভাবে তাঁহার সম্মুখে ঝুলিতেছিল। আত্মবিস্মৃত অবস্থায় হাত প্রসারিত করিয়া দাদাজী আমটি ছিঁড়িয়া লইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে ভৃত্যদের প্রতি দেওয়া সতর্কবাণী মনে পড়িতেই তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া তীব্র মানসিক যন্ত্রনা ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন যে লোকে ভাবিবে যে অন্যান্য সকলকে তাঁহার মনিবের দ্রব্যাদি স্পর্শ করিতে না দেওয়ায় তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ছিল উহা নিজে ভোগ করা। তৎক্ষণাৎ তিনি একখানি তরবারি চাহিয়া পাঠাইলেন এবং উহার দ্বারা নিজের অপরাধী হাতটি কাটিয়া ফেলিতে উদ্যত হইলেন। ভৃত্যেরা তাঁহার চারিদিকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের উপর এইরূপ ভীষণ আত্মঘাতী শাস্তিপ্রদানে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি তরবারি সরাইয়া রাখিলেন বটে কিন্তু ইহার পর হইতে তিনি ডানহাতে আস্তিনবিহীন জামা পড়িতে লাগিলেন। ভারতবর্ষে বহুল প্রচারিত এই ঘটনাটি ইংরেজপাঠকের নিকট নাটকীয় ভাবপ্রবণতার কাহিনীর মত শোনাইলেও একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে মধ্যযুগের ইউরোপেও জীবনের গতি মঘলযুগের ভারতবর্ষের ন্যায় অতি রোমাঞ্চকর ও ভাবুকতার আবেগে পূর্ণ ছিল। সেখানেও ঐ সময়ে এইরূপ মনস্তাপ ও অনুশোচনার প্রকাশ অদ্ভুত বা অসাধারণ কাজ বলিয়া গণ্য হইত না।

দাদাজী যে শুধু একজন সচ্চরিত্র পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। তিনি শাসনকাজেও খুব সুদক্ষ ছিলেন। জায়গীরটির হৃত সম্পদ অনেকাংশে পুনরুদ্ধার করিতে তিনি নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত করেন।

প্রথমতঃ তিনি নেকড়ে বাঘের উপদ্রব বন্ধ করিতে সচেষ্ট হন।

প্রত্যেকটি নেকড়ে বাঘ নিধনের জন্য তিনি শিকারীকে নিজের সঞ্চিত অর্থ হইতে পুরস্কার দিতে লাগিলেন। স্থানীয় পাহাড়ী অধিবাসীদিগের নিকটও অকস্মাৎ পথিকদলের উপর হানা দিয়া অর্থার্জন অপেক্ষা বাঘ-শিকার অধিকতর লাভজনক বোধ হইল। এইরূপে শীঘ্রই ঐ অঞ্চল নেকড়ে বাঘের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইল।

তারপর তিনি যে সব চাষী জঙ্গলে পলাইয়া গিয়া জীবিকার্জনের জন্য দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল তাহাদিগকে নানা রকমে প্রলুব্ধ করিয়া জমি চাষের কাজে লাগাইতে সচেষ্ট হন। ক্রমবর্দ্ধমান খাজনার হারে তিনি তাহাদিগের মধ্যে জমি বিলির প্রস্তাব করেন। খাজনার হার ধার্য্য হইল প্রথম বৎসরে নাম মাত্র এক টাকা, দ্বিতীয় বৎসরে তিনটাকা এবং ক্রমে বাড়িয়া ষষ্ঠ বৎসরে বিশ টাকা। পার্ব্বত্য অঞ্চলের পাহাড়িয়াদের মধ্যে অনেকেই এই প্রস্তাবে প্রলুব্ধ হইয়া তাহাদের অরণ্যে বা পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শিবাজীর জায়গীরে স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিল। কালক্রমে ইহারা শিবাজীর পরম উৎসাহী ও বিশ্বস্ত অনুচর হইয়া দাঁড়াইল। গ্রামাঞ্চলগুলি দস্যুতস্করের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য দাদাজী নূতন পাহাড়িয়াদের সশস্ত্র রক্ষীদলে ভর্ত্তি করিতে লাগিলেন।

বহু বৎসরের মধ্যে এই প্রথম গ্রামবাসীরা নিয়ত বিপদ হইতে খানিকটা স্বস্তি বোধ করিল। তাহাদের আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়া আসিল। আবার বাড়ীঘর নির্মিত হইতে লাগিল এবং মন্দিরের অভ্যন্তরে ভগবানের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ গানের মৃদুগুঞ্জন শোনা যাইতে লাগিল।

শিবাজীর জায়গীরের এলাকাভুক্ত গ্রামগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণ্ডগ্রাম ছিল পুনা। নামটা কখনও কখনও পূনারূপেও লেখা হইত। য়্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের কাহিনীতে একটি অতি পুরাকালের শ্রেষ্ঠ নগরী বলিয়া এই স্থানের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত পুরাকালের গল্প বিশ্বাসযোগ্য নয়। বাস্তবিক তিনশত বৎসর পূর্ব্বে পুনা ছিল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহার মন্দিরের সৌষ্ঠব এবং পুরোহিতদিগের আচারনিষ্ঠার জন্যই লোকে এই গ্রামের নাম জানিত। শিবাজীর বিজাপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় এই মন্দিরগুলি পর্য্যন্ত ধ্বংস পাইতেছিল। বারংবার

লুণ্ঠনের ফলে এই গ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েকজন মৎসজীবী মাত্র সুতা নদীর ধারে বাস করিত। ইতিপূর্ব্বে ঐ গ্রামের মধ্য দিয়া মুসলমান সেনাবাহিনীর অভিযানের সময় সেনাপতির আদেশে সবগুলি বাড়ী ও দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণা বশতঃ তিনি এক চরমপন্থা অবলম্বন করেন। তাঁহার আদেশে একদল গাধাকে পোষাক পরাইয়া লাঙ্গলের সঙ্গে লাগাম বাঁধিয়া বাড়ির ভিতগুলি চষিয়া ফেলা হয়। তারপর এই হিন্দু-নগরীকে অভিশাপ দিয়া শাস্তির প্রতীক রূপে মাটিতে একটি লৌহ দণ্ড পুতিয়া রাখিলেন।

দাদাজী মাটি খনন করিয়া এই লৌহদণ্ড উৎপাটন করিয়া উহা ফেলিয়া দেন। কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদের মন হইতে এই অভিশাপের স্মৃতি লোপ করিবার জন্য ঐ মুসলমান সেনাপতির কাজের প্রত্যুত্তরে তিনি আরও এক অধিকতর নাটকীয় অনুষ্ঠানের অভিনয় করেন। তিনি ঐ জমি পুনরায় হলকর্ষণ করান। কিন্তু এবারে চাষ করান হইল শ্বেত বৃষকুল দ্বারা এবং লাঙ্গলটি ছিল খাঁটি সোনার।

জনহীন পরিত্যক্ত পতিত জমির পরিবর্তে পুনা অতি শীঘ্র একটি সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হইল। এক কালে ইহা যে ভারতবর্ষের হিন্দু-অধিবাসীদের নিকট অ্যাণ্টিওক (Antioch) শহরের মত সমৃদ্ধিপূর্ণ নগরী হইয়া উঠিবে তাহার আভাষ তখন হইতেই পাওয়া যাইতে লাগিল। পরিবর্তন যে কতদূর হইয়াছিল তাহা বুঝিতে হইলে ইহার ভবিষ্যত সমৃদ্ধির পরিচায়ক ইংরাজ পর্য্যটক রবার্টসনের এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

"বিদেশী শক্তিসমূহের চক্রান্ত, প্রধানমন্ত্রী পেশোবারের প্রতি মারাঠা নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধা নিদর্শন প্রভৃতি নানা কারণে পুনা নগরীতে অজস্র ধনরত্ন স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইত। সশস্ত্র প্রহরী, সুদর্শন অশ্ব, সুসজ্জিত শিবিকা, এবং সুদৃশ্য অট্টালিকা শোভিত এই নগরী বড়ই উজ্জ্বল দেখাইত। স্থান হইতে স্থানান্তরে বার্ত্তাবহক ভৃত্যেরা ছুটিয়া চলিয়াছে, নৃত্য, আমোদ প্রমোদের ধূমধাম—প্রভৃতি দৃশ্যের সমাবেশে শহরটি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল।" কিন্তু ধনদৌলতের প্রাচুর্য্য, ঘনঘন আমোদ প্রমোদ ও উৎসবাদি সত্ত্বেও পুনার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া ও সুনিয়ন্ত্রিত

নাগরিক জীবনধারা প্রসিদ্ধ ছিল। বিদেশীয় পর্য্যটকেরা এই শহরের লোকেদের মিতাচার এবং সচ্চরিত্রের সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতা অবসান হওয়ার ঠিক পূর্ব্বের দশবৎসর মারাঠাদের ইতিহাসে ক্রমবর্দ্ধমান অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার একটা মেঘাচ্ছন্ন যুগ। কিন্তু ঐ সময়েও মারাঠা রাজ্যে নিয়োজিত বৃটিশ মন্ত্রী এলফিনষ্টোন পুনার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "মোটের উপর বলা চলে যে নরহত্যা, মারপিটসহ ডাকাতি এবং আসন্ন বিপদাশঙ্কা প্রভৃতির কাহিনী খুবই বিরল ছিল; এবং বিষয় সম্পত্তির অভাব সম্বন্ধে কখনও কোন অভিযোগ আমার কানে আসে নাই।"

যে ক্ষুদ্র গ্রামের শ্রীবৃদ্ধির জন্য দাদাজী এত পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহাই যে একদিন 'ভারতবর্ষে'র রাজধানীরূপে পরিণত হইবে একথা দাদাজী কখনও ভাবিতে পারেন নাই। কিন্তু পুনার ভবিষ্যৎ গৌরব তাঁহার ধৈর্য্যশীল শাসন পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শিবাজী ও তাঁহার মাতার জন্য তিনি নদীর তীরে একটি বৃহৎ বাস ভবন নির্ম্মাণ করান। তাঁহারা ইহার নাম দিলেন রংমহল বা রঞ্জিত প্রাসাদ। মারাঠাদের বাড়ি সাধারণতঃ দুইটি উঠান ব্যাপিয়া প্রস্তুত হয়। সম্মুখের উঠানে থাকে চক্রাকারে নির্ম্মিত স্তম্ভশ্রেণীসহ সদর রাস্তা পর্য্যন্ত তোরণ শোভিত পথ। এই স্থানটি সাধারণতঃ অতিথিদিগের অভ্যর্থনার এবং পরিজনবর্গের শ্রান্তি অপনোদন বা অবসরকালীন আরাম উপভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্দরের উঠানের মধ্যস্থলে থাকে একটি তুলসীর মঞ্চ। সাধারণতঃ মেয়েরা এই উঠানটি ব্যবহার করে। সম্মুখের তোরণ শোভিত অঙ্গনে পুরুষেরা সন্ধ্যার দিকে দেহ এলাইয়া দিয়া বিশ্রাম করে। ভৃত্যেরা ঐ সময় তেলের প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করা মাত্র সকলে একসঙ্গে উঠিয়া প্রাণশক্তির প্রতীক স্বরূপ প্রদীপের পীত শিখার প্রতি করজোড়ে প্রণাম করেন।

জায়গীরের সুরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে কর্ম্মব্যস্ত দাদাজীর নিকট এই সময়টুকু ছিল পরম আনন্দের। বিশ্রামের অবসরে শান্ত পরিবেশে তিনি আরাম উপভোগ করিবার সময় সংস্কৃত পুথি পাঠ করিতেন। সন্ধ্যার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় মৃদু দীপালোকে কৃষ্ণবর্ণ সংস্কৃত

হস্তলিপির অক্ষরগুলি যেন বিশ্বের সমগ্র সৌন্দর্য্য তাহার নিকট উদ্ভাসিত করিত। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শিবাজীকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। বালক শিবাজী তাঁহার পার্শ্বে বসিতেন আর দাদাজী মহাকাব্যে বর্ণিত প্রাচীন ভারতের মহাপুরুষদিগের বীরত্বের কাহিনী উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেন। রাত্রির বাতাসে প্রদীপের কম্পমান শিখায় আকৃষ্ট হইয়া বৃহদাকার পতঙ্গকুল চিত্রখচিত স্তম্ভশ্রেণীর চারিপার্শ্বে ধুল্যবলুণ্ঠিত হইত আর ঐতিহাসিক বীরত্বের কাহিনী শুনিতে শুনিতে মোহাবিষ্ট শিবাজীর আশৈশব কল্পনা প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্খায় দৃঢ়ীভূত হইতে থাকিত। মাত্র পনের বৎসর বয়সে শিবাজী নিজের জন্য একটি শীলমোহর প্রস্তুত করান। তাহাতে অন্তর্লিখিত হইল----

"প্রতিপচ্চন্দ্রলেখেব বর্দ্ধিষ্ণু বিশ্ববন্দিতা
শাহসূনো শিবস্যৈষা মুদ্রা ভদ্রায় রাজতে"

প্রতিপদের চন্দ্রের রেখা ক্ষীণাকৃতি কিন্তু ইহা যে পরে মহান আকার প্রাপ্ত হইবে তাহা সুনিশ্চিত। এই মোহর শিবাজীর উপযুক্ত প্রতীক। (১)

জীবনের দীর্ঘকালব্যাপী কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য শিবাজী শারীরিক শ্রম সাপেক্ষ অতি কঠিন অনুশীলন অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

চতুষ্পার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য জাতীয় একদল লোক সংঘবদ্ধ করিয়া যে সব পাহাড়ের গায়ে তাঁহার বিপৎসঙ্কুল বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় তিনি সেই সব স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন যে সব সংকীর্ণ গিরিগুহায় তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া হয়তো ভ্রমক্রমে অকস্মাৎ উপনীত হইতেন ... এখন সেই সব স্থানেই তিনি নিয়ন্ত্রণকারী প্রভুর ন্যায় দৃঢ়পদক্ষেপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার কষ্টের সম্মুখীন হওয়ার ও আত্মশক্তির চরম পরীক্ষা করার স্পৃহা এই সময়েই সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। যে সব নির্জন পথে তাঁহার সহচরেরা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃবোধ করিত, শিবাজী সেই সব

---

(১) Rajwadi, quoted in Kincaid Parsins *History of Maratha.*

স্থানে অবাধে যাতায়াত করিতেন। উচচ দুরারোহ পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ শিলাময় ঋজু শিখরে তিনি প্রয়োজন হইলে হামাগুড়ি দিয়াও আরোহন করিতেন এবং ঐ সব স্থানে রচিত বাসা হইতে ঈগল ও পীতবর্ণের শকুনিদলকে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিতেন। কালক্রমে তাঁহার পুনায বসতবাড়ীর সহিত তাহার যেরূপ অন্তরঙ্গতা ছিল সেইরূপ অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হইল এই বন্য শিলাময দেশের প্রতি-ক্রোশ জমির সহিত। সুরক্ষিত পাহাড়িয়া গ্রামবাসিরা এক অচেনা লোকের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ঘন ঘন যাতায়াতের প্রথম সংবাদে সন্দিহান হইলেও অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দন করিতে লাগিল। সকলের সঙ্গেই তিনি হাসিমুখে কথা বলিতেন। তাঁহার হাসি কি প্রকার আশ্চর্য্যরূপে লোককে আকর্ষণ করিত তাহা শিবাজীর স্মৃতিকথা যাহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের লেখা হইতে জানা যায়। এই পাহাড়িয়া লোকেরা একদিন মারাঠা সৈন্যবাহিনীর মেরুদণ্ডরূপে গণ্য হয়।

সারাদিন বনে বনে ঘুরিযা সন্ধ্যায় শিবাজী পুনায় ফিরিয়া আসিতেন। তাহার পিছনে থাকিত বেগুনী রঙের গিরিশ্রেণী আর সম্মুখে তরঙ্গায়িত হলুদ রঙের শষ্যক্ষেত্র। প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের রীতি অনুযায়ী শিবাজী বাড়ী ফিরিয়া প্রথমেই মাতৃ সন্দর্শনে যাইতেন। মাতা তখন সাধারণতঃ ভিতর বাড়ীর উঠানের মধ্যস্থলে স্থাপিত বেদীর সম্মুখে বসিয়া বিষ্ণুর পূজায় নিযুক্ত থাকিতেন। বেদীর উপরে একটি তুলসী গাছ রোপিত ছিল। মাতা প্রদীপ হাতে বেদীর চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতেন। ঘনায়মান অন্ধকার পরিবেশে প্রদীপটি ঠিক যেন একটি সোনার পদ্মের মত দেখাইত। পূজা শেষ হইলে তিনি শিবাজীর সহিত কথা বলিতেন। মাতা এবং পুত্র পরস্পরের প্রতি এত আকৃষ্ট ও নির্ভরশীল ছিলেন যে তাঁহারা ঠিক প্রেমিক যুগলের মত একে অন্যের আশা আকাঙ্খা সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব লইয়া সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

অল্পক্ষণ পরে শিবাজী মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নৈশভোজের জন্য প্রস্তুত হইতেন। কারণ হিন্দু পরিবারে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের পৃথকভাবে আহার করিবার নিয়ম। শিবাজীর রাত্রিবেলার আহার ছিল

একটু অদ্ভুত রকমের। স্তম্ভশ্রেণীপূর্ণ বহিরাঙ্গণে বসিয়া তিনি আহার করিতেন। ঈষৎ লোনা সামান্য পরিমাণ ভাত, দুধ অথবা দুইচারিখানা মকাইয়ের চাপাটি আহারের জন্য পরিবেশন করা হইত। শিবাজী একটি থামে হেলান দিয়া বসিয়া কলার পাতায় পরিবেশিত অন্নগ্রহণ করিতেন। কলার পাতার চারিদিকের মেঝে পরিচারিকেরা নানা রঙের চকখড়ি দিয়া চিত্রাঙ্কিত করিয়া রাখিত। আহারের পরে আরম্ভ হইত দাদাজীর সহিত নানা প্রকার শাস্ত্র সংলাপ . . .

এইভাবে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে শিবাজী যৌবনে পদার্পণ করিলেন। ইউরোপীয়দিগের মানের অনুযায়ী শিবাজী ছিলেন মাথায় একটু খাটো। কিন্তু তাঁহার স্কন্ধ ছিল চওড়া এবং শরীরের গড়ন শক্ত ছিল। তাঁহার বাহু দুইটি ছিল অসাধারণ রকমের লম্বা। শিবাজী দাড়ি ও গোঁফ রাখিতেন। মস্তকের পাগড়ির তলা হইতে চূর্ণকুন্তল তাঁহার মুখমণ্ডলের এক পাশে দুলিত। তাঁহার চোখ দুটি ছিল অতি সুন্দর। চোখের চিন্তাশীলতা ও কোমলতার আভাষের সহিত তাঁহার ঈগল পাখীর ঠোঁটের ন্যায় ধনুকাকৃতি নাসিকার তুলনামূলক পার্থক্য লক্ষণীয়। ফরাসী পর্যটক থেবেনো (Thevenor) তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "শিবাজীর আকৃতি কিঞ্চিৎ খাটো, কিন্তু তাঁহার চোখে সর্বদা একটা প্রফুল্লতার দীপ্তি দেখা যাইত।"

বোম্বাইয়ের ইংরাজ পাদ্রী শিবাজীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাঁহার আকৃতি ছিল, "লম্বা এবং দোহারা; শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনায় তিনি ছিলেন অতিশয় নিপুণ ও তৎপর; যখনই কথা বলিতেন তখনই তাঁহার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিত; তাঁহার চোখের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ ও প্রখর।"

দ্বিতীয় খণ্ড

বিদ্রোহী

পঞ্চম অধ্যায়

শিবাজীর বয়স তখন উনিশ। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া উচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রতিজ্ঞা হইতে তিনি তিলমাত্র বিচলিত হন নাই। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। দাদাজী তাঁহার মধ্যে একটি উদীয়মান যুবকের ছবি দেখিতেন। শিবাজী মুসলমান রাজ সরকারে একদিন উচ্চপদস্থ কাজে জীবন অতিবাহিত করিবেন তিনি এইরূপ মনে করিতেন। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও শিবাজী তাঁহার পিতা ও পিতামহের ন্যায় বিশিষ্ট সৈন্যাধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার সমধর্ম্মী হিন্দুদিগের সম্মান ও শ্রদ্ধাভাজন হইবেন—দাদাজী মনে মনে এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। জীজাবাই এবং শিবাজী হিন্দু স্বাধীনতার—স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিতেন এবং কথা প্রসঙ্গে ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতেন। কিন্তু সাংসারিক লোকেরা এই মধুর স্বপ্নে সুখবোধ করিলেও তাহাদের নিকট ইহা ছিল অসাধ্য সাধন করার লিপ্সার মত অলীক ও অসম্ভব।

এই প্রকারের কোন কাজে অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা বিপত্তিও ছিল অনেক। সুদূর দক্ষিণে সামান্য কয়েকটি রাজ্যের কথা বাদ দিলে সমগ্র ভারতে তখন কোন হিন্দুরাষ্ট্র ছিল না। রাজপুতগণ বহুপূর্ব্বেই মুঘল সামরিক শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মুঘল সেনাপতিরূপে নিযুক্ত হইতে পারিলে রাজপুত রাণারা খুসী হইতেন এবং রাজপুত দুহিতাদিগের জন্য মুঘল অন্তঃপুর হইতে আহ্বান আসিলে তাঁহারা আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেন। মহারাষ্ট্র দেশেও তখন আপাতঃদৃষ্টিতে কোনরূপ পরিবর্ত্তনের আকাঙ্খা দেখা যায় নাই। সাধারণতঃ লোকেরা বর্ত্তমান অবস্থা মানিয়া লইয়া অদৃষ্টের উপর হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। হিন্দু

স্বাধীন রাজ্যের যুগ এত কাল পূর্ব্বে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে যে স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব প্রণিধান শক্তিও লোকের মন হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইতেছিল।

দিল্লীর অথবা বিজাপুরের মোস্লেম রাজপ্রাসাদের বাহ্য জাঁকজমক ও চাকচিক্য লোকজনের নিকট রাজ্যের শ্রী, স্থায়িত্ব ও সঙ্গতির নিদর্শন বলিয়া মনে হইত। মারাঠা চাষী এবং অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে শুধু আংশিক নিপুণ পাহাড়িয়াদের লইয়া গঠিত সৈন্যদল প্রাদেশিক শাসকের বেতন-ভুক হাবসী সেনাদের সহিতও প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ বিবেচিত হইত না—যুদ্ধে জয়লাভ তো দূরের কথা।

শিবাজীর জায়গীর ছিল বিজাপুর রাজ্যের সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত কতিপয় দুর্গপরিবেষ্টিত সীমান্ত প্রদেশ। ঐ দুর্গগুলি যে সীমান্ত রক্ষার জন্যই ব্যবহৃত হইত এমন নহে, উহাদের সাহায্যে স্থানীয় লোকজনকে ভয় দেখাইয়া শাসনাধীন রাখাও অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। পুণার পশ্চিম দিকে সৈহাদ্রি (Sahyadri) গিরিশ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি দুর্গ ছিল। এই পার্ব্বত্য অঞ্চল মধ্যভারতের মালভূমি ও সমুদ্র উপকূলে নিম্নভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত। কোন রাজ্যের এলাকা এই মালভূমি ও নিম্নভূমি উভয়ের উপরই বিস্তৃত থাকিলে তাহার পক্ষে এই দুইয়ের মধ্যে পার্ব্বত্য সেতু সুদৃঢ়রূপে আয়ত্ত্বাধীনে রাখার প্রয়োজন অতি সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়-মান হইত। ইতিপূর্ব্বেই শিবাজী তাঁহার স্বকীয় শাস্ত এবং অভীষ্ট-লাভের উপযোগী উপায়ে মুসলমান রাজত্বের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বিদ্রোহীর পক্ষে সাময়িক সফলতা লাভের একমাত্র সুযোগ এই পর্ব্বতশ্রেণীর সেতুর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

পুণার অনতিদূরে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে তোরণা নামক একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। অমসৃণ ও অমার্জিত প্রস্তরখণ্ড জড়ো করিয়া প্রস্তুত গিরিপথের মুখে দণ্ডায়মান এই বৈচিত্র্যহীন দুর্গ সেনানিবাস রূপে ব্যবহার করা হইত। গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হইলেও বর্ষা আরম্ভ হইলেই জায়গাটা অস্বস্তিকর হইয়া উঠিত। তখন আঁকাবাঁকা গিরিপথগুলি প্রায় অনতিক্রম্য হইয়া যাইত। গ্রামাঞ্চল হইতে শাক-সব্জি বা টাটকা মাংস

বিক্রয় করিতে কোন ফেরিওয়ালা সেনানিবাসে আসিত না। সৈন্যরা বৃষ্টিতে ভিজে স্যাঁতসেঁতে ঘরের মধ্যে গায়ের ঢোলা জামাগুলি শক্ত করিয়া আঁটিয়া একটা গামলায় আগুন জ্বালাইয়া উহার চারিদিকে জড় হইয়া বসিয়া অসন্তোষভরে বিড়বিড় করিত, আর মনে মনে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া অভিশাপ বর্ষণ করিত। দুর্গের সেনাপতিও সাধারণ সৈনিকদের মত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট ছিলেন। তখন ঐ অঞ্চলে কোনো যুদ্ধবিগ্রহ ছিল না এবং স্থানীয় লোকদের মধ্যেও আপাতঃ-দৃষ্টিতে কোনরূপ প্রতিকূল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কাজের অভাবে ও একঘেঁয়ে সঙ্গীর সংসর্গে দীর্ঘকালব্যাপী বর্ষার মাসগুলি মানসিক অবসাদ ও ক্লান্তির মধ্যে কাটিত। পরিশেষে ১৬৪৬ সালের বর্ষার সময় সেনাপতির ধৈর্য্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার গতিবিধি সম্বন্ধে রাজধানীতে কোন সংবাদ না দিয়া তিনি সৈন্যদের লইয়া সমতল ভূমিতে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে বর্ষা একটু কমিলে পুনরায় তাঁহারা তোরন দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। যে সব পাহাড়িয়াদের শিবাজী কিছুকাল যাবত সামরিক শিক্ষা দিতেছিলেন তাহাদেরই একদল যোদ্ধা লইয়া তিনি অকস্মাৎ এই পরিত্যক্ত দুর্গের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন ও উহার অস্ত্র ও ধনাগার লুণ্ঠন করেন। এইবাবে তিনি তাঁহার অনুচরদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করার সুযোগ পাইলেন।

দুর্গাধ্যক্ষ মুসলমান সেনাপতির নিকট এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার সংবাদ পৌছিবামাত্র তিনি ইহা বিজাপুর রাজসরকারের গোচরীভূত করেন। এমন কি শিবাজীর শিক্ষক ও অভিভাবক দাদাজী পর্য্যন্ত বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিয়া তাঁহার শিষ্যকে আতঙ্কমিশ্রিত ভর্ৎসনা করিয়া চিঠি দিলেন। ইহার উত্তর না পাওয়ায় দাদাজী উত্তেজিত হইয়া আসন্ন বিপদের সম্বন্ধে শিবাজীর পিতার নিকট চিঠি লেখেন। শাহজী এই পত্রের বিষয়বস্তুর উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে পুত্রতো সর্ব্বদাই গোলমাল বাঁধাইতে ওস্তাদ; এইবার সঙ্কট-জনিত ফাঁদে পা দিয়াছে; কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

ইতিমধ্যে শিবাজী এক দূতের মারফত বিজাপুর দরবারে তাঁহার কাজ সমর্থন করেন। তিনি বিজাপুর সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার

করিয়া স্পষ্টভাবে বলেন যে দুর্গাধ্যক্ষ সেনাপতির (কিল্লাদারের) অকর্ম্মন্যতা প্রমাণ করিবার জন্যই কেবল তিনি দুর্গে প্রবেশ করেন। আব-হাওয়ার ক্লেশের অজুহাতে যে সৈনিক ঘাঁটি ছাড়িয়া পলায়ন করে সে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদের অনুপযুক্ত। এইরূপ সরল ও অকপট উক্তির দ্বারা শিবাজীর কাহাকেও প্রবঞ্চনা করার ইচ্ছা ছিল কিনা সে প্রসঙ্গ বর্তমানে অবান্তর। তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আরও কিছু সময় হাতে পাওয়া। শিবাজীর প্রতিনিধি ঐ হতভাগ্য কিলাদারের বিরূদ্ধে একের পর এক অভিযোগ ও নালিশ উপস্থিত করিয়া বিজাপুরের কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। অধিকন্তু অধিকৃত দুর্গের রাজকোষের অর্থের বিনিময়ে বিজাপুর দরবারের কর্ম্মচারিদিগকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া এই তদন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া চালানও শিবাজীর অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। এদিকে বিজাপুর দরবারে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে আর শিবাজী সারা বর্ষাকালব্যাপী অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া তোরণা হইতে ছয় মাইল দূরে বিজাপুর হইতে ঐদিকে প্রবেশ পথে রাযগড় নামক এক পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া উহা দৃঢ়রূপে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কোণ্ডনা বা সিংহগড় নামক মুসলমান-দিগের পররর্ত্তী বৃহৎ নগরদুর্গ পুনা হইতে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। শিবাজী উহার মুসলমান কিল্লাদারকে ঘুষ দিয়া ঐ দুর্গে প্রবেশ করেন এবং প্রায় বলপ্রয়োগ ব্যতীতই উহা দখল করেন।

পুনার দক্ষিণে শেষ নগর দুর্গটির নাম ছিল পুরন্দর। উহার নির্দয়, নিষ্ঠুর কিলাদার এক অতি তুচ্ছ অপরাধের অভিযোগে নিজের স্ত্রীকে বন্দুকের গুলিতে নিহত করান। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পদ উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহার পুত্রের প্রাপ্য, এই ছিল নিয়ম। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার লইয়া ভীষণ বিবাদ আরম্ভ হয়। প্রত্যেক পুত্রই নিজের দাবির সমর্থনে বিজাপুরে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। কিন্তু মুসলমান শাসনের দীর্ঘসূত্রী রীতির ফলে তৎপরতার সহিত কোন উত্তর পাওয়া গেল না। এদিকে কেরাণীরা

ব্যস্ত সমস্তভাবে দরখাস্ত ও পাল্টা দরখাস্ত লিখিতে লাগিল। নজিরের পর নজির উল্লেখ করিয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। আর একের হইতে অন্যের হাতে উৎকোচের অর্থ বিনিময় হইতে লাগিল। তিনটি পুত্রকেই উত্তেজনাপূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাইতে হয়। উহারা কেহই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অথবা নিজের দাবি ছাড়িতে কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল না, বরং সন্দিগ্ধ এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মানসিক যন্ত্রনা ও পীড়ন সত্ত্বেও দুর্গের মধ্যেই বাস করিতে লাগিল। উহাদের কলহ ক্রমশঃ অধিকতর হিংসাত্মক হইয়া উঠিল। অবস্থার সুযোগ লইয়া শিবাজী প্রচ্ছন্ন স্পর্ধা ও ধৃষ্টতার সহিত এই ব্যাপারে সালিসী করিবেন বলিয়া প্রস্তাব করেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে এইরূপ অনধিকার ও ধৃষ্টতামূলক প্রস্তাব অত্যন্ত ক্রোধ ও উপেক্ষার সহিত প্রত্যাখাত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কলহের উত্তেজনায় দুর্বল ও নিস্তেজ তিন ভ্রাতাই যে কোনওরূপে এই অসহনীয় অবস্থা হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য শিবাজীর প্রস্তাব আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেন। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ঐ বৎসরও বর্ষার শেষে দুর্গে দীপমালার আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা হয়। ঐ উৎসবে শিবাজী নিমন্ত্রিত হন এবং তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এখনকার মত তখনও ঐ অঞ্চলে বর্ষাকালের ঝঞ্ঝাবর্ত ও বৃষ্টির জল হইতে রক্ষার জন্য গৃহগুলির উপরে অতিরিক্ত এক প্রস্থ খড়ের ছাউনি দেওয়া হইত। মস্তকে খড়ের আঁটি লইয়া কুলিরা দলে দলে পাহাড়ের চড়াই পথে উপরে উঠিয়া নগর দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিত। আলোচ্য ঘটনার সময় কয়েক সপ্তাহ যাবত শিবাজীর অনুচরদের মধ্যে অনেকে সহজ ও অনাড়ম্বর ভাবে কুলিদের সহিত মিশিতে লাগিল। শরীরের কোমর পর্য্যন্ত নগ্ন এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘাসের বোঝার চাপে বক্রদেহে তাহাদিগকে অবিকল কুলির মতই দেখাইত। কিন্তু এই ঘাসের বোঝার মধ্যে তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিল। দুর্গের প্রহরীদের যে প্রত্যেক কুলিকেই তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম প্রচলিত ছিল না - এবং তাহাদেরও সন্দেহ করিবার কোন কারণ ঘটে নাই।

ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য দ্বিতীয়

ও তৃতীয় ভ্রাতা নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে আরম্ভ করিল। পক্ষপাতশূন্য যে কোন বিচারক যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেই পিতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন ইহা মনে করিয়া তাহারা ভয় পাইয়াছিল। শিবাজীর অভ্যর্থনার জন্য এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হয়। সাধারণতঃ মিতাচারী মারাঠারা এইরূপ ভোজে প্রচুর মদ্যপান করিত। জনৈক সুনীতিবাগীশ ইংরাজ অধ্যক্ষ (১) তাহাদের মদ্যপানের পরিমাণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। (তবে তাহারা বাস্তবিক মদ্যপানে ইংরাজ সৈনিকদের হারাইতে পারিত কিনা তাহাও বিবেচ্য!) কঠোর মন্তব্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "সারারাত তাহারা এমন নিম্নস্তরের লাম্পট্যে ব্যাপ্ত ছিল যে ইহা দেখিলে কোমসের (Comus) অকৃত্রিম উপাসকেরা এবং তাহার জঘন্য অনুচরেরাও ঈর্ষান্বিত হইত। এইরূপ পানভোজ উৎসবের হৈ-হল্লার মধ্যে কনিষ্ঠ দুই ভাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিতে আরম্ভ করে এবং তাহাকে আক্রমণ করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলে! তারপর তাহারা শিবাজীর সহিত ভাগ্যবন্টন সম্বন্ধে দরদস্তুর করিতে আরম্ভ করে। শিবাজী যে খুব বেশী মদ্যপান করিতেছিলেন তাহা মনে হয় না, কারণ যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই পানাহারে শিবাজীর কঠোর বাধা-নিষেধ মানিয়া চলার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। নেশায় উত্তেজিত ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রস্তাবে শিবাজী কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বলেন যে এসব ক্ষেত্রে হঠাৎ কোন মত না দিয়া সবদিক বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক। তিনি উভয় ভ্রাতাকে পরের দিন তাঁহার সহিত অবগাহনের জন্য আমন্ত্রণ করেন। নগরদুর্গের প্রাচীরগাত্র বহিয়া প্রবাহিত একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীতে তাঁহারা পূর্ব্বের ব্যবস্থা মত স্নান উপভোগ করিতে লাগিলেন। বর্ষার বারিপাতের পরে প্রবাহিনীর জল শীতল কিন্তু একটু ঘোলাটে, দুই পারে ফুলের প্রাকৃতিক শোভা, পাহাড়ের গায়ে লতার বাহার ঠিক যেন সবুজ মনিমানিক্যের মতন দুলিতেছে। গতরাত্রে যেন অপ্রীতিকর কোন কিছুই ঘটে নাই এইভাবে শিবাজী ও ভ্রাতৃদ্বয়

(১) See Broughton, letters from Maratha Camp

হাসি-ঠাট্টার মধ্যে স্নান করিতেছিলেন। স্নান শেষ হইলে তাঁহারা মনের আনন্দে নগরদুর্গে প্রবেশপথের দিকে অগ্রসর হন। হঠাৎ দুই ভাই থামিয়া গিয়া বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া দেখেন যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তুর্কী-বিজাপুরী রাজ্যের পতাকা সিংহদ্বারের চূড়া হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে এবং অচেনা ও অদ্ভুত রকমের বন্য পাহাড়িয়া সৈন্যেরা দ্বার পাহারা দিতেছে। হতভম্ব ভ্রাতৃদ্বয় চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ইহারা কাহার সৈন্য?" শিবাজী শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন যে তিনি ইহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ক্রোধে উন্মত্ত দুই ভাই এই প্রকার প্রতারণা ও ছল চাতুরীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলে শিবাজী তাহাদিগকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি তাঁহাদের আচরণ স্মরণ করাইয়া দেন। তারপর কৌশলে পরাজিত শত্রুদের প্রতি তাঁহার স্বভাবসুলভ অবজ্ঞার সহিত তিনি তিন ভাইকেই স্থানান্তরে ছোটছোট জায়গীর দান করার প্রস্তাব করেন। ভ্রাতৃত্রয় উহাতেই সন্তুষ্ট হইল। দুর্গের পেশাদারী স্থায়ী সৈন্য শিবাজীর নিয়োজিত সৈন্য অপেক্ষা সংখ্যায় কম ছিল। নিয়ম-কানুনহীন শিবিরে কলহরত তিনি ভাইয়ের অধীনে কাজ করা অপেক্ষা তাহারা সাগ্রহে শিবাজীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইল। উহারা ছিল বেতনভূক ভাড়াটে সৈন্য। ভাগ্যান্বেষী মারাঠা যুবকের নেতৃত্ব তাহাদিগকে সহজেই আকর্ষণ করে।

এই ভাবে মাত্র এক বৎসরের মধ্যে বিজাপুর রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ যখন তোরণা দুর্গের অধিকারের বৈধতা এবং অবৈধতার সম্বন্ধে বাকবিতণ্ডায় ব্যস্ত সেই সময় বিনা রক্তপাতে শিবাজী পূর্ব্বদিকের মালভূমি ও সমুদ্র উপকূলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় দুর্গ শ্রেণী দখল করিয়া লইলেন। এই দুর্গমালা দুইদিকে সংযোগ রক্ষার সেতুবন্ধনের ন্যায় ব্যবহার করা যাইত এবং বিজাপুর হইতে শিবাজীর জায়গীর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রবেশ পথগুলি সংরক্ষণে বিশেষ কার্য্যকরী হইল।

বিজাপুর রাজ্যের শাসন কর্ত্তৃপক্ষের অলসতা অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে। তবে বর্তমান কালের কার্য্যপ্রণালীর সুষ্ঠু শৃঙ্খলা ও সংবাদাদি আহরণের নানাবিধ উপায় ও কৌশল যে ঐ সময়ের শাসনকার্য্যে আরোপ করা উচিত নহে একথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। এ কথাও

মনে রাখা প্রয়োজন যে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও প্রতিদ্বন্দ্বী পাশ্চাত্য রাজ্য সমূহের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্ব্বেই পরস্পরে মারামারি আরম্ভ হইয়া যাইত অথবা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার সংবাদ অবিদিত থাকায় অনেক সময় উভয় পক্ষে লড়াই চলিতে থাকিত। বিজাপুর রাজ্যের শাসনতন্ত্র ছিল অত্যন্ত শিথিল। সামরিক প্রতিষ্ঠান নির্ভর করিত খানিকটা ভাড়াটে সৈন্যদের সহায়তার উপর এবং খানিকটা স্থানীয় ধনী ভূম্যধিকারিদিগের প্রদত্ত খাজনার উপর। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কোন জায়গীরদার বিজাপুরের নবাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নগরদুর্গাদির দেয় খাজনা সরকারের নিকট জমা করিয়া দিলে দুর্গ যে কাহার দখলে আছে তাহা লইয়া রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ খুব মাথা ঘামাইতেন না। শিবাজী একদিকে তাঁহার কাজের সমর্থনে একের পর এক কৈফিয়ৎ পেশ করিতে লাগিলেন এবং অপরদিকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জায়গীরদারের নগরদুর্গ হইতে যে পরিমাণ খাজনা বিজাপুর সরকারের নিকট পাঠাইতেন তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী খাজনা পাঠাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে লাগিলেন। শিবাজী যাহাই করুন না কেন কয়েকটি স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীকে দরবারে আইনতঃ সোপর্দ করা ছাড়া তাঁহার যে আর কোন উদ্দেশ্য আছে তাহা কেহই মনে করেন নাই। তিনি খুব ত্বরিতগতিতে কাজ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে আপাতঃদৃষ্টিতে কোন হিংসাত্মক কাজের প্রমাণ না পাওয়ায় সমস্ত ব্যাপারটা কেমন অস্পষ্ট মনে হইত। এদিকে আর এক ঘটনায় নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইল। রাজধানী বিজাপুর নগরে এখন সকলেই সুলতান এক রহস্যজনক পীড়ার আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে লইয়া এত ব্যস্ত হইয়া পড়িল যে রাজ্যের সীমান্তের নিকট এক ক্ষুদ্র জায়গীরদারের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার ও অভিযান লইয়া কাহারও মাথা ঘামাইবার সময় বা সুযোগ ছিল না। সুলতানের প্রতি একান্ত অনুরক্ত এক জাদুকরের অদ্ভুত কলাকৌশল প্রয়োগের ফলে এ যাত্রায় তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। কিম্বদন্তী এই যে জাদুকর ঐন্দ্রজালিক মায়াবিদ্যা দ্বারা স্বীয় জীবনের কয়েক বৎসর সুলতানের জীবনের সহিত যোগ করিয়া দেন।

পরের বৎসর (১৬৪৭) শিবাজীর শিক্ষক ও অভিভাবক দাদাজী

অসুস্থ হইয়া পড়েন। অতিরিক্ত বার্দ্ধক্যে এবং সম্প্রতি অল্পকয়েক মাসের নানা প্রকার ঘটনায় তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শিবাজী পুত্রের ন্যায় ব্যাকুলতা ও একাগ্রতার সহিত তাঁহাব সেবাশুশ্রূষা কবেন। বিবর্ণ চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া বৃদ্ধ দাদাজী একদিন বলেন যে তিনি শিবাজী কর্ত্তৃক বিজাপুর রাজ্যের দুর্গসমূহ দখল করার বিষয়ে মাঝে মাঝে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন বটে কিন্তু শিবাজীর মঙ্গলের জন্যই তিনি ঐরূপ বলিতেন। কোনরূপ কাজের দ্বারা গুরুদেবের মনোবেদনার কারণ ঘটাইয়া থাকিলে, শিবাজী ভাবে অভিভূত অর্দ্ধস্ফুট স্বরে তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিবামাত্র সহসা শিবাজীর ভবিষ্যত মহত্ব ও গৌরবান্বিত জীবনের প্রনিধান যেন মমূর্ষু দাদাজীকে উদ্বুদ্ধ করে এবং ক্ষমতা লাভ কবিলে হিন্দুদিগের পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্ধার কবিতে হইবে—এই মর্ম্মে তিনি শিবাজীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান। তারপব শিবাজীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দাদাজী দেহত্যাগ করিলেন।

দাদাজীর তিরোধান শিবাজী অতিশয় মর্ম্মান্তিক ভাবে বোধ করিলেন; কারণ তাঁহার নিকট শিবাজীর ঋণ যে কত গভীর তাহা শিবাজী বেশ ভালভাবেই জানিতেন। পুনার প্রাসাদের বহিরাঙ্গনের দৃশ্যে একটা গম্ভীর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। সেই স্থানের দে'ওয়ালের পাশে আব স্তূপীকৃত সংস্কৃতে লেখা কবিতার পুঁথি জড় করিয়া রাখা হইত না; যে ছোট জলচৌকির মত ডেস্কের উপর ভর করিয়া দাদাজী ঘন্টার পর ঘন্টা হিসাব পরীক্ষা করিতেন বা জায়গীরভুক্ত বিভিন্ন তালুক হইতে আগত বিবরণীর কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেন সেই ছোট টেবিলখানাও আর সেখানে ছিল না। শিবাজীর মাতা অবশ্য সর্ব্বদা ভিতরের অঙ্গনে অবস্থান করিতেন। আর সেখানে সর্ব্বক্ষণ থাকিতেন তাঁহার স্ত্রী। শিবাজী ইতিমধ্যে সইবাই নামক একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। কবে এবং কোথায় যে তিনি দারপরিগ্রহ করেন তাহা জানা নাই। তবে ইহা সুবিদিত যে তাঁহার স্ত্রী সইবাই ছিলেন অতিশয় নিরীহ ও নিঃস্বার্থ প্রকৃতির রমণী। তিনি নিঃশব্দে শান্তভাবে সর্ব্বদা জীজাবাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত থাকিতেন। মারাঠারা কোনকালেই পর্দ্দাপ্রথা সমর্থন করিত না। এমনকি অনেক রমণী

ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে নিরালায় থাকিতে ইচ্ছুক ও উচ্চাকাঙ্খাবিহীন অন্তঃপুরবাসিনী রমণী সাধারণতঃ ইতিহাসের বিশেষ কোন উপাদান সরবরাহ করেন না। সুতরাং মারাঠা ঐতিহাসিকেরা সইবাই এর সম্বন্ধে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সামান্য কয়েকটি স্তোকবাক্য উচ্চারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু সইবাই-য়ের এবং তাঁহার মত ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক রাণীর সমাধিস্থানে নিম্নলিখিত উক্তিটি সহজেই লিপিবদ্ধ করা যায় :—

"এই সামান্য প্রাণীর সমাধি কোন পাপিয়ার গানে ঝঙ্কারিত হইবে না বা কোন প্রজাপতির পাখার স্পন্দন পাইবে না।"

উপরোক্ত কথা কয়টি সম্রাজ্ঞী নূরজাহান তাঁহার সমাধির উপর প্রস্তর-ফলকে লিপিবদ্ধ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার সম্বন্ধে উহা একেবারেই প্রযোজ্য নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিবাজীর প্রাথমিক সাফল্যে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের হিন্দুরা খুব পুলকিত বোধ করে। দলে দলে মারাঠারা লাঙ্গল ছাড়িয়া এবং ব্রাহ্মণ যুবকেরা লেখাপড়া ছাড়িয়া শিবাজীর সৈন্যশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। ক্রমবর্দ্ধমান অনুচরদিগের বেতন দেওয়া ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা এখন এক সমস্যা হইয়া দাড়াইল। বিজিত দুর্গশ্রেণীর পার্ব্বত্য সেতু হইতে শিবাজী পূর্ব্বদিকের সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী নীচের সমতল উর্ব্বরা ভূমির দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

বিগত যুদ্ধে এই এলাকার অপেক্ষাকৃত কম অত্যাচার হওয়ায় উপরের মালভূমির তুলনায় ইহার সম্পদ বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ইহার ধার দিয়া কতকগুলি দুর্গ এবং বাণিজ্যনগরী অবস্থিত ছিল। ভ্রাম্যমান আফ্রিকা ও আরবদেশের বণিকদিগকে প্রায়ই কুণ্ডলীকৃত দলবদ্ধভাবে এখানে আঁকাবাঁকা পথে চলিতে দেখা যাইত। তাহাদের পায়ের নীচে লাল রাস্তা ও মাথার উপর ঘন পল্লবিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বটগাছের সমন্বয়ে এক চমৎকার দৃশ্যের সৃষ্টি হইত। বটগাছগুলির উপর হইতে

ঝুলিয়া পড়া ধূসর রঙের শিকড়গুলি মাকড়সার জালের মত হাওয়ায় দুলিত, আর পিতল রঙের বল্কলে আচ্ছাদিত বৃক্ষকাণ্ডে চিকির মিকির শব্দ করিয়া তোতাপাখিগুলি যখন উড়িয়া আসিত তখন গোলাকৃতি ছোট ছোট ফল গুলি টপ্ টপ্ করিয়া ঝড়িয়া পড়িত। ইরাণী ও হাবসী বণিকেরা বৃহৎ অট্টালিকায় আরামে বাস করিত। বাড়ীগুলির বাহিরের দেওয়ালে অঙ্কিত গাছের ও ফুলের শোভার একটা প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল আবহাওয়া যেন সর্ব্বদাই বিরাজ করিত। এই প্রদেশের সর্ব্বোত্তম শহরের নাম কল্যান। বহুকাল পূর্ব্বেও পিতল, কাঠ এবং জরিদার রেশমী বস্ত্র-শিল্পের বাণিজ্যের কেন্দ্র বলিয়া ইহা গ্রীকদেশের লোকেদের নিকট সুপরিচিত ছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের যুবকেরা এখানে বাস না করিয়া বিজাপুর নগরে ভাগ্যান্বেষনে চলিয়া যাইত। এখানকার পথে ঘাটে শুধু প্রাদেশিকতার ভাবপূর্ণ অলস ব্যক্তিদের মন্থরগতি চোখে পড়িত। কি গ্রীষ্মে, কি শীতকালে গরম অথচ স্যাঁতসেঁতে অবসাদে জড়িত বিশেষ পরিবর্ত্তনহীন আবহাওয়া সত্ত্বেও এই শহরের উদ্যানগুলির ফুলের বাহার ও বড় বড় বৃক্ষের সৌষ্ঠব বিখ্যাত ছিল। দুইদিকে খুঁটির উপর নির্ম্মিত ধীবরদিগের কুঁড়ে ঘর ও তালবৃক্ষের শ্রেণী এবং কর্দমযুক্ত চক্‌চকে তীরের মধ্য দিয়া একটি শীর্ণা নদী ধীরগতিতে প্রবাহিত। জাঞ্জীবার ও মস্কট হইতে আগত জাহাজগুলি ওখানে নোঙ্গর ফেলিয়া অবস্থান করিত, আর এদিকে সরু ও উচচ গলুই যুক্ত মাছের নৌকাগুলি স্রোতের অনকূলে ভাসিয়া চলিত। নৌকার দাড়ের শব্দ তন্দ্রাচ্ছন্ন মধ্যাহ্নে স্পষ্ট শোনা যাইত। ধ্বংসোন্মুখ নগরীর প্রাচীরগাত্রে বিজাপুর রাজ্যের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নকশায় পতাকা সমুদ্রের হাওয়ায় দুলিত।

ঐ প্রদেশের শাসক মৌলানা আহম্মদ আরব দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া বিজাপুরের সুলতানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৬৪৮ সালে গ্রীষ্মকালের এক অপরাহ্নে প্রাসাদে বসিয়া মৌলানা সাহেব ঝিমাইতেছিলেন। অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে ঐ প্রদেশের সারা বৎসরের খাজনা তিনি অতিশয় বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য একদল লোকের সহিত শকটে করিয়া বিজাপুর নগরীতে প্রেরণ করেন। সদর কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে খাজনা দেওয়ার কাজ ছিল প্রধান; এবং

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি ইহার তত্ত্বাবধানের জন্য কঠোর পাহারার ব্যবস্থা করেন। শকটসহ এইদল পাহাড়ের বিপরীত দিকে অবস্থিত মালভূমি অতিক্রম করিয়া বিজাপুরে পৌঁছিবার পথে এক গিরিদ্বারের মুখে উপনীত হয়। এখানকার এক অদ্ভুত দৃশ্য। সমতল বেলাভূমি হইতে গিরিশ্রেণী পরপর উপরে উঠিয়া গিয়াছে ও আঁকা বাঁকা জঙ্গলের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে কালো শিলাখণ্ডগুলি মাথা বাহির করিয়া আছে। উচ্চতম শিখরশ্রেণীর উপর ক্ষীণ মেঘের খণ্ডগুলি ঠিক মাথার উপরে মুকুটের মত দেখায়। বসতিহীন বন জঙ্গলে পূর্ণ এক বিস্তীর্ণ এলাকা। এখানে কেহ এককী আসিতে সাহস পায় না। কিন্তু সশস্ত্র পাহারাওয়ালাদের দলে ভয়ের কোন কারণ ছিল না। গিরিদ্বারে প্রবেশ করিবার সময় তাহারা দিনের উত্তাপ ও চড়াইপথে আরোহণের ক্লান্তি ছাড়া আর অন্য কোন বিষয় লইয়াই মাথা ঘামায় নাই। তাহাদের পিছনে গিরিপথের ঘাটির মুখে লোকজনের কোনরূপ গতিবিধি তাহারা লক্ষ্য করে নাই।

কিন্তু, তিনশত সঙ্গীসহ টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া শিবাজী ক্রমশঃ সঙ্কুচিত গিরিখাতের মধ্যে অলক্ষিতে উহাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছিলেন। গাড়ীর চাকার ক্যাঁচক্যাঁচ গড়গড়নি, শুকনা পাতার খরখরানি, ঘনতর জঙ্গলের মধ্যে বন্যজন্তুদের দ্রুতবেগে পলায়ন—প্রভৃতি মিলিয়া এক অদ্ভুত আওয়াজের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অবস্থায় হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে যে গুরুগম্ভীর স্বরে একদিন সারা ভারত কম্পিত হইত সেই বজ্রনিনাদ "হর হর মহাদেব," আর সঙ্গে সঙ্গে ভীত পাহারাদার সৈনিকেরা মারাঠাদের দ্বারা আক্রান্ত। ক্ষণকালের মধ্যেই এই খণ্ডযুদ্ধের সমাপ্তি এবং ধনরত্ন সহিত শকটগুলি শিবাজীর হস্তগত হয়। শিবাজীর এই প্রথম যুদ্ধে তাঁহার পক্ষের দশজন সৈনিকের মৃত্যু হয়। তিনি অনুচরদিগকে মুক্তহস্তে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করেন এবং মৃত দশজন সৈনিকের পরিবারবর্গকে বিস্তর অর্থ প্রদান করেন।

এদিকে মধ্যাহ্নের খরতাপে কল্যাণ শহরের হাট বাজার ও দোকানপাট জনহীন। এই অবসরে একদল মারাঠা অশ্বারোহী নিঃশব্দে প্রাসাদের দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়। তাহারা প্রাচীরগাত্রের বাসভবনে রক্ষীদলকে

কবলিত করে এবং প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রদেশপালকে বন্দী করিয়া ফেলে। অপরাহ্নের শীতল হাওয়ায় নগরবাসী সওদাগরেরা বাড়ির বাহির হইয়া দেখে যে আবাজি নামক এক মারাঠা যুবক প্রাসাদে অধিষ্ঠিত, আর প্রাসাদের সিংহদ্বারের দুইদিকে গৈরিক পতাকা উড্ডীয়মান।

দুই একদিন পরে শিবাজী স্বয়ং কল্যাণে উপস্থিত হইলেন। আরব-দেশীয় প্রদেশপালের পুত্রবধূ তখনও প্রাসাদের অভ্যন্তরে বাস করিতে ছিলেন। তাঁহাকে শিবাজীর নিকট আনা হইল। তাঁহার রূপের খ্যাতি পূর্ব্বেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি প্রবেশ করা মাত্র শিবাজী দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাসিমুখে বলেন, "আহা, আমার মা যদি আপনার অর্দ্ধেক রূপও পাইতেন তবে আমার চেহারা এত কুৎসিত হইত না।" তারপর তাঁহার আদেশে সর্ব্বপ্রকার আনুষ্ঠানিক উপহার প্রদানের পর সসম্মানে রক্ষীদল সমভিব্যহারে ঐ রমণীকে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রাসাদের অধিকারচ্যুত প্রদেশপালের সহিতও শিবাজী অনুরূপ ঔদার্য্যের সহিত ব্যবহার করেন। তিনি তাহাকে কারামুক্ত করিয়া সঙ্গে লোক দিয়া বিজাপুরে প্রেরণ করেন।

রাজস্ববাহী শকটের উপর আক্রমণ এবং কল্যাণ শহর অধিকার প্রকাশ্য বিদ্রোহের কাজ। তাঁহার পূর্ব্বকার আচরণের ন্যায় শিবাজী ইহা বাজে কৈফিয়ৎ দিয়া এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন না।

কল্যাণের গদিচ্যুত প্রদেশপাল মৌলানা আহম্মদ শোকসূচক কৃষ্ণ-পোষাক পড়িয়া নাটকীয় ভঙ্গীতে সুলতানের দরবারে উপস্থিত হইলেন। সিংহাসনের পদপ্রান্তে আসিয়া মাথার পাগড়ি মাটিতে রাখিয়া হাতের তালু দিয়া কপালে বারবার করাঘাত করিতে করিতে যে বিদ্রোহী তাঁহাকে এত সহজে ও আকস্মিক ভাবে আক্রমণ করিয়া স্থানচ্যুত করিয়াছে তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়া নালিশ জারি করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ সুলতান শিবাজীকে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ দিয়া এক দূত পাঠাইলেন। তারপর শিবাজীর উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করার সময় সুলতানের মনে পড়িল যে তাঁহার পিতা স্বয়ং বিজাপুর সরকারের অধীনে কাজে নিযুক্ত আছেন। তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে গেপ্তার করিয়া দরবারে উপস্থিত করান হইল।

শিবাজীর বিরুদ্ধে বর্ণিত অপকার্য্যের অভিযোগ সম্বন্ধে শাহজী যে কিছুই জানেন না ইহা তিনি অকপটে হলফ করিয়া প্রকাশ করেন। পুত্রের সাংঘাতিক আচরণের কথা শুনিয়া তিনি সত্যই দরবারের অন্যান্য অমাত্যদের মত আঁতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু শিবাজীর নিন্দার্হ কাজের যে কোন অংশের নিমিত্তে তাঁহাকে দোষী মনে না করার জন্য তিনি সুলতানের নিকট সবিনয় প্রার্থনা করেন। শিবাজী শৈশবে অবাধ্য ছিলেন বলিয়া তিনি যে তাহাকে বিজাপুর হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছিলেন একথা শাহজী সুলতানকে স্মরণ করাইয়া দেন। তারপরে আর পুত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি তাহার জন্য উপযুক্ত অভিভাবক-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার কাজের ভাব উপলব্ধি করা কঠিন। যুবকের নিশ্চয়ই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়া থাকিবে। এমন কি তৎক্ষণাৎ একদল শক্তিশালী সৈন্য পাঠাইয়া শিবাজীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তিনি সুলতানকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে এই বিচক্ষণ পরামর্শ সুলতানের নিকট অতিরিক্ত সহজ ও অকপট বলিয়া মনে হইল। সন্দিগ্ধচিত্ত সুলতান মনে করিলেন যে পুত্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পিতা নিশ্চয়ই সব জানেন। এদিকে একজন স্থানীয় হিন্দুর এত উচ্চপদাধিকারে ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত সিংহাসনের নিকট আসীন বিশেষতঃ তুর্কী আফগানী ও হাবসী আমীরেরা সুলতানকে বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনার বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত শাহজী তাঁহার নির্দ্দোষীতা ঘোষণা করা সত্ত্বেও সুলতানের আদেশে তাঁহাকে দরবার কক্ষ হইতে বলপূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইল।

একথা স্পষ্ট যে এই সময় বিজাপুর কর্ত্তৃপক্ষ সক্রিয় দমননীতি অবলম্বন করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইলে শিবাজী ও তাঁহার পাহাড়িয়া অনুচরদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিতে পারিতেন। শিবাজীর বুদ্ধিমত্তা যত বেশীই থাকুক না কেন, কোন পেশাদার সেনাবাহিনীর সঙ্গে তিনি এবং তাঁহার অনুচরেরা কোনরূপেই সমকক্ষতা করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের উপযুক্ত অস্ত্র, শিক্ষা ও শৃঙ্খলা ছিল না। পরন্তু তাঁহারা ছিলেন মুসলমান সৈন্যদের যুদ্ধজয় এবং মুসলমান রাজত্বের সার্ব্বভৌম প্রভাব বিস্তারে অভ্যস্ত। কয়েকটি দুর্গ অধিকার ও একটি রাজস্বপূর্ণ শকট

লুণ্ঠন করায় তাহাদের খানিকটা আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু তুর্কী গোলন্দাজ বাহিনীর সম্মুখীন হইলে উহা কর্পূরের মত উবিয়া যাইত। কিন্তু আসল কথা এই যে বিজাপুরে তখন কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই যে তলে তলে সত্যই কোন কঠিন এবং সঙ্কটজনক পরিস্থিতি জমিয়া উঠিতেছে।

শিবাজীর ক্ষমতালাভের জটিল কাহিনী পর্য্যালোচনাকালে ইহা অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব আজকাল যে-ভাবে বিচার করা হয় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে সেভাবে বিচার করা হইত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিবাজীর ইউরোপীয় সমসাময়িক কন্‌ডে (Conde) এবং টুরেনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুই বিখ্যাত সেনাপতি কখনও নিজেদের দেশ ফ্রান্সের পক্ষে আবার কখনও প্রতিপক্ষ স্পেনের সমর্থনে যুদ্ধ করিতন। রাষ্ট্রের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য বা বিশ্বাসঘাতকতা সাধারণতঃ চূড়ান্ত দরকষাকষি অথবা নিপুণ রাজনীতি চালের উপর নির্ভর করিত। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্তও তুরস্কদেশের কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ এবং উর্দ্ধতন সরকারী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে প্রায় অনুরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কি ভাবে আলী তুরস্ক সাম্রাজ্যের উচচকর্ম্ম-চারীদিগকে অপসৃত করেন এবং তাঁহার কার্য্যের জন্য তাঁহাকে বিদ্রোহী ঘোষণা করা দূরের কথা বরং যে সব লোককে তিনি বহিস্কৃত করেন তাহাদেরই স্থলে তাহাকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়—এই কাহিনী সম্বলিত উইলিয়াম প্লোমার বিরচিত "আলী দি লায়ন" নামক অতি উচচাঙ্গের পুস্তক পাঠকদিগের মনে থাকিতে পারে।(১) সেইরূপ বিজাপুর রাজ্যেও

(১) ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে জন-নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কোন রোমাঞ্চকর কাজ বা সঙ্কেত পাশ্চাত্য দেশের লোকের মনে যেরূপ বিরুদ্ধ অনুভূতির সৃষ্টি করে প্রাচ্য দেশের লোকের মনে ইহার প্রতিক্রিয়া অনেক কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে স্ত্রী পরিত্যক্ত ভারতীয় গ্রাম্যচাষী রেললাইনের উপর পাথরখণ্ড বসাইয়া গাড়ী লাইনচ্যুত করিয়া মানবজীবনের প্রতি তাহার উপেক্ষনীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন না। ভারতীয় জুরীরাও ইংরাজ বিচারকগণের মত এইরূপ কাজ তেমন গর্হিত মনে করেন না।

শিবাজীর উপদ্রবপূর্ণ কাজের প্রণালীতে সুলতান যতই ক্রুদ্ধ হউন না কেন, কেহই শিবাজীকে এ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের প্রকাশ্য-ঘোষিত শত্রু বলিয়া বিবেচনা করার প্রয়োজন মনে করে নাই। যাহারা তাঁহার প্রতি খুব খারাপ ধারণা পোষন করিত তাহারাও তাহাকে একটা অর্ব্বাচীন উপদ্রবকারী মূর্খ যে স্বভাবদোষে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে—ইহা ছাড়া আর বেশী কিছু মনে করে নাই। সুলতানের উপদেষ্টাদের মতে শিবাজীর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান তখন নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা শিবাজীকে বাগে আনিবার জন্য এক চতুর ও সস্তা উপায় দেখাইয়া দিলেন। শাহজীকে কারাগার হইতে বাহিরে আনিয়া বলা হইল যে শিবাজী বিজাপুরে অবিলম্বে উপস্থিত না হইলে শাহজীকে জীবিতাবস্থায় ইষ্টক দিয়া আচ্ছাদন করিয়া কবর দেওয়া হইবে।

শাহজী পুনরায় তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চাহিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর আদেশ হইল, "পুত্রকে এখানে আসিতে বলিয়া চিঠি লেখ। তোমার বর্ত্তমান দুরবস্থা ও বিপদের কথা তাহাকে বিশদভাবে লেখ। সে যদি অবিলম্বে এখানে না আসে তবে তোমার মৃত্যু অবধারিত।" কাজেই শাহজী স্বীয় প্রকৃতিগত আশঙ্কা ও ভয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া শিবাজীর নিকট নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া চিঠি লিখিলেন। তারপর তাঁহাকে দেওয়ালের একটা কুলুঙ্গীতে পুরিয়া দেওয়া হইল। উহাতে তাঁহার দাঁড়াইবার মত জায়গা ছিল মাত্র। তাহাকে ঐ অবস্থার দাঁড় করাইয়া রাজমিস্ত্রীরা কুলুঙ্গীর প্রবেশ পথটা (খালি দিকটা) ইট গাঁথিয়া বন্ধ করিতে লাগিল। শিবাজী সত্যই আসে কিনা ইহা দেখিবার জন্য কর্ত্তপক্ষের আদেশে কয়েকদিন অন্তর মিস্ত্রিরা কাজ বন্ধ রাখে। কিন্তু তখনও শিবাজীর আগমনের কোন লক্ষণ না পাওয়ায় পুনরায় ইটের গাঁথুনি আরম্ভ হইল। ক্রমে গাঁথুনীর কাজ প্রায় সমাপ্ত হইল ও মাত্র একখানা ইট বসাইবার জায়গা রহিল। ঐ ইটখানা গাঁথা হইলেই বন্দীর জীবনে আলো ও হাওয়া চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে—অবস্থা এইরূপ সঙ্গীন।

এই অবস্থায় শিবাজীর মনের উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা সহজেই অনুমেয়। তিনি যদি তখন আত্মসমর্পন করেন তবে তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ

হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। এই দণ্ড কেবল যে তাঁহার অন্যায় কাজের সাজা দেওয়ার জন্যই বিহিত হইত এমন নহে। পরন্তু প্রাচ্য দেশের রাজনীতি অনুযায়ী ভবিষ্যতে পুনরায় অশান্তি নিবারণের জন্যই এইরূপ বিধি প্রয়োগ করা সম্ভাবনা। অপরদিকে শাহজীকে জীবন্ত সমাধি দেও-য়ার ভীতি প্রদর্শন সুলতান নিশ্চয়ই কাজে পরিণত করিবেন এইরূপ আশঙ্কা। বিগত জীবনের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যদিও পিতার প্রতি কর্ত্তব্য বা স্নেহ প্রদর্শনে শিবাজীর বিশেষ দায়িত্ব ছিল না, তবুও কুলুঙ্গীর ইষ্টক গাঁথা দেওয়ালের শেষ ইটখানি পাতিবার গর্ত্তটুকুর মধ্য দিয়া পিতার কোটরাগত চক্ষু ও উত্তেজনার ছটফটানির মানসিক ছবি শিবাজীর মনকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। অবশেষে সবদিক পর্য্যালোচনা করিয়া শিবাজী ভাবিলেন যে পিতা যদিও তাঁহার প্রতি কোনরূপ পিতৃকর্ত্তব্যই পালন করেন নাই, তবু ইহা ঠিক যে তিনি শিবাজীর পিতা। কেবল এই কারণেই আবদ্ধ কুলুঙ্গীতে শ্বাসরোধের ফলে তাঁহাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে হইতেছে। প্রথমতঃ তিনি স্থির করিলেন যে তাঁহাকে বিজাপুর যাইতেই হইবে; ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই; যদিও পরিণামে পিতার পরিবর্ত্তে ইহাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। কিম্বদন্তী এই যে পত্নী সইবাইয়ের আকুলি বিকুলি ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শিবাজী একটু দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি ছিলেন মাতা জীজাবাই। তিনি সবদিক ভাবিয়া দেখিতেছিলেন। স্বামীর প্রতি তাঁহার ভালবাসার বিশেষ কোন হেতু ছিল না; কিন্তু শিবাজীর প্রতি ছিল তাঁহার গভীর স্নেহ। তিনি শিবাজীকে তাঁহার স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্খার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন যে এখানে শিবাজীর জীবনই যে একমাত্র সমস্যার বিষয় তাহা তো নয়; আসল সমস্যা হিন্দু স্বাধীনতা।

শিবাজী যখন একরূপ দ্বিধাগ্রস্ত তখন সেই সময় হঠাৎ তাঁহার মনে এক নূতন প্রেরণা আসিল।

তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে এক দূতকে উত্তরাভিমুখে মুঘল দরবারে পাঠাইলেন। সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার অধীনস্থ প্রজারূপে বাস করিবার জন্য তিনি অনুমতি প্রার্থনা করেন। সম্রাটের

প্রতি অনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ তিনি তাঁহার অধিকৃত বিজাপর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সীমান্তের সমুদয় দুর্গশ্রেণী মুঘল সেনাপতিদের নিকট অর্পন করিবার প্রতিশ্রুতি দেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিগত যুদ্ধে সম্রাট শাহজাহান বিজাপুর রাজ্য সম্পূর্ণরূপে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ করিতে অপারগ হইয়া উহার নামমাত্র বাহ্যিক বশ্যতা স্বীকারেই সন্তুষ্ট হইতে বাধ্য হন। কিন্তু আবার নূতন করিয়া বিবাদ আরম্ভ হইতে পারে. বিজাপুরের সুলতান তাঁহার প্রতিশ্রুত রাজস্ব দিতে হয়তো অস্বীকারও করিতে পারেন; এবং উত্তর-পশ্চিম বা অন্য কোন অঞ্চল যখন সম্রাট বশে রাখিতে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় হয়তো বিজাপুরের সুলতান তাহার স্বাধীনতা দাবি পুনরায় উত্থাপিত করিতে পারেন। এ অবস্থায় এই দুর্গম পার্ব্বত্য দেশে কতিপয় দুর্গ দখলে পাওয়া মস্ত লাভ। বাস্তবিক মুদ্রাবিনিময়ে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়।

মুঘল দরবারে শিবাজীর দূতকে মহা সমাদরে আপ্যায়িত করা হয়। মধ্যভারতের মুঘল রাজপ্রতিনিধি সম্রাটের' পুত্র যুবরাজ মুরাদ বক্স শিবাজীর নিকট চিঠি লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; বিজাপুরের সুলতানকে বিব্রত করিবার জন্য ইষ্টকনির্মিত দেওয়ালের কুলুঙ্গীতে অবরুদ্ধ শিবাজীর পিতার নিকটও তিনি চিঠি লেখেন। শাহজীর পক্ষে ইহা এক অদ্ভুত ভাগ্যপরিবর্ত্তনের প্রতীক হইয়া দেখা দিল। সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের শীলমোহর করা চিঠি আটক রাখা অসম্ভব। সুন্দর নকশা পরিশোভিত ও সগর্ব্বে লাল সীলমোহরে হস্তছাপ অঙ্কিত পুরু কাগজে লেখা চিঠি সিংহাসন হইতে প্রদত্ত সম্রাটের বাণীর মতই শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করা হইত। এই সিংহাসন ছিল সুউচ্চ ঝুলান বারান্দায় ভগবানের প্রতিনিধির আসনস্বরূপ। এখান হইতে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে উদ্দেশ করিয়া বাণী প্রদান করেন। এই চিঠি সেই মহামহিমান্বিত সম্রাটের পুত্র ও প্রতিনিধির বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। শাহজীর নিকট চিঠিতে যুবরাজ মুরাদ লিখিয়াছিলেন, "মানসিক উদ্বেগ হইতে অব্যাহতি লাভ করুন। আপনার প্রতি সম্রাটের সুনজরের প্রতীকস্বরূপ এক-প্রস্থ পোশাক আপনার জন্য পাঠান হইল। আশা করি ইহার শুভ

আগমনের দ্বারা আপনার প্রতি সম্রাটের দয়ার সম্যক পরিচয় উপলব্ধি করিবেন।" শিবাজীর নিকট চিঠির ভাষা এইরূপ, "শিবাজী! আপনি মহানুভব ব্যবহার পাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি। আপনি সম্রাটের অনুগ্রহ-ভাজন। আপনি সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করায় তিনি প্রীত হইয়াছেন।" (১)

এই নূতন পরিস্থিতি বিজাপুর রাজ্যের কর্তৃপক্ষের নিকট মোটেই প্রীতিপদ হয় নাই। পরন্তু বিজাপুরের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে মুঘল সাম্রাজ্যের সহসা কৌতূহলী হস্তক্ষেপে তাঁহারা খুবই ভীত হইলেন। শিবাজী যদি তাঁহার অধিকৃত সীমান্তের দুর্গগুলি মুঘলদিগের হাতে ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে বিজাপুর সেনাবাহিনীর কোন সক্ষম দল ওখানে পৌছিবার পূর্বেই মুঘল সেনারা দুর্গগুলিতে প্রবেশ করিয়া উহা আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবে।

কিন্তু সম্রাটের প্রতিনিধির সহৃদয়তাপূর্ণ চিঠি কিম্বা সম্রাটের প্রদত্ত রাজকীয় সম্মানসূচক পোশাক প্রেরণ অপেক্ষাও শোচনীয় সংবাদ এই যে সম্রাট শাহজীকে মুঘলদরবারে অমাত্যপদে নিযুক্ত করেন। ইহার অর্থ হইল এই যে এখন হইতে শাহজীকে মুঘল সাম্রাজ্যের নাগরিক বলিয়া দাবি করা হইল। সুতরাং তাঁহার নিরাপত্তার জন্য বিজাপুর রাজ্যকে দায়ী করা হইবে। ইহার পরে ইষ্টক সমাধি হইতে বাহির করিয়া শাহজীকে মুক্তি দেওয়া ব্যতীত বিজাপুরের সুলতানের আর কোন গত্যন্তর রহিল না।

এখন এক অভিনব অবস্থার সৃষ্টি হইল। শিবাজী যদি মুঘল সম্রাটের প্রতি প্রস্তাবিত আনুগত্য পরিবর্ত্তনের ব্যাপার লইয়া দরকষাকষি আরম্ভ করিতেন তাহা হইলে শাহজীর পুনরায় গ্রেপ্তার ও তাঁহার প্রাণনাশের পর্য্যন্ত সম্ভাবনা ছিল। অপর পক্ষে সম্রাট হয়তো অবিলম্বে শিবাজীর প্রতিশ্রুতি সর্ত্ত পালনের দাবি করিতেন। সম্রাটের নিকট সত্য সত্য আত্ম-সমর্পণ করিলে শিবাজীর এতদিনের অনুসৃত নীতির একদম পট পরি-বর্ত্তন হইত, পক্ষান্তরে মুঘল সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ তখনও শিবাজীর পক্ষে সাধ্যাতীত। অতএব পরের কয়মাস

(১) Kincaid & Parasnis

শিবাজী অসাধারণ কষ্টসাধ্য কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি দিল্লীশ্বরের নিকট তোষামোদ ও অতিরঞ্জিত প্রশংসাজ্ঞাপক চিঠি লিখিতে লাগিলেন। ইহার আসল উদ্দেশ্য ছিল সম্রাটের মনোযোগ নানাদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দুর্গগুলি নিজের অধীনে রাখা। বিজাপুরের বিরুদ্ধেও তিনি শত্রুতামূলক কোন কাজ করিলেন না। শিবাজীর এই কৌশল ও চাতুর্য্যপূর্ণ কাজের সফলতা সম্বন্ধে বিজাপুর রাজ্যের প্রকৃত মনোভাব যাহাই হউক না কেন সম্রাটের নিকট তাঁহার আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাছে কার্য্যে পরিণত হয় এই ভয়ে তাহারাও তাঁহাকে এখন আর ঘাঁটাইতে চাহিলন না।

সপ্তম অধ্যায়

১৬৪৯ সালে শিবাজীর ও তাঁহার প্রতিবেশী দুই মুসলমান রাজ্যের মধ্যে যখন সন্দিগ্ধপূর্ণ অবস্থা চলিতেছে সেই সময় শিবাজী দুই জন মহৎ ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করেন। পশ্চিম ভারতে এই দুই মহামানব প্রায় শিবাজীর মতই সুপরিচিত। একজন স্বভাবকবি তুকারাম, আর একজন সাধু রামদাস।

মারাঠাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতি ঐ দেশের জনগণের সাহিত্য ও জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশর সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভজনার প্রধান অঞ্চল পন্দরপুরের এলাকায় কেন্দ্রীভূত ছিল। পর পর কয়েকজন সাধুর আবির্ভাব ও উপদেশদানের ফলে ঐ স্থানটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। সর্ব্বনিম্ন জাতি হইতে উদ্‌ভূত চোখামেলা নামক এক সাধু সমগ্র মানবজাতির ঐক্য এবং মিলনের বাণী জনসাধারণের নিকট প্রচার করেন। সাধারণের ধারণা যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি তাঁহাকে এক অলৌকিক সঙ্কেত দ্বারা মন্দিরের অভ্যন্তরে আহ্বান করেন। বর্ত্তমান হিন্দুধর্মের আদর্শ ও নীতিশাস্ত্র প্রসিদ্ধ মনীষী জ্ঞানদেবের টিকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

মারাঠা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে জেসুইট ফাদার ষ্টিভেন্সের অনদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। ষ্টিভেন্স হইলেন ভারতে আগত

প্রথম ইংরাজ। ইংরাজদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ভারতীয় ভাষায় উল্লেখযোগ্য কবিতা রচনা করেন।(১) শিবাজীর জন্মের বারবৎসর পূর্ব্বে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টিভেন্স "হ্যারোয়িং অব হেল" (Harrowing of Hell) নামক কাব্য গ্রন্থের মারাঠা ভাষায় অনুদিত সংস্করণ রচনা করিয়া প্রকাশিত করেন। প্রাচ্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদের দরুণ অত্যাবশ্যক স্থান-কাল-পাত্র বিভেদ সত্ত্বেও যে উত্তর ইউরোপীয় আদি লোককাহিনী হইতে ষ্টিভেন্স তাহার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার মূল গাম্ভীর্য্য বহুলাংশে রক্ষিত হইয়াছে। ক্যাথোলিক ধর্মের উপাসক ষ্টিভেন্স রানী এলিজাবেথ প্রবর্ত্তিত কড়া আইনের হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন। ভারতে জেসুইট মিশনে যোগদান করার পূর্ব্বে তিনি দৌয়াই (Dauai) শহরে অধ্যয়ন করেন এবং ক্যামপিয়নের (Campion) পরিচালনায় রোমে কাজ করেন। ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান আহরণ ও ল্যাটিন ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করা সত্তেও তিনি নব-উন্মেষিত মারাঠা ভাষার মাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়া যান। এই ভাষা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "শিলাখণ্ড মধ্যস্থমণি এবং মণিরত্নের মধ্যে নীলকান্ত মণির মত ভাষা সমূহের মধ্যে মারাঠা ভাষা শ্রেষ্ঠ। প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যানে যুঁই-ফুল, সগন্ধদ্রব্যাদির মধ্যে কস্তুরী, পক্ষীগণের মধ্যে ময়ূর, এবং নক্ষত্রমালার মধ্যে জোডিয়াকের ন্যায় ভাষাসমূহের মধ্যে মারাঠি উজ্জ্বলতম।"

যে ভাষার মাধুর্য্য একজন বিদেশীকে এমন গভীররূপে বিমোহিত করিতে পারে সেই উদীয়মান মারাঠা ভাষা যে মারাঠিদের উল্লসিত করিবে ইহা সহজেই অনুমেয়। এই সাহিত্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃত ভাষার নিগূঢ় শব্দবিন্যাসের মধ্যে সমাধিস্থ না হইয়া মারাঠিদের স্বতঃস্ফুর্ত্ত স্বাভাবিক ভাষায় প্রকাশিত হইল। জাতি ও ধর্ম্মের নবজাগরণের বাণী এই সাহিত্যে উপযুক্ত ভাষা ও রূপ পাইল।

তুকারামের রচিত গাঁথা অদ্যাপিও মহারাষ্ট্রের প্রতি গ্রামে গীত হইয়া

---

(১) সালডানহা "লিখিত খৃষ্টিয় পুরাণ" গ্রন্থের উপক্রমণিকায় ষ্টিভেন্সের জীবনীর পরিচয় পাওয়া যায়।

থাকে। তুকারাম ছিলেন মুদির পুত্র। বাল্যকালেই তিনি ধর্ম ও ভগবৎ চিন্তায় সর্ব্বদা বিভোর হইয়া গ্রামাঞ্চলে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াই-তেন। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় পৈত্রিক দোকানটির পরি-চালনার ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত হয়। ব্যবসায়ে তাঁহার রুচি বা কর্ম্ম দক্ষতা কিছুই ছিলনা। গ্রামের বহু পরিবারের ঐ দোকানে কারবার ছিল, কিন্তু তুকারাম এত লাজুক ছিলেন যে তিনি কাহাকেও দেনাশোধ দিতে অনুরোধ করিতে পারিতেন না। কখনও অর্থাগম হইলেই তিনি উহা দান করিয়া দিতেন। চরম দারিদ্র্যে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার নিকট যে কয়টি কপর্দ্দক অবশিষ্ট ছিল তাহাও তিনি এক ব্রাহ্মণকে দেনার দায়ে হাজতবাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্য দান করেন। তারপর কপর্দ্দকহীন ও অনশনক্লিষ্ট অবস্থায় তিনি তীর্থযাত্রীর বেশে পাহাড়ে পাহাড়ে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পথ চলিতে চলিতে যে সব গীতিকবিতার জন্য তাঁহার নাম পরে বিখ্যাত হয় উহা রচনা করিতেন। প্রাচ্যদেশে প্রচলিত সাধারণ লোকের স্বাভাবিক দাতব্যের প্রথা অনুযায়ী গ্রামবাসী ও রাখাল বালকেরা তাঁহাকে আহার্য্যবস্তু উপহার দিত এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তঁহার রচিত পদাবলী একমনে শুনিত। বাড়ী ফিরিয়া তাঁহারা তুকারামের কবিতার মাধুর্য্য সম্বন্ধে বলাবলি করিয়া চারিদিকে তাঁহার খ্যাতি ও সুনাম ছড়াইত। একদিন জনৈক গায়কের মুখে শিবাজী তাঁহার রচিত একটি কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া তুকারামকে সাদরে নিমন্ত্রন করেন। তুকারাম আসিয়া তাঁহার সহিত বাস করিলে শিবাজী তাঁহাকে ধনরত্ন দিয়া তাঁহার আরামে জীবনযাপনের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। তুকারাম নিমন্ত্রণ পাইয়া একটি কবিতায় উত্তর দেন। উহার মর্মার্থ এই—

"হে রাজন, আপনার আলোক-সজ্জা, রাজছত্র, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কৃত অশ্বপৃষ্ঠ এবং জাঁকজমক আমার নিমিত্ত নহে। আমি সংসার ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়া আসিয়াছি আর আপনি আমাকে প্রলুব্ধ করিয়া ফিরাইয়া লইতে চাহেন। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আমাকে একেলা নির্জনে ও নীরবে বাস করিতে দিন। আপনি আমাকে রাজকীয়

পরিচ্ছদ ও প্রাসাদ দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ইহা আমার নিমিত্ত শুধু বৃথা অপচয় করা হইবে। বন এবং তৃণভূমি আমার প্রকৃত বাসস্থান। শৈবালাবৃত শিলাখণ্ড আমার পালঙ্ক। উপরের আকাশ আমার আবরণবস্ত্র।"

তুকারামের চিঠি পড়িয়া শিবাজী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর তিনি শিবির ত্যাগ করিয়া একাকী মহারাষ্ট্রের হরিদ্রাবর্ণের ঢালু-মালভূমিতে তুকারামের উদ্দেশ্যে বেগে চলিতে লাগিলেন। তুকারামের সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিরাম ছিল না। অবশেষে তুকারামের সাক্ষাত পাইয়া শিবাজী তাহার পাদমূলে বসিয়া পড়িলেন। পরিহিত বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া শিবাজী তপস্বীর ন্যায় চীরবাস পরিধান করিলেন এবং অবনত মস্তকে নীরবে কবির সম্মুখে উপবেশন করেন। দুই জনেই মৌন .... এদিকে উৎকণ্ঠিত অনুচরবর্গ দীর্ঘকালব্যপী অনু-সন্ধানের পরে তথায় শিবাজীকে খুঁজিয়া বাহির করে। তাহারা সানুনয়ে তাঁহাকে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ করে। কিন্তু শিবাজী তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। হতাশ হইয়া তহারা শিবাজীর মাতাকে সংবাদ পাঠায় ও তিনি যাহাতে তাহাদের সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাইয়া শিবাজীকে গৃহে ফিরিতে সম্মত করান ঐরূপ অনুরোধ করে। জীজাবাই ঘটনাস্থলে আসিয়া শিবাজীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলেন যে অনুচরগণকে মুসলমানদিগের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহিত করিয়া শিবাজীর পক্ষে এখন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হইবে। ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে বহু সাধু আছেন কিন্তু একমাত্র শিবাজীর ভাগ্যেই নির্দ্ধারিত গৌরবময় কাজ করিবার ক্ষমতা লিপিবদ্ধ আছে। হিন্দুদিগের লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য এখন চারণগায়ক অথবা সন্যাসীর অপেক্ষা বীরের এবং যোদ্ধার প্রয়োজন অনেক বেশী।

ব্যথিত চিত্তে শিবাজী মাতৃবাক্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং তাহার অনুচরগনের সহিত শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে তুকারামের সহিত তাঁহার আর সাক্ষাত হয় নাই। তুকারাম ঐ বৎসরই পরলোকগমন করেন। কিন্তু জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি রামদাস নামক আর একজন সমসাময়িক সাধুর সংসর্গে অতিবাহিত করেন। রামদাসের সঙ্গেও তাহার সাক্ষাত হয় ১৬৪৯ সলে।

শৈশব অবস্থা হইতেই রামদাসের সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন করায় আশক্তি প্রকাশ পায়। তিনি বাল্যবিবাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেবমন্দিরে তীর্থযাত্রায় যৌবনাবস্থা অতিবাহিত করেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি সাতারার নিকট রঘুপতির মন্দিরে অবস্থান করেন। বাল্যাবস্থা হইতেই তাঁহার অনেক রকম অলৌকিক কাজের বিবরণ শোনা যাইত। তাঁহার মন্দিরের আবাসস্থল সত্বর একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইল। লোকের মুখে তাঁহার কথা শুনিবামাত্র শিবাজী রামদাসের নিকট চিঠি লেখেন। তুকারামের মত রামদাসও একটি পদ্য লিখিয়া শিবাজীর চিঠির উত্তর দেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে তুকারাম যেমন নির্জনতার মহিমাকীর্ত্তন করিয়াছিলেন রামদাস যেন সাড়ম্বরে ভেরীবাদ্য করিয়া হিন্দু-দিগের স্বাধীনতার উদ্ধারকর্ত্তা একজন বীর রাজার সম্বর্দ্ধনার জয়গান করিতে লাগিলেন। তাঁহার ছন্দে লেখা চিঠির সহিত রামদাস শিবাজীর নিকট উপহারস্বরূপ একমুঠি মাটি, শিলাখণ্ড এবং সামান্য অশ্বপুরীষ পাঠান। শিবাজী তাঁহার মাতার নিকট তখন উপবিষ্ট। এই সময় উক্ত অদ্ভুত উপহার সামগ্রী তাঁহার নিকট পৌছায়। ধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও জীজাবাই রূপকব্যঞ্জক কার্য্যাদির প্রকৃত ধর্ম্ম অনেক সময় বুঝিতে পারিতেন না। ঘৃণায় এবং ক্রোধে তিনি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রামদাসের প্রেরিত উপহার দ্রব্যের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "এইগুলি কি কোন ভদ্রলোককে উপহার দেওয়ার উপযুক্ত বস্তু ?" কিন্তু শিবাজী মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এই দ্রব্যগুলি প্রতীক মাত্র। ইহারা ভবিষ্যৎ ঘটনার সঙ্কেত বহন করিতেছে। মাটির অর্থ হইল যে আমি এই অঞ্চলের ধরণীর অধীশ্বর হইব। শিলাখণ্ডগুলি দুর্গসমূহের প্রতীক; উহা দ্বারা আমি রাজ্য রক্ষা করিব; এবং অশ্বপুরীষ আমার অশ্বারোহী সৈন্যদের নিদর্শন; আমার অশ্বারোহী সৈন্যদল আমার খ্যাতি বিস্তার করিবে।"

শিবাজী সর্ব্বদা রামদাসের নিকট চিঠি লিখিয়া রাজ্যশাসন ও রাজ-নীতি সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ চাহিতেন। ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে তিনি রামদাসের সন্নিকটে উপস্থিত হন। শিবাজী

রামদাসকে প্রণাম করিয়া তাঁহার হাতে একখানি দলিল পত্র প্রদান করেন। এই দলিল দ্বারা শিবাজী নিজের সমগ্র রাজ্য সাধু রামদাসকে অর্পণ করেন। রামদাস উহা হাতে লইয়া বলেন, "ভগবানের তরফে আমি এই দান গ্রহণ করিলাম। তোমার রাজ্য তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। উহা ভগবানের নামে শাসন করিবে। অসংযমী স্বৈরাচারীর মত ব্যবহার না করিয়া ভগবানেব প্রতিনিধিরূপে নম্র শিরে এই রাজ্য শাসন করিবে।" (১)

রামদাসের ধর্মনীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য শিবাজী তাঁহার অনুচরবর্গকে পরস্পর অভিবাদনের সময় 'রাম' এই বাক্যটি উচ্চারণ করিতে বলেন। মারাঠারা আজিও প্রীতি-নমস্কারের রীতির মধ্যে শিবাজীর এই নির্দ্দেশ পালন করিয়া চলিতেছে। মারাঠারা যে প্রীতি সম্ভাষণের সময় একজন কৃতী রাজার নাম মনোনয়ন না করিয়া একজন সাধুর নাম ব্যবহার করিবে ইহা ভাবিয়া হয়ত বর্ত্তমান যুগের সার্ব্বভৌম শাসকেরা বিস্ময় প্রকাশ করিবেন। উপসংহারে বর্ণনীয় এই যে রামদাসের নিকট যে সাধুদিগের সমাগম হইত তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শন-স্বরূপ শিবাজী গৈরিক পতাকা তাঁহার রাজ্যের নিশানরূপে ব্যবহার কবার নির্দ্দেশ দেন। গৈরিক বস্ত্র হিন্দু তীর্থযাত্রীরা তাঁহাদের সুদীর্ঘ ভ্রমণ যাত্রার সময় সাধারণতঃ পরিধান করিয়া থাকেন। সমসাময়িক ফরাসী-দেশের লালবর্ণের পবিত্র পতাকার ন্যায় মারাঠারাও শিবাজীর প্রচলিত পীতবর্ণের পতাকাকে অলৌকিক বিস্ময়-মিশ্রিত সম্ভ্রমের বস্তু মনে করিত।

---

(১) "এই আমি দিনু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লও পুনর্ব্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।
পালিবে যে রাজধর্ম্ম জেনো তাহা মোর কর্ম্ম
রাজ্য লয়ে হবে রাজ্যহীন।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :- কথা ও কাহিনী
প্রতিনিধি—১৯ পৃষ্ঠা

রামদাসের আশীর্ব্বাণী শিবাজীর পরিচালিত দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামকে ধর্মযুদ্ধের মর্য্যাদা দান করা সত্ত্বেও শিবাজী যে ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে কত সামান্য বিরোধ ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেন তাহা উল্লেখযোগ্য। পর্ত্তুগীজদের অধিকৃত ভারতবর্ষের প্রধানতঃ মারাঠাভাষী অঞ্চলসমূহে হিন্দু পুরোহিতগণের প্রতি ধর্ম্মবিষয়ক নিষেধাজ্ঞার সহিত ক্যাথোলিক ধর্ম্মযাজকদের প্রতি শিবাজীর সদয় ব্যবহারের প্রীতিমূলক পার্থক্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমনকি শিবাজীর শত্রুরাও মুসলমান ধর্ম্মযাজক, মসজিদ এবং কোরানের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি শিবাজীর সম্বন্ধে লিখিবার সময় নিম্নস্তরের গালিগালাজপূর্ণ বিশেষণ ব্যবহার করিতে অতিশয় পটু ছিলেন সেই মুসলমান ঐতিহাসিক কাঁফি খাঁ, (Khafi Khan) পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে কোন বিজিত নগরের মসজিদগুলির যাহাতে ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে সম্যক ব্যবস্থা না করিয়া শিবাজী কখনও ঐ নগরে প্রবেশ করিতেন না; কোন কোরান তাঁহার হস্তগত হওয়া মাত্র শিবাজী উহা স্বীয় পবিত্র ধর্ম্মপুস্তকের মত সসম্মানে রক্ষা করিতেন; তাঁহার সৈন্যরা কখনও মুসলমান স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করিলে ঐ রমণীদের শিবাজীর নিকট আনিবার নিয়ম ছিল, যতক্ষণ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নিকট আত্মীয়ের নিকট প্রত্যর্পণ করা সম্ভব হইত না ততক্ষণ শিবাজী উহাদিগকে তাঁহার নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তাঁহাদের যাহাতে কোন কষ্ট না হয় সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ইউরোপের এই শতাব্দীর ইতিহাসে জার্মানীতে সেনাপতি টিলি (Tilly) ও আয়ারল্যাণ্ডে ক্রমওয়েলের নিষ্ঠুর কার্য্যকলাপ কুখ্যাত হইয়া আছে।

অষ্টম অধ্যায়

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ আওরঙ্গজেব তাঁহার ভ্রাতা মুরাদের স্থলে মধ্যভারতে মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। অদৃষ্টচক্রে আওরঙ্গজেব মুঘলবংশীয় শেষ সম্রাটরূপে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহারই প্ররোচনায় গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য দুইটি ধ্বংস হয় এবং

মারাঠা শক্তি দমন করিবার প্রচেষ্টায় তিনি বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করেন।

প্রসিদ্ধ মুঘলরাজবংশের সম্রাটদের বহু গুণ আওরঙ্গজেবের চরিত্রে পরিলক্ষিত হইত। তিনি ছিলেন অতিশয় যোগ্য, পরিশ্রমী এবং স্পার্টানদেশীয় লোকদের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু উগ্র ধর্ম্মমতের প্রতি প্রাচীনপন্থী অতিরিক্ত অনুরক্তি তাহার মহান গুণাবলী আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ইসলামের সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ, ইহার দার্শনিকতত্ত্ব, প্রাণের চাঞ্চল্য ও বিশালতার তাঁহার নিকট কোন গুরুত্ব ছিল না। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার মনোভাব ছিল অনেকটা আরবদেশের যুদ্ধোন্মত্ত বেদুইন সর্দ্দারের মত। খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত শুচিবাইগ্রস্ত পিউরিটানদের মত তিনি সঙ্গীত, শিল্পকলা ও সুকোমল সৌন্দর্য্যাদি আন্তরিকতার সহিত অতি তীব্রভাবে ঘৃণা করিতেন। বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং যে কবিত্বময় এই ভাব প্রকাশক মুসলমান কবিদের সঙ্গীতের তিনি অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংযম ও কঠোরতা প্রায় অমানুষিকতায় পরিণত হয়। হজরতের প্রিয় শিষ্য ওমরের মত পৃথিবীতে ঐশ্বরিক নিয়মসম্মত দারিদ্র্যের মহিমা প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের বিশাল রাজকোষ হইতে এক কপর্দ্দকও নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য গ্রহণ করিতেন না। নিজ হাতে বোনা টুপি আমীরদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া উপার্জ্জিত অর্থে তিনি তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। অনাচ্ছাদিত ভূমিতে শুধু একখানা ব্যাঘ্র চর্ম্ম পাতিয়া তিনি তাহার উপরে নিদ্রা যাইতেন। মুঘল সাম্রাজ্যের ময়ূর সিংহাসনে আরোহন করা মাত্র তিনি প্রথমতঃ মদ্যপান নিবারণ করিয়া এক হুকুম জারি করেন যদিও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটেরা শুধু প্রকাশ্যে মদ্য বিক্রয়ের অনুমতি দান করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, বরং মহম্মদের মদ্যপান সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তাঁহারা অনেক সময় মদ্যপান করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। হিব্রুদেশের ঐশ্বরিক শক্তিপ্রাপ্ত জনৈক ভবিষ্যদ্বক্তার অনুকরণে আওরঙ্গজের প্রজাদিগকে মদ্যপানাভ্যাসের জন্য তিরস্কার করিয়া বলেন "এই কু-অভ্যাস দেশের মধ্যে এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে যে ভারতবর্ষে আমি এবং মুখ্য বিচারপতি ব্যতীত

আর সকলেই মদ্যপানে অভ্যস্ত।"

প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেব মুঘলসাম্রাজ্যের ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের সংখ্যাটা একটু বেশী করিয়া ধরিয়াছিলেন। খোশগল্পে মজবুদ্ ইতালিয় পর্যটক মানুচে লিখিয়াছেন, "মুখ্য বিচারপতির নাম করিয়া আওরঙ্গজেব একটু ভুল করিয়াছেন। কারণ আমি নিজেই প্রত্যহ তাহাকে এক বোতল সুরা পাঠাইতাম। উহা তিনি গোপনে পান করিতেন। তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী উদীপুরী বেগম ছিলেন একজন পাঁড় মাতাল। সময়ে সময়ে আওরঙ্গজেব দেখিতে পাইতেন যে তিনি "বেসামাল হইয়া পড়িয়া আছেন: তাঁহার কেশরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং তাঁহার মুখ মদে ভর্ত্তি।" যদিও কোমলবৃত্তি আওরঙ্গজেবের মধ্যে খুবই কম দেখা যাইত, তবুও সম্রাট মাঝে মাঝে তাঁহার পাশে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেন। কিন্তু সম্রাজ্ঞীর মত্তাবস্থা এমন পর্য্যায়ে উঠিত যে তাঁহার স্বামী এবং ভৃত্যের মধ্যে তফাৎ করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাঁহার লুপ্ত হইত, এবং আওরঙ্গজেবের সস্নেহ তিরস্কারের উত্তরে তিনি আরও মদের জন্য আবদার করিতেন।

দ্বিতীয় হুকুম জারি হয় লোকের দাড়ির দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রিত করার জন্য। এক ফর্ম্মান দিয়া ঘোষণা করা হয় যে কোন লোক চার আঙ্গুলের বেশী দাড়ি রাখিতে পারিবে না। এই নিয়মের যাহাতে কোন ব্যতিক্রম না হয় ইহা দেখিবার জন্য রাস্তায় দাড়ি মাপিবার যন্ত্র ও কাঁচি লইয়া পুলিশ দাঁড়াইয়া থাকিত। যে সব আমীর-ওমরাহগণ তাঁহাদের দাড়ির চাকচিক্য ও প্রাচুর্য্যের জন্য গর্ব্ব অনুভব করিতেন তাঁহারা বিষম বিপদে পড়িলেন। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া তাঁহারা সর্দ্দির অজুহাতে গলদেশ রক্ষা করিবার জন্য আলোয়ান দিয়া দাড়ি ঢাকিয়া রাখিবার ভান করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় হুকুম দ্বারা সব রকমের সঙ্গীত বন্ধ করিয়া দিয়া সঙ্গীতযন্ত্রগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ দেওয়া হইল। একদল লোক ইহাতে মনের কষ্ট প্রকাশ করিবার জন্য রাজ প্রাসাদের সন্নিকটে জড় হয়। আওরঙ্গজেব লোকের সমাবেশ দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলে, "আমরা সঙ্গীতদেবীর তিরোধানের জন্য শোকে অভিভূত"।

বিবসমুখে সম্রাট জবাব দিলেন "চিবকাল তাঁহাব পক্ষে সত্যিকাবেব সমাধিস্থ থাকা ভাল।"

এই হুকুমগুলি অবশ্য ১৬৫০ খৃষ্টাব্দেব অনেক পবে ঘোষিত হয়। আওবঙ্গজেব যে ময়ূব সিংহাসনে উপবেশন কবিবেন ইহা তখন কেহ কল্পনা কবেন নাই, কাবণ তিনি ছিলেন সম্রাটেব পুত্রদেব মধ্যে তৃতীয়। কিন্তু বাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হওযাব পবক্ষণ হইতেই দক্ষিণ ভাবত সম্বন্ধে মুঘল পববাষ্ট্রনীতি তাঁহাব মতানুযাযীই স্থিব হইতে লাগিল কাবণ কর্ম্ম-শক্তি ও চাবিত্রিক দৃঢতায তাঁহাব সহিত ক্রমশঃ জড়তাগ্রস্ত ও চারুশিল্পানু-বক্ত সম্রাটেব পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয হয।

আওবঙ্গজেবেব দাক্ষিণাত্যে সম্রাটেব প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে বাজসভায ও শাসন পদ্ধতিব আবহাওযায পবিবর্ত্তন হয। আওবঙ্গ-জেব স্বযং ভোব হওযাব পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ কবিযা স্নান শেষ কবিতেন। আবাধনাব পবে তিনি সামান্য কিছু আহাব কবিতেন। তিনি ছিলেন নিবামিষাসী। সামান্য কিছু শাক সব্জী ভিন্ন তিনি বিশেষ কিছুই আহাব কবিতেন না। তাহাব পব তিনি স্বীয সচিবদিগেব সঙ্গে দুই ঘন্টা কাজে বসিতেন। দ্বিপ্রহবে তিনি পুনবায উপাসনা কবিযা মধ্যাহ্ন ভোজন কবিতেন। সন্ধ্যাকালীন আবাধনা পর্য্যন্ত অপবাহ্নে সমস্ত সময তিনি দববাব কক্ষে কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন। ভগবানেব উপাসনায তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ পাইতেন। "নিবালায একটি ছোট সুন্দব কক্ষে উজ্জ্বল পাথবেব উপবে মাত্র একটি পাবস্যদেশীয মেষেব চামড়ায বসিযা তিনি প্রার্থনা কবিতেন। প্রার্থনাবত আওবঙ্গজেব একটি একটি কবিযা তিন হাজার দুইশত বাব জপেব মালাব গুটিকা ঘুবাইতেন। তিনি খুব কম সমযই একাদিক্রমে দুই ঘন্টাব বেশী নিদ্রায যাপন কবিতেন। আশি বৎসব বয়সেব পূর্ব্বে তিনি কখনও চশমা ব্যবহাব কবেন নাই। সুদীর্ঘ-আনত গ্রীবা চিক্কন ঈষৎ কৃশ মুখখানা ধর্ম্মগ্রন্থেব উপব ঝুঁকিয়া অর্দ্ধউন্মীলিত বড় বড় অক্ষিপল্লবেব মধ্য হইতে উজ্জ্বল কালো চোখ-দুটি পুস্তক পাঠে বত—আওবঙ্গজেবেব এই অঙ্গভঙ্গী সমসাময়িক শিল্পী-দেব ভাল লাগিত এবং তাঁহাবা সম্রাটেব এই প্রকাব ছবি উৎসাহেব সঙ্গে আঁকিতেন। অশেষ কর্ম্মস্পৃহা, উপাসনা, ধর্ম্মচর্চ্চা এবং অমানুষিক

শাবীবিক সহিষ্ণুতা---তাঁহাব চবিত্রেব বৈশিষ্ট্য ছিল। নেপল্‌স হইতে আগত পর্য্যটক ডাঃ কেবেবীকে (Careri) প্রাসাদেব খোজা প্রহবীবা যে আওবঙ্গজেব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা বলিযাছিল ইহাতে আশ্চর্য্য হওযাব কিছুই নাই :- তাহাদেব বিশ্বাস যে আওবঙ্গজেব জাদুবিদ্যায বেশ পটু এবং শযতান, তাঁহাব সহায। নচেৎ তিনি কিছুতেই এইবূপ অদ্ভুত জীবন যাপন কবিতে পাবিতেন না।

আওবঙ্গজেবেব মুখমণ্ডলে কখনও তাঁহাব মনেব অনুভূতি প্রতিভাত হইত না। সভায সকলেব সমক্ষে তিনি সর্ব্বক্ষণ স্কন্ধ কুঁজো কবিয়া, চিবুক বুকেব উপব বাখিযা চোখেব পাতা ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে বসিযা থাকিতেন। কেহ তাহাকে উদ্দেশ্য কবিযা কিছু বলিলে তিনি নীববে উত্তবটি ভাবিযা বাখিতেন এবং পবে হঠাৎ মস্তক উন্নত কবিয়া ও মেরুদণ্ড খাড়া কবিযা সোজা হইযা বসিতেন। মানুচি লিখিয়াছেন যে এ অবস্থায তিনি যে সব কথা বলিতেন উহাব উত্তব দেওযাব কোন পথ থাকিত না।

নিজেব প্রকৃত মনোভাব গোপন বাখিযা অন্য প্রকাবেব ভাব প্রকাশ কবিবাব এক অদ্ভুত কৌশল আওবঙ্গজেব আযত্ব কবিযাছিলেন এবং ইহাব জন্য তিনি বেশ গর্ব্ব অনুভব কবিতেন, যদিও অধিকাংশ লোকেব মতে এইবূপ ভান কবাব প্রবৃত্তি কোন সম্রাটেব পক্ষে নিতান্তই অশোভন। তিনি নিজেই লিখিযাছেন যে শঠতা না কবিযা কেহ বাজ্য পবিচালনা কবিতে পাবে না। কৌশল ও চাতুবী দ্বাবা পবিচালিত শাসনতন্ত্র চিবকাল স্থাযী হইবে।

একান্ত ও আন্তবিক ভাবে ধর্ম্মেব প্রতি অনুবক্ত হওয়া সত্ত্বেও আওবঙ্গজেব বিবেকেব কোনবূপ দংশন অনুভব না কবিযা তাঁহাব ভাইদিগকে হত্যা কবেন ও পিতাকে বন্দী কবেন। কাবন তিনি মনে কবিতেন যে তিনি পবমেশ্ববেব যন্ত্র এবং নিমিত্ত মাত্র। ফবাসী বাষ্ট্র-বিপ্লবের নেতা বোবসপিয়বের (Robespierre) মত নিজের নৈতিক উৎকর্ষতাব বিষয তাঁহাব বিশেষ আস্থা ছিল। তাঁহার মতে কাফেরের প্রতি উপযুক্ত শাস্তি দান ও সবলভাবে আদি ও অকৃত্রিম ইসলাম ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা---এই দুই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য সাফল্যের জন্য আনুষঙ্গিক

বলপ্রয়োগ ও হিংস্র কাজ করিতে হইলে তাহাও কর্ত্তব্য কিন্তু নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া উচিত নহে। স্পেনদেশের অক্লান্তকর্ম্মী ও হৃদয়হীন দ্বিতীয় ফিলিপের ন্যায় তিনি সাম্রাজ্য শাসনের সমুদয় সমস্যাই একমাত্র তাহার ধর্ম্মমতের অভেদ্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া বিচার ও সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তাঁহার আন্তরিকতা নিঃসঙ্গতা, গোঁড়ামি প্রভৃতির সঙ্ঘর্ষে এক অদ্ভূত মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঐ অবস্থায় তিনি পুত্রের নিকট লিখিয়াছিলেন, "জানি না আমি কে এবং কোথায় যাইতেছি বা আমার মত পাপীর শেষ গতি কি হইবে। বৃথাই জীবনের এতগুলি বৎসর অতিবাহিত হইল। ঈশ্বর সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ে বিরাজ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমার অন্ধকার আবৃত চক্ষুদ্বয় তাঁহার আলোক দেখিতে পায় নাই। আমি অনেক পাপ করিয়াছি, জানিনা পরকালে আমাকে কত যন্ত্রণা ও দুঃখভোগ করিতে হইবে।" (১)

আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমান্তস্থিত দুর্গ ও ঘাটি সমূহে অশুভলক্ষণ যুক্ত নানা প্রকারের কাজ কর্ম্ম দৃষ্টিগোচর হয়। এই প্রকার যুদ্ধবিগ্রহের জন্য প্রস্তুতির নিদর্শনে শিবাজীর ভয় পাওয়ার হেতু সহজেই বোধগম্য কারণ মুঘলদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক এ পর্য্যন্ত অনেকটা দ্ব্যর্থবোধক ছিল। তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়া পুনরায় আওরঙ্গজেবের নিকট চিঠি লেখেন এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজপ্রতিনিধি যে শিবাজীর ও তাঁহার পিতার প্রতি কতটা সদয় ও সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন ইহা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন। আওরঙ্গজেব আনুষ্ঠানিকভাবে ইহার একটা মামুলি ও অস্পষ্ট জবাব দেন। শুধু পাহাড়িয়াদের দিয়া যাহার সৈন্যবল গঠিত এমন একজন সামান্য হিন্দু ভূমধ্যকারীর গতিবিধিতে তাঁহার কোন কৌতূহল ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি তখন আরও দক্ষিণে বিজাপুরের দিকে নিবদ্ধ।

(১) This impression of Aurangzeb is drawn from the accounts of Bernier and Manucci, from the "Voyage antour du Mondi," by Gemelli-Careri, and from the Emperor's own letters (Ed. J. Billimoria).

ওসমানের বংশধর এবং খাটি ইসলামধর্ম্মের রক্ষাকর্তা খলিফার সহিত সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও বিজাপুরের রাজবংশ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় উত্তর ভারতের নীতিবাগীশ গোঁড়া মুসলমানেরা তাহাদিগকে ধর্ম্মচ্যুত বলিয়া ঘৃণা করিত। তাঁহাদের ধর্ম্মভ্রষ্টতা আওরঙ্গজেবের নিকট তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগের মধ্যে মাত্র অন্যতম একটি। তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত বিষয় ছিল বিজাপুরীদের প্রকাশ্যস্থানে অবস্থিত স্নানাগার ; বাইজেনটিয়াম দেশীয় পরিমার্জিত আচার ব্যবহার ও রুচি ; ইহাদের মূর্ত্তি-পূজার মত আমোদ উৎসব এবং বিদেশী ও নাস্তিক চিত্র-শিল্পীদের দ্বারা দেওয়ালের গায়ে অঙ্কিত ভিন্নধর্ম্মের দেবগণের প্রস্ফুটিত উদ্যানে লীলায়িত ছবি ও গ্রীকদেশীয় দেবীদিগের শ্বেতমর্ম্মরে নির্ম্মিত নগ্নদেহের ভাস্কর্য্য। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লসের রাজসভার প্রতি সার্জেন্ট ওবাদিয়াগণ (Sergeant Obadiaps) যে মনোভাব পোষণ করিতেন বিজাপুরের রাজসভার প্রতি আওরঙ্গজেবেরও সেইরূপ মনোভাব ছিল।

বিজাপুর রাজ্যের শাসনকর্তৃপক্ষ শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে আওরঙ্গজেব রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়ায় মুঘলদের সহিত তাহাদের দ্বিতীয় বার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এ অবস্থায় তাঁহারা শিবাজীর আংশিক স্বাধীনতা স্বীকার করুন বা না করুন তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য ছিল শিবাজীর সহিত একটা মীমাংসার ব্যবস্থা করা, কারণ তাঁহার অধিকৃত এলাকার মধ্য দিয়াই ছিল মুঘল সেনাবাহিনীর অগ্রসর হইবার পথ। কিন্তু শিবাজীকে মিষ্ট ব্যবহারে বশীভূত করা অথবা তাঁহাকে একেবারে নির্ম্মূল করা ----এইরূপ কোন কাজই না করিয়া বিজাপুর সরকার শিবাজীকে নিহত করাব জন্য একটা ক্ষীণ চেষ্টা করেন। একজন মারাঠাকে ঘুষ দিয়া শিবাজীকে পথিমধ্যে আক্রমণ করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ঘটনাটা অনেকটা এইরূপ। এই হবু গুপ্তঘাতক মোরে নামক এক পার্ব্বত্য ভূম্যধিকারীর শাসিত গ্রামদেশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। শিবাজীর শৈশবাবস্থায় তাঁহার মাতা এই মোরের একটি কন্যার সহিত শিবাজীর বিবাহের প্রস্তাব করেন। মোরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় দুই পরিবারের মধ্যে বেশ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। যে লোককে

জামাতারূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা হইয়াছিল তাহার সহসা এতদূর উন্নতিলাভে ঈর্ষার জন্যই হউক অথবা বিজাপুর সরকারের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহনের ফলেই হউক মোরে যে তাঁহার জায়গীরে শিবাজীকে হত্যা করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই অজুহাতে শিবাজী মোরের নিকট এক চরম পত্র পাঠাইয়া তাহাকে শাসাইলেন যে তাহাকে তৎক্ষণাৎ শিবাজীর সহিত এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে হইবে। আলোচনা দীর্ঘকাল চলে। যেখানে একপক্ষ অপরপক্ষের হত্যার চেষ্টায় প্রশ্রয় দেন সেখানে যে এরূপ আলোচনায় কোনরূপ সরলতা থাকিতে পারেনা ইহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু শিবাজী জোর করিয়া মোরেকে তাহার প্রস্তাবে সম্মত করাইতে চেষ্টা করেন। কিছুকাল পরে তিনি যাহা জানিতে উৎসুক ছিলেন তাঁহার গুপ্তচরেরা তাঁহাকে তাহাই বলে। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে মোরে শিবাজীর বিরূদ্ধে বিজাপুর সরকারের নিকট বিচার প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিয়াছে। মোরেই যে প্রথম শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছে এই প্রকার দাবি করিয়া শিবাজী মোরের জায়গীব আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার সৈন্য-দ্বারা উহার প্রধান নগরী অবরোধ করেন।

শিবাজীর দূতেরা মোরের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডায় রত ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ শিবাজীর সহসা আক্রমণের সংবাদ পাইয়া মোরে চীৎকার করিয়া নানা প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করেন। দু পক্ষই মদের নেশায় বিভোর; কাজেই গরম মেজাজে ঝগড়া আরম্ভ হয়। শিবাজীর দূতেরা মোরের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ও বিজাপুরের রাজ্যের সহিত যোগা-যোগের অভিযোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে একজন দূত তরবারি বাহির করিয়া মোরেকে হত্যা করে। গোলমালের মধ্যে শিবাজীর দূতেরা পলায়ন করে। অনতিকাল পরে শিবাজী নগরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ঐ নগর তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে।

শিবাজীর ছিদ্রান্বেষী ঐতিহাসিকেরা এ ব্যাপারে তাঁহাকে পূর্ব্বকল্পিত হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ অভিযোগের কোন প্রমাণ নাই। শিবাজী যে মোরের জায়গীর অধিকার করিতে অভিলাষী

ছিলেন ইহা সত্য এবং বিশ্বাসঘাতকতার অযথা সুযোগ না লইয়াই তিনি এই কাজ করিতে পারিতেন। ইহাও সত্য যে শিবাজীর ন্যায় প্রতি-হিংসাপরায়ন লোকের সংখ্যা খুবই কম। সম্ভবতঃ এই অভিযোগের প্রকৃষ্ট উত্তর পাওয়া যায় মোরের দেওয়ান বাজিপ্রভুর পরবর্ত্তী আচরণে। সততার জন্য সুপরিচিত এই ব্যক্তি শিবাজীর নিকট আত্মসমর্পন করিয়া তাঁহার একজন একান্ত অনুরক্ত ও অনুগত সহচরের পর্য্যায় স্থান লাভ করেন। গ্রীকদেশীয় থার্মোপাইলিব সমতুল্য মহারাষ্ট্রদেশের রঙ্গনা নামক গিরিসঙ্কটে ইনি পরে শিবাজীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন। বাজির মত গুণসম্পন্ন যে কোন লোক যে স্বীয় মনিবের হত্যার পরি-কল্পনাকারীর এমন ভক্তিসহকারে সেবা করিবে ইহা স্বাভাবিক নহে। আর শিবাজী মোরের হত্যা সত্যই পরিকল্পনা করিয়া থাকিলেও ইহা মোরের পক্ষে শিবাজীকে গুপ্তহত্যা করিবার চেষ্টার প্রতিহিংসামূলক কাজ মনে করিয়া সমসাময়িক লোকমত শিবাজীর এই অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছে—একথাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

সমস্ত ব্যাপারটি আরম্ভ হয় বিজাপুর সরকারের শিবাজীকে সমূলে বিনষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র হইতে, কিন্তু ইহার ফলে শিবাজীর ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং বিজাপুরের সহিত কোনরূপ মীমাংসা ও মিটমাটের সম্ভাবনা অনেক পিছাইয়া যায়।

১৬৫৬ সালে আওরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। ভাগ্যক্রমে তাঁহার এক সুযোগও উপস্থিত হইল। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে বিজাপুরের সুলতানের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার উনিশ বৎসর বয়স্ক দুর্ব্বলচিত্ত পুত্র আলী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ও বিজাপুর নগরীর মধ্যে বিভিন্ন দলে মারামারি শুরু হয়। আওরঙ্গজেব তাঁহার পিতাকে লেখেন যে বিজাপুর হইল মুঘল সাম্রাজ্যের অধীন একটি করদ-রাজ্য এবং নূতন সুলতান সম্রাটের অনুমতি না লইয়া এবং তাঁহার পিতার মুঘলসাম্রাজ্যের প্রতি বশ্যতা স্বীকৃতি নূতন করিয়া গ্রহণ না করিয়াই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তিনি আরও লেখেন যে এই রাজ-কুমার তাঁহার পিতার অবৈধ সন্তান (যদিও এই অভিযোগ খুব সম্ভব

একেবারেই মিথ্যা) এবং চারিদিকে গণ্ডগোলের মধ্যে ঐ রাজ্য জয় করা একটা সামরিক প্রমোদ ভ্রমণতুল্য হইবে বলিয়া মনে হয়। আওরঙ্গজেবের প্রস্তাবে শাহজাহান সম্মতি দেন এবং ১৬৫৭ সালে মুঘল সৈন্য সীমান্ত লঙ্ঘন করে।

ঐ সময় হইতে তিরিশ বা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর সহিত তুলনায় তখনকার মুঘল সৈন্যবাহিনীর সংগঠন প্রণালীর বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। সাম্রাজ্যের প্রধান সামরিক শক্তি ছিল গোলন্দাজ বাহিনী। তুরস্কে নির্ম্মিত কামান ও ঐ দেশের অনুকরণে শিক্ষিত গোলন্দাজ সৈন্যদিগের সাহায্যেই বাবর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভারতবর্ষে মুঘল রাজত্ব স্থাপন করেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর এই সেনাবাহিনীর মধ্যে অনেকেই ছিল ইউরোপীয়। ডাঃ কেরেরী সৈন্য শিবিরে অনেক ইংরাজ, ফরাসী, জার্মান, ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ সৈন্য দেখিতে পান। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাগ্যের বা বীরত্বপূর্ণ কার্য্যের সুযোগলাভের জন্য আসিয়াছিল, আবার কেহ কেহ ছিল পদচ্যুত নাবিক বা দণ্ডিত অপরাধী। উহাদের মধ্যে অনেকে গোয়া হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল। সমসাময়িক মান অনুযায়ী তাহাদের বেতনের হার বেশ ভাল ছিল। জার্ম্মান দেশস্থ প্রত্যেক গোলন্দাজ সৈন্য মাসিক অন্ততঃ পক্ষে দুইশত টাকা অর্জন করিত।(১) ভারতীয় সৈন্যাধ্যক্ষদের প্রায়ই সৈন্য পরিচালনার ভার দেওয়া হইত না। কেহ কখনও এইরূপ পদ পাইলে তাহার বেতন সমকক্ষ ইউরোপীয় অধ্যক্ষের তুলনায় অনেক কম হইত। সাম্রাজ্যের প্রধান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ষাট সত্তরটি হালকা এবং তিনশত ভারী কামান থাকিত। হালকা কামানগুলি নানারঙে সজ্জিত অশ্বশকটে ও ভারী কামান উষ্ট্রবাহিত শকটে

(১) Manucci, during Jai Singh's campaign against Shivaji, received as 'officer-in-charge of the artillery, three hundred rupees a month. As a regular salary, this was enviable, considering the purchasing power of money then, and is comparable with salaries of Byzantine officers.

স্থান হইতে স্থানান্তরে নেওয়া হইত।

এমনকি পদাতিক সৈন্যদলেও অনেক উচ্চপদস্থ ফরাসী কর্ম্মচারী ছিল। কারণ একাদশ শতাব্দীতে যেমন ইউরোপের উত্তর দেশের লোকেরা প্রলোভনের বশে ইংলণ্ডের সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার জন্য উদগ্রীব ছিল তেমনই সপ্তদেশ শতাব্দীতে বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষী বিদেশী যুবকেরা মুঘল সমর বাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইত। ফরাসী সামরিক কর্ম্মচারীরা শীঘ্রই প্রচুর অর্থার্জন করিতে সমর্থ হইত, কারণ ইউরোপে প্রচলিত সামরিক কার্য্যে বেতন অপেক্ষা ভারতবর্ষে তাঁহাদিগকে অনেক বেশী বেতন দেওয়া হইত। তাহাদের কাজও ছিল অনেকটা হাল্কা। একজন ফরাসী সেনাপতি ডাঃ কেরেরীকে বলে "মুঘল সম্রাটের অধীনে কাজ করিয়া বেশ সুখ ও আরাম পাওয়া যায়। এমনকি সাধারণ সৈনিকের কার্য্যকলাপেও বিশেষ কোন বাধা নিষেধ ছিল না, এবং আদেশ অমান্য করায় বা বিনা অনুমতিতে স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়ায় জন্য সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর শাস্তি হইত জরিমানা কিংবা বেতন হ্রাস মাত্র।"

কোন অভিযানের সময় মুঘল সেনানীর সৈন্যাধ্যক্ষের জাঁকজমক ও সমারোহ দিল্লীশ্বরের সমপর্য্যায়েই সংগঠিত হইত। আওরঙ্গজেবের শিবিরের চারিপাশে স্বর্ণমণ্ডিত দণ্ড হস্তে সর্ব্বদা একশত পরিচারক ঘোরাফেরা করিত। মখমল ও সোনার জরির চওড়া হাতা ও গলবন্ধনীযুক্ত কোমর পর্য্যন্ত লম্বা জামা পরিহিত নয়জন পার্শ্বচর সর্ব্বদা তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিত। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ফকিরের মত অনাড়ম্বর ও অতিসাধারণ জীবন যাপন করিলেও আওরঙ্গজেব বাহিরে তাঁহার পদমর্য্যাদার উপযুক্ত জাঁকজমক ও চালচলনের প্রতি বিশেষ সজাগ ছিলেন। তাঁহার বাসগৃহের চারিপাশে রাজপতাকা ও নিশান বহন করিয়া সারি সারি হস্তী দণ্ডায়মান থাকিত। শিবিরের বাহিরে আসা মাত্র বাদ্যকরেরা আটফুট দীর্ঘ সবুজ রঙের ভেরী বাজাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিত। এই বাদ্যযন্ত্রগুলি হইতে এক প্রকারের গুরুগম্ভীর শব্দ বাহির হইত। ইহা শুনিয়া ডাঃ কেরেরী অশ্রদ্ধাসহ মন্তব্য করেন যে ইতালীদেশে শূকরপালকেরা রাত্রিবেলায় যখন শূকরগুলি একত্রিত করে তখন যে রকম বিশৃঙ্খল, হৈচৈ ও দুমদাম আওয়াজ

হয় এই যন্ত্রগুলির বাজনায় ঠিক ঐ রকমের দুর্দান্ত শব্দ হইতে থাকে।

আওরঙ্গজেবের সৈন্যদলের অগ্রগমনে শিবাজী কোন বাধা দিলেন না। তিনি নিজেকে মুঘলসাম্রাজ্যের অধীনে সামন্ততন্ত্রানুযায়ী জায়গীরদার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সুতরাং মুঘলসৈন্যের তাঁহার জমির উপর দিয়া গমনাগমনে তাঁহার নালিশ করিবার কোন হেতু ছিল না। আর, বাহ্যতঃ প্রতিরোধে কোন ফলও হইত না। মুঘল সাম্রাজ্যের পরিপূর্ণ ক্ষমতার বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হওয়ার উপযুক্ত শক্তি লাভ করিতে তখনও অনেক সময়ের প্রয়োজন ছিল। তিনি নিজকে গিরিশ্রেণীর মধ্যে অপসৃত করিলেন এবং তাঁহার অধিকৃত দুর্গসমূহের সেতুর উভয় দিকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও সমুদ্র উপকূলের মধ্য দিয়া মুঘল সৈন্যের কুচকাওয়াজ করিয়া গমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ ফাল্গুন মাসের পরিষ্কার আবহাওয়ায় পাথরের মধ্যস্থ সুরঙ্গ দিয়া মাঝে মাঝে তিনি ধূলিময় রাস্তায় সারি সারি উষ্ট্রচালিত শকটে কামান, যুদ্ধের হাতী, এবং মুঘল অশ্বারোহীদের তীক্ষ্ণ শিরস্ত্রাণ, পেখমযুক্ত বল্লম এবং তুরস্কদেশ হইতে আমদানী করা ঘোড়ার পতাকাবৎ পুচ্ছের শোভাযাত্রা দেখিতেন। কল্যান শহর অধিকার শিবাজীর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ জয়ের নিদর্শন হওয়া সত্ত্বেও মারাঠারা উহা নিজেদের আয়ত্বে রাখিবার চেষ্টা না করিয়া বিলক্ষণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল। কল্যানের পুরাতন প্রাসাদে পুনরায় একজন মুসলমান শাসক মুঘল কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া শাসনভার গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ মুঘল সমরবাহিনী দক্ষিণে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হতাশ হইয়া বিজাপুরের সুলতান আলী অতিশয় হীন শর্ত্তে মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পনের প্রস্তাব পাঠাইলেন। নূতন নূতন প্রস্তাব করিয়া তিনি দূতের পর দূত পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁহাদের আবেদনপত্রগুলি নিষ্করুণ হাসির সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি অথবা দিল্লীশ্বরের নিকট বশ্যতা ঘোষণা করিয়া রাজ্যের অংশবিশেষ তাঁহার নিকট সন্ধিসূত্রে অর্পণ—ইহার কিছুই আওরঙ্গজেবের কাম্য ছিল না। তাহার আসল উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি ব্যভিচারী এই কেন্দ্র ও সমতলভূমিতে প্রতিষ্ঠিত পাপিষ্ঠ

বিজাপুর শহরকে বিনষ্ট করা।

যুদ্ধক্ষেত্রে মুঘলদিগকে প্রতিরোধ করিয়া কোন ফলের সম্ভাবনা ছিল না। বিজাপুরের লোকেরা তাহাদের শস্য পোড়াইয়া দিয়া শস্যক্ষেত্র এবং গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বিশাল প্রাচীরের অভ্যন্তরে আশ্রয়ের জন্য দলে দলে নগরীর ভিতর ঢুকিতে লাগিল। অনেকে মিনিতি করিয়া মসজিদের ভিতর আশ্রয় লইয়া পুরাতন সমাধিগুলির সম্মুখে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া রহিল। ঐ মনোরম সমাধিগুলির উপর অনেক রকম ফুলের ও কলমদানীর নক্সা অঙ্কিত ছিল। কেহ কেহ মহম্মদের কেশগুচ্ছ সম্বলিত কৌটা সংরক্ষণের ভবনেও আশ্রয় লইল। তাহারা নিরাশ্রয় ভাবে সর্ব্বদা বুক চাপড়াইত আর কপালে করাঘাত করিত। একদিকে তাহাদের এই অবস্থা, আর অপরদিকে দেয়ালের গায়ে ও ছাতের তলায় অঙ্কিত ইতালিয়ান প্রণয়যুগলের কাষ্ঠ হাসির অথবা নিস্তেজ ভেনাসের ছবি যেন তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিত। দক্ষিণ মহীশূরের টিপু সুলতান যে সব জাদুকরদিগকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে তাহার স্বার্থসংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই সব সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদের পূর্ব্বপুরুষেরা নানা প্রকার মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক্ ও অভিশাপ দিয়া আসন্ন বিপদের গতি রোধ করার ব্যবস্থা করিয়াছিল। প্রাচীরের গায়ে রক্ষিত যে সব প্রসিদ্ধ তুরস্কদেশের কামানগুলিকে প্রায় দেবতার ন্যায় পূজা করা হইত, তাহাদের অঙ্গদেশ হইতে কার্পেট ও সোনালীরঙের বস্ত্রাদি অপসরণ করিয়া ঐগুলিকে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করা হইল। "সমতলভূমির রাজা" নামক কামানটির হাঁ করা বৃহৎ মুখের মধ্যে বস্তা বস্তা শিলাখণ্ড, তীক্ষ্ণ পেরেক এবং ভাঙ্গা কাচ ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। ধোঁয়া ও কালি মাখা করালদর্শন গোলন্দাজগণ কোমর পর্য্যন্ত অনাবৃত দেহে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের মধ্যেও কাজ করিত।

গ্রামবাসীদের পলায়নের পর পরিত্যক্ত জমির যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল আওরঙ্গজেব অদ্ভুত প্রণালীতে সমূলে উহার ধ্বংস সাধন করেন। সমুদয় বৃক্ষাদি, ফল ও ফুলের বাগান আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া ফেলিলেন; খালগুলি মাটি ফেলিয়া বুজিয়া দিলেন, ও চাষের মাঠে লবন ছড়াইয়া দিলেন। পড়নে সাদাসিধা শুভ্রজামা, একহাত তরোয়ালের হাতলে ন্যস্ত

আর এক হাতে সরু নাকের ডগায় সদাপ্রস্ফুটিত গোলাপ----এই বেশে আওরঙ্গজেব সম্মুখে প্রসারিত তাঁহার করলায়ত্ত বিস্তৃত নগরীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইলেন।

ইতিমধ্যে শিবাজী যদিও তঁহার পার্ব্বত্য আশ্রয়ে নিরাপদে ছিলেন তবুও কাজকর্ম্মহীন অলস জীবন তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল এবং তিনি কিছু করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। মুঘল সামরিক বাহিনীকে পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণ করিবার উত্তেজনা ও আবেগ তিনি সংবরণ করিতে পারিলেন না। এই প্রকারের আক্রমণ অনাবশ্যক হঠকারিতা হইলেও ইহার সফল পরিণতিই ইহার স্বার্থকতা। এ পর্য্যন্ত তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যরা ঠিকমত চলিতে অক্ষম ছোট ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চলাফেরা করিয়াছে। ঐ রকম ঘোড়া সাধারণতঃ পাহাড়িয়ারা বন্ধুর পার্ব্বত্যপথে ব্যবহার করিত। মুঘল অশ্বারোহী সৈন্যদিগের ত্বরিৎগতিতে যুদ্ধ করার বংশানুক্রমিক খ্যাতি ছিল। ইহা ছাড়াও রাজপুতানার করদ রাজ্যসমূহের বেসরকারী সৈন্যরাও তাহাদের পক্ষে যুদ্ধ করিত। কাজেই মুঘলদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হইলে শিবাজীর অশ্বারোহী সৈন্যদলের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ সরঞ্জামের যে কোন প্রকার উন্নতি সাধন প্রয়োজন। ভাবিয়া চিন্তিয়া কয়েকশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া শিবাজী মুঘল সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন এবং হঠাৎ সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী অহমদনগরের উপর ঝাপাইয়া পড়েন। ঐ শহর তাহার অধিকারে রাখিবার আশা শিবাজী পোষণ করেন নাই। কিন্তু আওরঙ্গজেবের খাস আস্তাবল হইতে অশ্বারোহী সৈন্যদের ব্যবহার্য্য এক হাজার অস্ত্র লুট করিয়া তিনি নিরাপদে তাঁহার পার্ব্বত্য নিবাসে চলিয়া যান।

শিবাজীর মুঘল সৈন্যর উপর এই ধৃষ্টতাপূর্ণ আক্রমণের সংবাদ বিজাপুর নগরীর প্রাচীরের সম্মুখে শিবিরে আওরঙ্গজেবের নিকট পৌছিল। চাপা ক্রোধে আওরঙ্গজেব তাঁহার অধীনস্থ সকলকে তাঁহাদের শিথিলতার জন্য তীব্র তিরস্কার করিয়া চিঠি লেখেন। পাঠশালার শিক্ষক সুলভ কঠোর তিরস্কারের পরে শিবাজীকে কি ভাবে শাস্তি দিতে হইবে তিনি তাঁহার অনুচরবর্গকে এ বিষয়ে নির্দ্দেশ দেন। শিবাজীর সমস্ত জমি মুঘলসৈন্যের অধিকারে আনিতে হইবে। সৈন্যেরা সমস্ত গ্রাম বিধ্বস্ত করিয়া গ্রামবাসীদিগকে

নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবে। শিবাজী যে অঞ্চল দিয়া আক্রমণের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন উহার সমস্ত অধিবাসী ও ঐ সব এলাকায় নিযুক্ত মুঘল কর্ম্মচারীদের উপর শিবাজীকে অধিকতর জোরের সঙ্গে বাধা না দেওয়ার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইল। মারাঠারা যে আদৌ আহমদনগরে পৌঁছিতে পারিয়াছিল তাহাতেই স্থানীয় মুঘল-রাজকর্ম্মচারীদের যথেষ্ট বিশ্বাসঘাতকা ও অপদার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার একমাত্র শাস্তি প্রায়শ্চিত্ত ও মৃত্যু।

এই সময়ে বর্ষা শুরু হওয়ায় আওরঙ্গজেবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ প্রতিহিংসার এত ব্যাপক আদেশ পালন করার অনেক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। এই বিরতির সুযোগে শিবাজী আওরঙ্গজেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ও মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার এবং ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব করিয়া চিঠি লেখেন। কিন্তু এই বিরতির সময় শিবাজী তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যদের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ ও তাহাদের সমর শিক্ষার যথেষ্ট সুব্যবস্থা করেন।

বিজাপুর হইতে অনুরূপ চিঠি পাইয়া আওরঙ্গজেব যেরূপ ব্যবহার করিতেন এ ক্ষেত্রেও হয়ত সেইরূপ আচরণই করিতেন যদি না হঠাৎ এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইত। বর্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শাহজাহান দিল্লীতে অসুস্থ হইয়া পড়েন। যে কোন সময় তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। শীঘ্রই উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করিবেন এই আশায় যুবরাজ দারা সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন।

সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে একমাত্র আওরঙ্গজেবেরই সক্রিয় ও যুদ্ধরত সমরবাহিনী ছিল। তিনি দারার আত্মাধিকৃত রাজপ্রতিনিধিত্বের দাবি অস্বীকার করেন। বিজাপুরের অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া এবং বিজাপুরের সুলতানকে আশাতীত দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আওরঙ্গজেব উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে উত্তরদিকে চলিবার পথে তিনি সীমান্তের কর্ম্মচারিদিগকে শিবাজীর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লেখেন। "এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইবে"... তাঁহার এই সঠিক মন্তব্যের পিছনে

তাঁহার তীক্ষ্ণ ও নির্দ্দয় কণ্ঠস্বর যেন আজও শুনিতে পাওয়া যায়ঃ "এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইবে কারণ এই কুত্তার বাচচা কেবল সুযোগের অপেক্ষায় আছে"।

পরের বৎসর সর্ব্বক্ষণ সিংহাসন লাভের জন্য শাহজাহানের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে যুদ্ধের তাণ্ডবলীলায় উত্তরভারতে এক মহাহট্টগোল চলিতে লাগিল। আওরঙ্গজেব কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে উহার ন্যায্যতা সম্বন্ধে নিজের দৃঢ় প্রত্যয় না হইলে ঐ কাজে অগ্রসর হইয়া তৃপ্তি পাইতেন না। যুবরাজ দারার ছিল খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি। (১) আওরঙ্গজেব হয়তো আন্তরিকতার সহিত সত্যই মনে করিতেন যে দারা মুঘল সম্রাট হইলে ভারতে ইসলাম ধর্ম বিপন্ন হইবে। প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা জানিয়াও তিনি এক কল্পিত কাহিনী প্রচার করেন যে দারা খাদ্যবস্তুতে বিষ মিশাইয়া দিয়া শাহজাহানের অসুস্থতা ঘটাইয়াছেন। নিজের স্বার্থ পুষ্ট করার কার্য্যে অতি চতুর আওরঙ্গজেব সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেন যে তিনি নিজের জন্য কিছু করিবেন না; তাহার আসল উদ্দেশ্য জ্যেষ্ঠ* ভ্রাতা গুজরাটের প্রদেশপাল মুরাদকে সম্রাটের প্রতিনিধি পদে প্রতিষ্ঠিত করা। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজাও মুরাদের দাবি সমর্থন করেন। পুত্রদের দুঃখের বিষয় এই যে সহসা শাহজাহান আরোগ্যলাভ করিলেন এবং তাঁহার পুত্রদিগকে অগৌণে নিজ নিজ কর্ত্তব্যস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দেন। তাঁহারা পিতৃ আদেশ অমান্য করিয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন।

---

(১) তিনি ফ্লেমিস্ যেস্যুট্ পাদ্রী বা—আজীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের শাস্ত্রাদিও অধ্যয়ন করেন এবং পারস্য ভাষায় উপনিষদ্ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত একখানি গ্রন্থে তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। এই গ্রন্থের নামকরণ, "দি মিঙ্গলিং অব্ টু ওসেনস্ (The mingling of two oceans) অথবা "দুই মহাসমুদ্রের মিলন" হয়তো তাঁহার অশুভ পরিণামের পূর্ব্ব লক্ষণের আভাস দিয়া থাকিবে।"

(*) ইহা গ্রন্থকারের ভুল। মুরাদ ছিলেন আওরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ নহেন।

ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেব সুজার ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি প্রকৃত আস্থা নাই এই সব বলিয়া মুরাদের মনে সুজার বিরুদ্ধে প্রতিকূল ধারণার সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি মুরাদকে ইহাও বলেন, "আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলিব যে আমার মাত্র একটি আকাঙ্খা আছে এবং তাহা হইল একজন প্রকৃত বিশ্বাসী গোঁড়া মুসলমানকে সম্রাটরূপে অধিষ্ঠিত দেখা। ইহা পূর্ণ হইলেই আমি ফকীরের মত আমার জীবনের বাকী দিন কয়টা কাটাইয়া দিব।"

মুঘল রাজপ্রাসাদের মধ্যে সম্রাট নন্দিনী জাহানারা ও রোশানারা বেগমদ্বয়ের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ফলে দলাদলি ও বিভেদের শেষ ছিল না। পরমাসুন্দরী জাহানারা ছিলেন পিতার অতি আদরের কন্যা। এই বিদূষী ও কবি সম্রাটদুহিতা যুবরাজ দারার প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন। তাঁহারা একত্রে পারস্য কবিদের লেখা পাঠ করিতেন এবং সমসাময়িক প্রসিদ্ধ অতিন্দ্রিয়বাদী (সুফি ?) মনীষী তাব্রিজির কবিতা আলোচনা করিতেন। এই কবির দার্শনিক চিন্তাধারা তাঁহারই সুপরিচিত মন্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম সম্বন্ধে সমস্ত বাগবিতণ্ডার গন্তব্যস্থল একই; এই সব বিষয়ে সকলের স্বপ্নলোকের ছবিও অভিন্ন, বিভিন্নতা শুধু ব্যাখ্যা ও টিকা টিপ্পনিতে।" রোশানারা বেগম ভগ্নীর সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হইতে পারেন নাই; কিন্তু অপূর্ব্ব জাকজমক ও বিলাসিতার জীবনযাত্রা প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি খানিকটা সান্ত্বনা পাইতেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী যে পিতার এবং সমগ্র প্রাসাদের অধিবাসীদিগের বিশেষ সমাদরের পাত্রী এ বিষয়ে রোশানারা সর্ব্বদা সচেতন ছিলেন। এই জন্যই হয়ত তিনি কর্কশ ও বিদ্রূপাত্মক ভাষা প্রয়োগ করিয়া সকলকে ভীত ও সন্ত্রস্ত রাখিতেন। দারার চারিত্রিক মাধুর্য্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া তিনি আওরঙ্গজেবের প্রতি অতিশয় গভীরভাবে অনুরক্ত হইলেন। তাঁহার ষড়যন্ত্রে অনেক সময় সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা বিকল হইয়া পড়িত। অবিরত তিনি প্রমাণ করিবার চেষ্টায় ছিলেন যে আওরঙ্গজেবকে লোকে ভুল বুঝিয়াছে। তাঁহার মতে আওরঙ্গজেব ছিলেন পিতৃভক্ত পুত্র, ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান মুসলমান

এবং সিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।

অবশেষে শাহজাহান তাঁহার কনিষ্ঠ তিন পুত্রকেই বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাঁহারা কেহই সাম্রাজ্যের অধিকারী হইতে পারিবেন না এই মর্মে আদেশ দেন। যুবরাজ দারাকে বিশ্বাসী ও অনুরক্ত সৈন্য-বাহিনী পরিচালনার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইল। পিতার নিকট দারা বিদায় নিতে আসিলে বৃদ্ধ সম্রাট তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও পুনঃ পুনঃ তাহাকে আত্মরক্ষা করার জন্য সনির্বন্ধ অনু-রোধ করেন। দারা স্পার্টান দেশীয় লোকের ন্যায় অতি সংক্ষেপে উত্তর দেন, "হয় সিংহাসন লাভ নয় সমাধি আশ্রয়" এবং অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ যাত্রা করেন। অনতিকালপরেই তিনি পরাজিত হন। বিদ্রোহী রাজ-পুত্রেরা আগ্রায় প্রবেশ করিয়া শাহজাহানকে সিংহাসনচ্যুত করেন। আগ্রাদুর্গে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইল আর তাঁহার বন্দীজীবনের অংশভাগী হইলেন সুন্দরী রাজকুমারী জাহানারা। এদিকে রোশানারা আওরঙ্গজেবের পাশে ঘোড়ায় চড়িয়া বিজয় উল্লাসে মত্ত হইলেন।

পরে একদিন আওরঙ্গজেব রাজপুত্র মুরাদকে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে অতিরিক্ত মদ্যপান করান। আওরঙ্গজেবের ব্যবস্থামত একটি ক্রীতদাসী মেয়েকে টাকা দিয়া বশীভূত করিয়া মুরাদকে উপহার দেওয়া হয়। এই রমণী কৃত্রিম প্রণয় ও আদর দেখাইয়া মদের নেশায় বিভোর মুরাদকে তাঁহার তরবারি ত্যাগ করিতে বশ করে। আওরঙ্গজেবের নিযুক্ত প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ অস্ত্রহীন কুমারের হাত সোনার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া তাঁহাকে রাতারাতি স্থানান্তরিত করে। পরদিন সকালে আওরঙ্গজেব নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন।

ইহার কয়েকমাস পরে দারাকে নিধন করা হয়। দারা জেসুট পাদ্রী বাজীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে তাঁহাকে যেন খৃষ্টান রূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু দারাকে এই সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হইল না। দারা বলিয়াছিলেন "মহম্মদ আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র যিশুখৃষ্ট ও তাঁহার মাতা মেরী আমাকে নূতন জীবন দান করিবেন।" ইহার পরে তিনি শান্ত চিত্তে ঘাতকের হস্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একটি রূপার

থালায় দারার খণ্ডিত মস্তক আওরঙ্গজেবের নিকট আনা হইলে তিনি মৃতের প্রতি নানারূপ বিদ্রূপ করেন। তারপর মস্তকটি একটি থলির মধ্যে রাখিয়া উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া তিনি উহা শাহজাহানের নিকট পাঠাইলেন। পুত্র তাঁহাকে উপহার সামগ্রী পাঠাইয়াছে এই ধারণা প্রথম শাহজাহানের হৃদয়ে গভীরভাবে স্পর্শ করে এবং তিনি আগ্রহ সহকারে মোড়কটি খুলিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই উহার অভ্যন্তরীন সামগ্রী দেখিয়া তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়েন।

মৃত যুবরাজ দারাকে আরও অপমান করার জন্য আওরঙ্গজেব দারার পত্নী রনাদিল বেগমকে অধিকার করিতে মনস্থ করেন। রাজসভা মুগ্ধকারিনী এই হিন্দুমহিলার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া দারা ইহাকে বিবাহ করেন এবং তৈমুরবংশীয় রাজকুলবধূ রূপে গ্রহণ করিতে সম্রাট শাহজাহানকে রাজী করান। আওরঙ্গজেব এই মহিলাকে রাজপ্রাসাদে আহ্বান করিলে তিনি বলিয়া পাঠান "যে সৌন্দর্য্যের প্রতি আপনি আসক্ত হইয়াছেন উহার আর অস্তিত্ব নাই; আমার রক্ত যদি আপনার বাসনা চরিতার্থ করিতে পারে তবে ইহা আপনার জন্য রহিল।" তারপর একখানা ছুরিকা লইয়া তিনি পুনঃ পুনঃ স্বীয় মুখমণ্ডলে আঘাত করিতে লাগিলেন।

মুরাদের শিরচ্ছেদ, সুজার ব্রহ্মদেশে পলায়ন ও তথায় তাহার বিনাশ এবং দারার পুত্র সুলেমানকে তিলে তিলে হত্যার পরে এই সুদীর্ঘ নাটকীয় গৃহযুদ্ধের অবসান হয়। সরবতের সহিত আফিম মিশাইয়া সুলেমানকে রোজ ইহা পান করিতে বাধ্য করা হইত। ইহার পরিণাম হইল জড়ত্ব হইতে ক্রমশঃ বুদ্ধিলোপ, পরে পক্ষাঘাত এবং অবশেষে সুলেমানের অতি ভয়ঙ্কর মৃত্যু। প্রতিভাবান জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারার প্রতি বিদ্বেষ চরিতার্থ করিবার একমাত্র উপায়রূপে আওরঙ্গজেব এই সুচিন্তিত কিন্তু অমানুষিক নিষ্ঠুর পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া অভিহিত, কবি এবং কৌতুকপ্রিয় কিন্তু ভাগ্যহীন দারা আওরঙ্গজেবকে "প্রার্থনা বিক্রেতা" বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। তাহার এই পরিণতি। (১)

(১) এই সব ঘটনার জন্য মানুচিচর বিবরণে ও বার্ণিয়া-এর "মুঘল সাম্রাজ্যে বিগত বিদ্রোহের ইতিহাস" (History of the Last Rebellion in the States of Moghal) নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

নবম অধ্যায়

অপ্রত্যাশিত ভাবে আওরঙ্গজেবের কবল হইতে মুক্তি পাওয়ায় বিজাপুরের শাসন প্রতিষ্ঠান যেন নবজন্ম লাভ করিয়া নূতন উদ্যমে ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইল। মুঘলেরা যে আবার একদিন হানা দিবে ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা গিয়াছিল। তবে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত যুদ্ধ চলিবার সময়ে বিজাপুর যে কিছুকাল বিরাম উপভোগ করিবে ইহা স্বাভাবিক। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে সুলতানের মৃত্যু হওয়ায় রাজমাতা হইলেন রাজ্যের প্রকৃত শাসক। চরিত্রের দৃঢ়তা এবং বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি দ্বারা তিনি তরুণ ও রুগ্ন সুলতান অপেক্ষা অনেক বেশী দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। যে সব জায়গীরদারদের অবাধ্যতার জন্য মুঘলদিগের পক্ষে বিজাপুরের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছিল তাঁহাদিগকে দমন করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি মন্ত্রীদিগকে সবিশেষ অনুরোধ করেন। এই জায়গীরদারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শিবাজী। এখন হইতে শিবাজীকে কি ভাবে দমন করা যায় এই চিন্তা সর্ব্বদা বিজাপুরের দরবারের কার্য্যকলাপ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। ডাঃ ফ্রায়ার তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, "তাহারা তাঁহাকে রাষ্ট্রের অসংযত ও অতি স্ফীত বিষাক্ত অঙ্গ বলিয়া মনে করিত। তাহারা বলিত যে শিবাজী নিজেই ইচ্ছামত নিজের বেতন ধার্য্য ও বন্টন করেন, ইহাতে বিবেক বা ন্যায় অন্যায়ের ধার ধারেন না। তাহারা শিবাজীর প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুর জহ্লাদ প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রাজমাতা সকল ওমরাহদের দরবারে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিতে বলেন। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হইল শিবাজীকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া রাজ্যের সীমানা পুনরুদ্ধার করা। তাঁহার প্রস্তাবে প্রথমেই সম্মত হইলেন তাঁহার ভগিনীপতি আফজল খাঁ। এই আফগান আমীর ছিলেন যেমনই দীর্ঘাকৃতি তেমনই অসাধারণ শক্তিশালী। সেনাপতি হিসাবেও তিনি বেশ সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। নির্ভীক অসিযোদ্ধা আফজল

খাঁ। মুঘলদিগের সাম্প্রতিক বিজয়নগর অবরোধের সময় অস্ত্রচালনায় নিপুনতার জন্য খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করিয়া তাহাদিগকে তুরস্কদেশীয় কামান সরবরাহ করিয়া উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। প্রকাশ্য দরবারে আফজল খাঁ অসম্ভব রকম দম্ভভরে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। সগর্ব্বে তিনি ঘোষণা করেন যে ঘোড়ায় বসিয়া থকিয়াই তিনি নগন্য হিন্দু ডাকাত শিবাজীকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিবেন; শিবাজীর ইঁদুরের মত গতিবিধি; সেইজন্য তিনি তাহাকে ইঁদুরের মত খাঁচায় পুরিয়া রাজধানীতে লইয়া আসিবেন। সেখানে পিঞ্জরাবদ্ধ শিবাজীকে লইয়া জনসাধারণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে পারিবে। কিন্তু গোপন বৈঠকে তাঁহার স্পর্দ্ধা ও আত্মবিশ্বাস একটু কম প্রকাশিত হইত। রাজমাতার সহিত পরামর্শ করায় তিনি আফজল খাঁকে বলেন যে শিবাজীকে যেন বন্ধুত্বের ভান দেখাইয়া ধরিয়া আনা হয়।

আফজল খাঁর ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা চিন্তা করিয়া ভবিষ্যতে জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক বিচলিত ও বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া লেখেন, "মৃত্যুদূত যেন তাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া সর্ব্বনাশের পথে লইয়া চলিল।" একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে এই অভিযানের উদ্যোগপর্ব্ব হইতেই কেমন যেন একটা ভীতি ও বিভীষিকার ভাব চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মারাঠাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীতে প্রকাশ এই যে আফজল খাঁ এই অভিযানে রওনা হওয়ার পূর্ব্বাহ্নে যখন জুম্মা মসজিদে তাঁহার দুঃসাহসিক কাজের সফলতা কামনা করিয়া উপাসনায় রত ছিলেন সেই সময় মসজিদের ইমাম সাহেব ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিয়া উহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া চীৎকার করিয়া বলেন যে আফজল খাঁর স্কন্ধোপরি তাঁহার মাথা নাই। শুধু একটা ফাঁপা গর্ত্ত রক্তাক্ত কলেবরের উপরে হাঁ করিয়া আছে। এইরূপ অশুভ লক্ষণ হয়তো তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বাভাষ সূচিত করিতে পারে ইহা বুঝিতে পারিয়া আফজল খাঁ তাঁহার প্রাসাদে ফিরিয়া আসেন। এই প্রাসাদের ধূসর ধ্বংসস্তূপের প্রকাণ্ড ঢিপি আজিও বিজাপুর নগরীর উপকণ্ঠে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অবর্ত্তমানে যাহাতে অন্দরমহলের রমনীরা কোন অজানা লোকের

আলিঙ্গনাবদ্ধ হইতে না পারে এইজন্য বাড়ী ফিরিয়া আফজল খাঁ তাহার চৌষট্টিজন পত্নীকে জলে ডুবাইয়া মারিবার আদেশ দেন। কোন অভিযোগ না করিয়া এবং তাঁহাদের এই পরিণতি অদৃষ্টের ফের মনে করিয়া একজন ব্যতীত অন্য সকলেই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু চৌষট্টিতম পত্নী পলায়ন করার উপক্রম করিতেই তাহার মাথা কাটিয়া ফেলা হয়। বর্ত্তমান কালে পর্য্যটকদের সারি সারি অবস্থিত তেষট্টিটি ক্ষুদ্র সমাধি এবং একটু দূরে অবস্থিত চৌষট্টিতম সমাধিটি দেখান হয়। এই শেষটিতেই ভাগ্যহীনা পত্নীর পলায়নের চেষ্টা সমাধিস্থ হয়।

পরপর আরও কয়েকটি অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় আফজল খাঁ অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার সমরবাহিনী সহ শিবাজীকে গ্রেপ্তার করিতে চলিলেন। পথে নানা প্রকার বীভৎস নিষ্ঠুর কাজ করিতে করিতে তাহারা মারাঠা অঞ্চলে অগ্রসর হইলেন। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে আফজলখাঁর এইরূপ আচরণের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি হয়তো মনে করিয়াছিলেন যে প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠাদিগকে ভয়ে আতঙ্কিত করিয়া উহাদিগকে আত্মসমর্পন করিতে বাধ্য করিবেন। তাঁহার মনে এইরূপ একটা ধারানাও ছিল যে মারাঠাদের উপরে অত্যাচারের ফলে শিবাজী হয়তো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাহাড়ের নিরাপদ স্থান হইতে আঁফজলখাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাহির হইয়া আসিবেন।

আফজলখাঁর আদেশে হিন্দু মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ ও ধূলিসাৎ করা হইল এবং পবিত্র গোমাতা কাটিয়া উহার রক্তে মন্দিরের বেদী রঞ্জিত করা হইল। এইরূপ হিংস্র কার্য্যাবলীর মধ্যেও শিবাজীকে বন্দী করিয়া অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় রাখিবার জন্য একটা প্রকাণ্ড খাঁচা তৈয়ার করিবার নানা মজাদার কল-কৌশল উদ্ভাবন করিয়া তিনি বেশ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

আফজলখাঁর অভিযানের ও তাঁহার আস্ফালনের এবং নিষ্ঠুর কার্য্যকলাপের কাহিনীর সংবাদে শিবাজীর শিবিরে প্রথমতঃ খুবই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এ পর্য্যন্ত মারাঠাদের বীরত্ব তাহাদের পার্ব্বত্যদেশে অবস্থিত হীনবল নগর বা অবহেলিত দুর্গের উপর আকস্মিক আক্রমণের মধ্যে সীমিত ছিল মাত্র। কিন্তু এখন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত আরব দেশীয় অশ্বারোহী, পাঠান

পদাতিক এবং তুরস্কের গোলন্দাজ সৈন্যসহ এক বিশাল সমর বাহিনী ভয়ঙ্কর অথচ সুনিশ্চিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইয়া অগ্রসর হইতেছিল। শিবাজীর এতদিনের সাফল্য মারাঠাদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিয়াছিল তাহার ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। মারাঠা সমর সমিতির মন্ত্রণা সভায় শিবাজীর সেনাপতিরা সকলেই আফজলখাঁর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিল এবং যে কোন সর্ত্তে একটা মিট্‌মাটের ব্যবস্থা করার জন্য শিবাজীকে প্ররোচিত করিতে লাগিল। শিবাজীও আপোষে মীমাংসা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে সূক্ষ্ম কূটনীতির ও শিষ্টাচারের চাল বজায় রাখিয়া একজন স্থূল বুদ্ধি ও স্থূলকায় মুসলমান আমীরকে বিভ্রান্ত করার কাজ তাঁহার ক্ষমতা অদ্বিতীয়। কিন্তু তিনি একথাও বেশ বুঝিয়াছিলেন যে মুসলমানদিগের সঙ্গে সম্মুখ ও প্রকাশ্য যুদ্ধ না করিতে পারিলে মারাঠাদের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। সারা রাত্রি ধরিয়া মন্ত্রণাসভায় বাকবিতণ্ডা চলিল। ভোরের দিকে অন্ততঃ কয়েকঘন্টা ঘুমাইয়া লইবার জন্য শিবাজী সভা ত্যাগ করেন। কিম্বদন্তী এই যে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে তিনি স্বীয় সঙ্কল্প অনুযায়ী কাজ করিবার সমর্থন পান। দ্বিগুন সাহস ও আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া শিবাজী মন্ত্রণা সভায় পুনরায় যোগদান করেন এবং যুদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে দৃঢ়মত প্রকাশ করেন। তাঁহার সহকর্ম্মীরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধে রাজী হন, কিন্তু তাঁহারা যেন মনে মনে সর্ব্বনাশের বিভীষিকা কল্পনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর শিবাজী তাঁহার মাতার নিকট সংবাদ পাঠান। এই অদম্য উৎসাহশীলা রমণী তৎক্ষণাৎ পুত্রের পার্ব্বত্যশিবিরে চলিয়া আসেন। জীবনপণ করিয়া শিবাজীর মুসলমানদিগকে প্রতিরোধ করার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তিনি যুদ্ধ করার সপক্ষে মত দেন এবং বলেন যে শিবাজীর পক্ষে এখন অন্য আর কোন পথ খোলা নাই।

ঠিক এই সময়ে এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। হঠাৎ আফজল খাঁর প্রেরিত কয়েকজন দূত শিবাজীর নিকট কতকগুলি প্রলোভনীয় সর্ত্ত উপস্থিত করে। উহার মর্ম্ম এই যে শিবাজী যদি কেবল নামে মাত্র বিজাপুর রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করেন, তবে যে সব

এলাকা বর্ত্তমানে শিবাজীর অধীনে আছে সুলতান ঐসব অঞ্চলের উপর শিবাজীর সক্রিয় অধিকার স্বীকার করিয়া লইবেন। বিজাপুরের রাজ-মাতার উপদেশ অনুযায়ী শিবাজীকে ছলচাতুরীতে ভুলাইয়া বন্দী করিবার চক্রান্তের কথা শিবাজী একেবারেই জানিতেন না। কাজেই আফজল খাঁর আস্ফালন ও শিবাজীকে ধরিবার জন্য তাহার বহু প্রচারিত পিঞ্জর প্রস্তুত করার কাহিনী এবং মারাঠা অঞ্চলে তাঁহার সুচিন্তিত ধ্বংসাত্মক কার্য্য দ্বারা সংত্রাসসৃষ্টির বিবরণ জ্ঞাত থাকায় শিবাজী এইরূপ প্রস্তাবে স্বভাবতঃই অতিশয় বিস্মিত হইলেন। কিন্তু সন্দেহপূর্ণ মনোভাব গোপন করিয়া শিবাজী আফজল খাঁর দূতদিগকে যথেষ্ট সৌজন্যের সহিত আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

দূতদিগের মধ্যে একজন ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। (১) রাত্রিবেলায় শিবাজী গোপনে তাঁহার তাবুতে গমন করিলেন এবং তাহার অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিয়া সানুনয়ে বলেন যে তিনি যদি প্রকৃত হিন্দু হন এবং ব্রাহ্মণ-গনের প্রতি হিন্দুসমাজের ভক্তি শ্রদ্ধা সম্বন্ধে তিনি যদি অবহিত থাকেন তবে আফজল খাঁর এই আকস্মিক প্রস্তাবের প্রকৃত অভিসন্ধি কি, ইহা তাহাকে বলিতেই হইবে। তাহার বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিতে পারিলে আফজল খাঁ তাঁহাকে কিরূপ ভীষণ শাস্তি দিবেন একথা ভাবিয়া ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আফজল খাঁ শিবাজীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার সময় পথে কত হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়াছেন, কত দেব দেবতার মূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছেন, পর পর এই সব কাহিনী বলিয়া শিবাজী ব্রাহ্মণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

---

(১) মুসলমান রাজ্যগুলির সহিত বিবাদে শিবাজীর একটা সুবিধার কারণ ছিল যে ঐ সব রাজ্যের হিন্দুরাজ কর্ম্মচারীগণ প্রায় সকলেই তাঁহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইউরোপীয় ইতিহাসে ক্লোভিসের (Clovis) উত্থানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গথিক রাজ্যগুলিতে ফ্র্যাঙ্কেরা যদিও সংখ্যালঘু ছিল তথাপি গথিক রাজাদের অধিকাংশ প্রজারা ক্যাথোলিক ছিল বলিয়া ফ্রাঙ্কসগণ তাহাদের সহানুভূতি পাইত।

ইহা শুনিতে শুনিতে ব্রাহ্মণ ভাঙ্গিয়া পড়েন। তিনি শিবাজীকে বলেন যে তিনি নিজে আফজল খাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিষয় কিছুই জানেন নি। তবে তিনি আফজল খাঁর কর্মচারীদের বলাবলি করিতে শুনিয়াছেন যে তাহাদের ধারনা যে শিবাজীকে সন্ধি করার মন্ত্রণার আহ্বান করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া তাঁহারা বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

সব শুনিয়া শিবাজী ব্রাহ্মণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আর একটি অনুরোধ করেন। শিবাজী বলেন যে ইহা রক্ষা করিলে তিনি যুদ্ধ বিরতির পর ব্রাহ্মণকে অনেক জমিজমা দিয়া পুরস্কৃত করিবেন। শিবাজী অনুরোধ করেন যে ব্রাহ্মণ যেন আফজল খাঁর শিবিরে ফিরিয়া তাঁহাকে বলেন যে ভয়ে শিবাজীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে; এবং তিনি খাঁসাহেবের বশ্যতা স্বীকার করিতে রাজী; কিন্তু ভয়ে তিনি আফজল খাঁর শিবিরের দিকে নামিতে সাহস করেন না। তারপর অতি সন্তর্পনে একটা প্রস্তাব করেন এই যে সিংহের মত বিক্রমশালী আফজলখাঁ কি শিবাজীর সহিত সাক্ষাত করিতে আসিতে পারেন না?

পরের দিন দূতেরা ফিরিয়া আসিলে আফজল খাঁ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শিবাজীর এত ভয় পাওয়ার কথা শুনিয়া বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। তিনি শিবাজীর ইচ্ছামত যে কোন স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে রাজী হইলেন। ব্রাহ্মণ প্রস্তাব করেন যে মোড়ের ধনদৌলত লুণ্ঠন করিয়া শিবাজী যে উচ্চ প্রতাপগড় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহারই একটু নীচে একটা পাহাড়ের শিখরে সাক্ষাতের উপযুক্ত স্থান হইবে। কোয়না (Koyna) উপত্যকার মুখে ফাকা সুন্দর মালভূমি, চারিদিকে ঘন বন, ইহার আশে পাশে গোলক ধাঁধার মত রাস্তাগুলি কেবলমাত্র শিবাজীর পাহাড়িয়া অনুচরদের নিকটই পরিচিত ছিল।

এই মালভূমিতে যাইবার জন্য শিবাজী একদল লোককে বনজঙ্গল কাটিয়া একটি পরিস্কার রাস্তা তৈয়ার করার জন্য লাগাইলেন। এই রাস্তা ঠিক মালভূমি পর্য্যন্ত পৌছিয়া থামিয়া যায়। বনের ভিতরের আঁকাবাঁকা পথ জানা না থাকিলে কাহারও পক্ষে এই নূতন রাস্তা ছাড়া অন্য পথে মালভূমি হইতে ফিরিয়া আসা সম্ভব ছিল না। দুই দিকের বনের মধ্যে শিবাজী বিশ্বস্ত অনুচরদের পাহারা দিতে বলিলেন।

বনের মধ্যে অনিশ্চিত আলো ও ছায়ার সঙ্গে অপরিচিত কোন লোক এই সব পাহারাদারদের দেখিতে একেবারেই সমর্থ হইত না। আফজল খাঁর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বদিন সারারাত্রি শিবাজী জগন্মাতার (ভবানীর) মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কাটাইলেন। এ যেন জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা চরম সন্ধিক্ষনে বীর যোদ্ধার নিশিপালন ব্রত।

প্রভাতে উঠিয়া শিবাজী পূজাপার্ব্বনাদি উৎসবে যোগদানের জন্য শাস্ত্রীয় বিধানমত স্নানাদি সম্পন্ন করেন। তিনি ভগবতী বসুন্ধরার নিকট প্রার্থনায় ঐদিন যাহাতে মাতা তাহাকে নিরাপদে বক্ষে রক্ষা করেন এই নিমিত্ত সনির্ব্বন্ধ মিনতি করেন। তারপর তিনি সূর্যের দিকে মুখ করিয়া অঞ্জলিপূর্ণ নির্ঝরিণীর শীতলজল সম্মুখে নিক্ষেপ করেন। তিনি যখন জগৎস্রষ্টা সূর্য্যদেবকে প্রণাম করেন সেই সময় রৌদ্রদীপ্ত জলের ছটা পার্ব্বত্য মুক্ত বায়ুতে ঝকমক করিয়া উঠিল।

তারপর শিবাজী একখানি শুভ্র আচকান পরিধান করেন। কিন্তু ইহার নীচে পরিলেন একটি লৌহনির্ম্মিত বক্ষাবরণ। কোমরবন্ধে বাঁধিলেন বিছার মত একটি ছুরিকা এবং বামহাতের তালুতে বাঘনখ নামক এক ক্ষুদ্র কিন্তু অতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র আঁটিয়া বাধিলেন। বাঘের নখের মত দেখিতে কতকগুলি বক্র ও তীক্ষ্ম পেরেক সারি সারি ইহাতে শক্ত করিয়া নিবদ্ধ ছিল। (১)

আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে শিবাজী যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। যুদ্ধে শিবাজীর মৃত্যু ঘটিলে তঁহার সহকর্ম্মিগণ তাহার পরিবারবর্গের তত্ত্বধান করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল। এই সময় ভবিষ্যত বিপদের আশঙ্কায় ম্লানমুখ সহকর্ম্মিগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া শিবাজী একদিন নিস্তব্ধ পাহাড়ের চূড়ার উপর দাঁড়ায়াইয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এমন সময় সহসা বনের মধ্যে হইতে বাহির হইয়া তাঁহার মাতা জীজাবাই সেখানে উপস্থিত হইলেন। পুত্রের মত মাতার পরিধানেও অম্লান শুভ্র বেশ। ঢিলা এবং লম্বা পোষাকে তাহাকে প্রায় ভৈরবীর মত

---

(১) সাতারার ভবানী মন্দিরে রক্ষিত এই অস্ত্র এখনও পর্য্যটকদের দেখান হয়।

দেখাইতে ছিল। উন্নত মস্তক ও দীপ্তনেত্রে তিনি দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হইলেন। শিবাজী সহকর্ম্মীদিগকে দূরে রাখিয়া দ্রুত মাতৃদেবীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। নতজানু হইয়া তিনি মায়ের চরণস্পর্শ করেন। কিয়ৎকাল এক গম্ভীর পরিস্থিতি। নীল আকাশের নীচে নতজানু সৈনিক পুত্রের ও তদীয় মাতার নিশ্চল নিস্পন্দ দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ; নীরব সহকর্ম্মিগণের দৃষ্টি বিপরীত দিকে আবদ্ধ। সে এক অভিনব অবস্থা। উপরে চিলপক্ষী বৃত্তাকারে উড্ডীয়মান আর নিস্তব্ধ পাহাড়ে একটা চাপা উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার ভাব। সহসা জীজাবাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। শিবাজীর মস্তকে হাত রাখিয়া মাতা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন ও বলেন, "তোমারই জয় হইবে······।" কিন্তু এইরূপ অপূর্ব্ব পরিবেশের উপযোগী গম্ভীর ও উদাত্তভাষার পরিবর্ত্তে নারী-কণ্ঠের ক্ষীণস্বরে ধ্বনিত হইল, "বৎস, সাবধানে, অতি সাবধানে, চলিও।"

ইতিমধ্যে আফজাল খাঁর শিবিরে রাত্রি অবসানে ভেরী নাকাড়া প্রভৃতি বাজনা ও বিরাট ঘণ্টা ধ্বনির কলরব সহ নবদিবসের আগমন ঘোষিত হইল। নীচের পাহাড়ের পাদদেশ হইতে অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সেনানী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু এই দিনও প্রভাতে অশুভ লক্ষণ যেন আফজল খাঁকে অনুসরন করিতে লাগিল। বিজাপুর রাজ্যের প্রতীক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পতাকা বাহক অগ্রগামী বৃহত্তম হস্তীটি অকস্মাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে থামিয়া পড়িল। মাহুতের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইহাকে সম্মুখে চলিতে রাজী করান গেলনা। বিয়োগান্ত গ্রীক নাটকের অত্যাচারী রাজা পেনথিয়সের (Pentheus) মত আফজল খাঁ দৈব প্রেরিত অলৌকিক সঙ্কেত সমূহ অগ্রাহ্য করিয়া যেন নিজের সর্ব্বনাশের পথে ধাবিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে শিবাজীকে তিনি কবলে আনিয়া ফেলিয়াছেন। ইতি মধ্যেই তিনি বিজাপুর নগরীর পতাকাশোভিত রাস্তায় ও কর্পেট মণ্ডিত বারান্দায় মহাসমারোহে বিজয়ের শোভাযাত্রা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। শিবিকায় আরোহন করিয়া তিনি দুইজন দেহরক্ষী এবং বান্দু নামক একজন দানবাকৃতি অসিযোদ্ধা সহ সমর বাহিনী পিছনে রাখিয়া ত্বরিৎগতিতে ছুটিয়া চলিলেন।

আফজল খাঁ ও শিবাজীর পরস্পর সাক্ষাতের সর্ত্তানুযায়ী স্থির হয় যে উভয়ের প্রত্যেকের সঙ্গে মাত্র তিনজন লোক থাকিতে পারিবে। আফজল খাঁ যথার্থরূপেই অনুমান করেন যে তাঁহার নিজের দৈহিক ও তাঁহার সঙ্গী তিনজন অসিযোদ্ধার মিলিত শক্তি শিবাজীর ও তাঁহার সঙ্গীদিগের শক্তির তুলনায় অনেক বেশী হইবে। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তিনি শিবাজীর নিকট প্রেরিত ব্রাহ্মণ দূতের প্রদর্শিত পথে সাক্ষাতকারের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইবার জন্য ছুটিয়া চলিলেন। বন কাটিয়া শিবাজী যে পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন ঐ রাস্তায় তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। দুই দিকে তাঁহাদের অদৃশ্য শত শত চক্ষু বনের মধ্যে লুকাইয়া তাঁহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। মাঝে মাঝে শুষ্ক ডাল ভাঙ্গার মচ্ মচ্ শব্দে আফজল খাঁর মনে হইতেছিল যে কোন বন্য জন্তু বোধ হয় মানুষের শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া নিরাপদ স্থানে লুকাইতেছে।

দুইপক্ষের নেতৃদ্বয়ের মিলনস্থানে প্রকাণ্ড দরবারী শামিয়ানা খাটাইয়া গালিচা, সিল্কের গদি আঁটা সোফা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া সুন্দররূপে সজ্জিত করা হয়। আফজল খাঁ তাঁহার অনুচর ত্রয় সহ শামিয়ানার ভিতরে প্রবেশ করেন। শিবাজীও অগ্রসর হইলেন, কিন্তু অসিযোদ্ধা বান্দুকে দেখিবামাত্র তিনি একেবারে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। শিবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, বিজাপুরের রাজদূতের সঙ্গে প্রসিদ্ধ অসিযোদ্ধার আগমনের উদ্দেশ্য কি?

আফজল খাঁ বান্দুকে তাবুর বাহিরে থাকিতে আদেশ দিলে তিনি নিজের অনুচরদের মধ্যে একজনকে তখনই বিদায় দিতে রাজী হন। তখন শিবাজী শামিয়ানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। আফজল খাঁ প্রথম হইতেই একটা ঝগড়া বাঁধাইবার জন্য মনস্থির করিয়া আসিয়াছিলেন। শিবাজীর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কিছুমাত্র বর্ণনা না করিয়াই তিনি উচৈচস্বরে বলিতে লাগিলেন যে একটা সামান্য জায়গীরদারের পুত্রের পক্ষে এইরূপ দামী বিলাস সামগ্রী দিয়া রাজা রাজরার অনুকরণে শামিয়ানা ও তাঁবুর ঘর সজ্জিত করার দৃশ্য তাঁহার পক্ষে অসহ্য। শিবাজী উত্তরে বলেন যে এই গদি আটা সোফা ও গালিচা প্রভৃতি তাঁহার

ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় না; উহা বিজাপুর সুলতানের প্রেরিত বিশিষ্ট রাজদূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আনা হইয়াছে। ক্ষণিকের জন্য আফজল খাঁ যেন খুসী হওয়ার ভাব দেখাইলেন। সন্ধিস্থাপন উদ্দেশে আমন্ত্রিত সভা-সমিতিতে প্রচলিত দুই পক্ষের নেতাদের প্রাথমিক আলিঙ্গন করিবার প্রথা অনুযায়ী আফজল খাঁ দুই বাহু সম্প্রসারিত করিয়া শিবাজীকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন। শিবাজী লম্বায় আফজল খাঁর স্কন্ধ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিতেন। উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়া মাত্র আফজল খাঁ শিবাজীর পিঠের উপর হইতে হাত তুলিয়া শক্ত করিয়া তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিলেন। বলিষ্ঠ বাহু দিয়া আফজল খাঁ তাঁহার গলা লৌহবেষ্টনে চাপিয়া ধরিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারা মাত্র শিবাজী প্রথমে ভয়ে ও আশঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া গেলেন। যতই তিনি মোচড় দিয়া গলা ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করেন ততই আফজল খাঁর বজ্রমুষ্টি আরও শক্ত হইতে লাগিল। শিবাজী হয়তো দোল খাইয়া পা পিছ্লাইয়া পড়িয়া যাইতেন যদি না ঠিক সেই সময় তিনি সর্পগতিতে দেহের পাক দিয়া ডান হাত মুক্ত করিয়া তাহার বাম হস্তে লুক্কায়িত লৌহ নির্ম্মিত বাঘ-নখ অস্ত্র আফজল খাঁর পৃষ্ঠদেশে গভীরভাবে বসাইয়া দিতে পারিতেন। তারপর ডানহাতে কোমরাবদ্ধ 'বিছুয়া' ছোরা লইয় আফজল খাঁর পার্শ্বদেশে সজোরে আঘাত করিলেন। আফগান সেনাপতি আফজল খাঁ তখন টলমল করিয়া পিছাইয়া যান এবং বেদনায় ও ক্রোধে ভীষণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করেন। হঠাৎ কি হইল দেখিবার জন্য তাঁহার অনুচরেরা দৌড়াইয়া আসিল। শিবাজীর সঙ্গীরাও আসিয়া উপস্থিত হইল। দুপক্ষে তখন একটা ছোট খাট দ্বন্দ্ব যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু কি করিয়া আহত সেনাপতিকে শিবিরে লইয়া যাওয়া যায় এই ভাবনায় মুসলমান দিগের যুদ্ধের গতি খানিকটা ব্যাহত হয়। কোনও-রূপে মারাঠাদের ঘুষি ও কীলচড় ঠেকাইয়া তাহরা দৌড়াইয়া আফজল-খাঁকে তাঁহার শিবিকায় বহন করিয়া লইয়া যায়। মুসলমানেরা যাহাতে তাহাদের গুরুভার বোঝা মাটিতে ফেলিতে বাধ্য হয় এই জন্য মারাঠারা তাহাদের পায়ের দিকে এলোপাতাড়ি আঘাত করিতে থাকে। ইতি-মধ্যে শিবাজী ও তাঁহার একজন সঙ্গী বিখ্যাত অসি যোদ্ধা বান্দুর মস্তক

কাটিয়া ফেলেন। একে একে আফজল খাঁর অন্যান্য অনুচরদিগকে ও হত বা আহত করা হয়। হঠাৎ একজন মারাঠা আফজল খাঁর মস্তক কাটিয়া উহা বিজয় গর্ব্বে তুলিয়া ধরিল।

থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া শিবাজী শিঙ্গা বাজাইলেন। ইহার ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পথে দুরারোহ শিখরে ও কন্দরের অভ্যন্তরে ছড়াইয়া পড়িল। বনের সর্পিল পথে ও ঝোপের মধ্যে আনাচে কানাচে লুক্কায়িত মারাঠা সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ অস্ত্র ধারণ করিল। অদূরে উচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত প্রতাপগড় দুর্গ হইতে প্রকাণ্ড কামানের আওয়াজ ধ্বনিত হইল। ভেরী বাদ্যের জয় সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল আর জঙ্গলের ভিতর হইতে বল্লম হস্তে বাহির হইয়া মারাঠা সৈন্যগণ পাহাড়ের নীচে মুসলমাননের উপর তীব্র বেগে ঝাপাইয়া পড়িল।

বিজাপুরের সমর বাহিনীর প্রধান অংশ এ পর্য্যন্ত আফজল খাঁর দুর্ভাগ্যের কথা জানিতেই পারে নাই। অশ্বারোহী সৈন্যদের মধ্যে অনেকে ঘোড়া হইতে নামিয়া ছায়ায় বিশ্রাম লইতেছিল সিপাহীরা কামান হইতে দূরে সরিয়া ঝিমাইতেছিল। মারাঠাদের আকস্মিক আক্রমনে বিজাপুরের সৈন্যরা দিশাহারা হইয়া পড়িল। অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী গোলমালে লক্ষ্যহীন হইয়া এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িল। ভয়ে উটগুলি সৈন্যশ্রেনী ভেদ করিয়া ছুটিতে লাগিল। অনিশ্চিত ও আতঙ্কিত অবস্থায় যুদ্ধের হাতীগুলি বিকট শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় মারাঠারা ছুটিয়া আসিয়া উহাদের পায়ে ও শরীরে ক্ষত বিক্ষত করিয়া আঘাত করিতে লাগিল। হাতীগুলি খোড়াইতে খোড়াইতে ভয়ে জঙ্গলের মধ্যে পলাইয়া গেল। বিজাপুরের সৈন্যাধক্ষ্যদের এই বিপযয় রোধ করার সামর্থ্য ছিল না। অসম্ভব কোলাহল ও গোলমালে তাহাদের কণ্ঠস্বর একেবারে ডুবিয়া গেল। খরস্রোত গতিতে পলায়ন রত সমর বাহিনীর মধ্যে তাহারা চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। বিজাপুরের সমগ্র সৈন্য বাহিনী পাহাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিছুদিন পরে অনশন ক্লান্ত ও ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া তাহারা শিবাজীর দয়া ভিক্ষা করে।

যুদ্ধে জয়োল্লাসের উত্তেজনার মধ্যেও শিবাজীর আদেশ সকলেই

মানিয়া চলিল। যাহারা আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল তাহাদের সকলকেই অব্যাহতি দেওয়া হইল। নারী, পুরোহিত, শিবির পরিচারক এবং অসামরিক সকল ব্যক্তিকে নিরাপদে নিজ নিজ গৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। এমনকি বন্দীকৃত সৈন্যদিগকেও আটকাইয়া রাখা হইল না। উচ্চপদস্থ সেনাপতি ও সাধারণ সৈন্য সকলকেই শিবাজীর সম্মুখে হাজির করা হইলে তিনি তাহাদের দুর্দ্দশায় সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং তাহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ, খাদ্য ও যন্ত্রাদি দিয়া তাহাদের মুক্তির আদেশ দেন।

পরাজিত শত্রুর প্রতি দয়াশীল, শিবাজী স্বীয় বিজয়ী সৈন্যদিগকে অতিশয় উদারতার সহিত পুরস্কৃত করেন। জয়লব্ধ সামগ্রীর পরিমান এত বেশী ছিল যে তহার পক্ষে বদান্য হওয়া বেশ সহজ হইল। বিজাপুরের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা বারুদ প্রভৃতি সামরিক দ্রব্য সম্ভার, পরিবহণ পশ্বাদি, মালপত্র, লটবহর, ধনরত্ন সমস্তই শিবাজীর হস্তগত হয়। ইহার মধ্যে ছিল চারিহাজার অশ্ব, পয়ষট্টি হস্তী এবং বারশত উষ্ট্র। যুদ্ধে নিহত মারাঠাদিগের বিধবা পত্নীদের জন্য শিবাজী আজীবন বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, আহত সৈন্যগনকে দিলেন অনেক উপঢৌকন ও ধনদৌলত এবং যে সব সেনাপতি যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল, তাহাদের দেন হস্তী, মণি মানিক্য ও বহু সম্মানসূচক পোষাক।

এই সর্ব্বনাশা পরাজয়ের সংবাদ বিজাপুরে পৌঁছানো মাত্র সেখানে সকলেই ভীষণ ভয় ও মর্ম্মভেদী শোকে অভিভূত হইল। সমগ্র দরবার শোকাচ্ছন্ন হইয়া কিছুদিন কাজকর্ম বন্ধ রাখিল। রাজ-মাতা সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রাসাদের এক প্রকোষ্ঠে দরজা বন্ধ করিয়া রহিলেন। কেবল মক্কায় তীর্থযাত্রা করার প্রাক্কালে তিনি এই নিরালা ঘর হইতে বাহির হন।

তখন একসময় মনে হইত যে বিজাপুর নগরীও হয়তো মারাঠাদের পদদলিত হইবে। বাস্তবিক মুঘলদের আক্রমনের আশঙ্কায় বিজাপুরে যে রূপ আতঙ্কের সৃষ্টি হইত, এখনও ঠিক সেইরূপ অবস্থা প্রতীয়মান হইয়াছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সুশিক্ষিত সমরবাহিনীর অবরোধ যেখানে

সফল হইতে পারে নাই সেখানে যে শিবাজীর পাহাড়িয়া সৈন্যরা কৃতকার্য্য হইবে এরূপ কোন সম্ভাবনা ছিল না। একথাও স্বীকার্য যে যদিও বিজাপুর পরে আর কখনও শিবাজীর স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় নাই, তবে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিজস্ব সম্পদ ও অর্থরাশির প্রভাবেই বিজাপুর আরও বেশী অপমান হইতে অব্যাহতি পায়। যে সামরিক লোকবল ও গোলাবারুদ প্রভৃতি গত যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছিল বহু অর্থব্যয়ে উহা পুনরায় সুগঠিত করা হইল। বিভিন্ন শ্রেনীর বেতনভূক সৈন্য ভর্ত্তি করিয়া সিদিজোহর নামক এক হাবসী যোদ্ধার অধিনায়কত্বে নূতন সমর বাহিনী গঠিত হইল। অসম সাহসের উপর নির্ভর করিয়া শিবাজী যথেষ্ট সৈন্য না লইয়াই বিজাপুরের অভ্যন্তরে হানা দেন কিন্তু সিদিজোহরের (Sidi Johar) আকস্মিক প্রতি আক্রমনে তিনি পনহালা নামক স্থানে হটিয়া আসিতে বাধ্য হন। সেখানেও সিদিজোহর তাহাকে অবরোধ করে। আবার শিবাজী কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি আত্মসমপণের প্রস্তাব করেন—কিন্তু একদিন সময় চাহিলেন। এই অতি স্পষ্ট ছল চাতুরীপূর্ণ প্রস্তাবে যে মুসলমানেরা কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করিতে পারে ইহা প্রায় অবিশ্বাস্য। কিন্তু তাহারা শিবাজীর প্রস্তাবে রাজী হওয়ায় ইহা সহজেই বুজিতে পারা যায় যে তাহরা ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। আর, পরের দিন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে এই ধারনায় রাত্রি বেলায় এরূপক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী অবরোধকারী সৈন্যরা তাহাদের পাহারা কাজে একটু শিথিল হওয়ায়, শিবাজী সুযোগ বুঝিয়া ঐ শহর হইতে কতিপয় সঙ্গী সহ নিঃশব্দে পলায়ন করেন। বাহিরে আসামাত্র তিনি অতি দ্রুত অশ্ব চালাইয়া উত্তরদিকে রঙ্গনা নামক গিরি সঙ্কটে উপস্থিত হন। সেখানে মারাঠা সৈন্য মোতায়েন ছিল।

সিদিজোহর যদি এই সময় আরও জোরের সহিত পানহালার অবরোধ চালনা করিতেন তবে শিবাজীর অনুপস্থিতিতে এখানে মারাঠারা হয়তো তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু শিবাজীর চাতুরীপূর্ণ পলায়নে এই হাবসী সৈন্যাধক্ষ্য ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পানহালার অবরোধ বন্ধ করয়া দিলেন এবং রঙ্গনার দিকে শিবাজীর অনুসরণ করিতে

লাগিলেন। রঙ্গনায় মারাঠা সৈন্য সংখ্যা এত বেশী ছিলনা যে বিজয়-লাভের জন্য উহাদের সমগ্র বিজাপুর বাহিনীর আক্রমণ পরিচালনা করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ বাহির করা যাইত। কিন্তু শিবাজী ঐ স্থান হইতে বহু মাইল দূরে পশ্চাদপসরণ করিয়া প্রধান মারাঠা বাহিনীর সহিত মিলিত হইতে যাওয়ার সময় তিনি রঙ্গনায় অবস্থিত ফৌজের ভার দেন মোরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান বাজী প্রভুর উপর। শিবাজী তাঁহাকে বলেন যে তিনি নিরাপদ স্থানে পৌঁছিলে তোপের আওয়াজ হইবে। ঐ শব্দ না শোনা পর্য্যন্ত যেন বাজী প্রভু রঙ্গনার গিরি সঙ্কট কিছুতেই ছাড়িয়া না যান।

ঐ গিরিপথ রক্ষা করার জন্য বাজীর সঙ্গে মাত্র কয়েকশত পাহাড়িয়া সৈন্য ছিল। তিনি তাহাদের সাহায্যে গিরি সঙ্কটের মুখে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত পাথর জড় করিয়া ব্যূহ প্রস্তুত করাইলেন। এই ব্যূহের অভ্যন্তরে থাকিয়া তাঁহারা মুসলমানদের আক্রমনের অপেক্ষায় রহিলেন। সমস্তদিন গুরুভার অস্ত্র লইয়া বিজাপুর সেনানী পাহাড়ী সৈন্যদিগকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমন করিতে লাগিল, কিন্তু পাহাড়ীরা একের পর এক বেপরোয়া হইয়া ব্যূহ রক্ষা করিতে মৃত্যু বরণ করিতে লাগিল, তবুও শিবাজী তাহাদিগকে যে স্থান রক্ষা করিতে বলিয়াছেন তাহা হইতে এক পা-ও পিছাইল না। তাহাদের অধ্যক্ষ্য বাজী গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন, কিন্তু বেদনায় শায়িত অবস্থায়ও তিনি অনুচর দিগকে সর্ব্বদা উচৈচস্বরে উৎসাহিত করিতে লাগেন। সন্ধ্যারে দিকে যখন প্রতিরোধের শেষ আশা স্তিমিত হইয়া আসিল তখন তাহারা হঠাৎ শিবাজীর নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌছানোর সঙ্কেতসূচক তোপধ্বনি শুনিতে পাইল? মরণোন্মুখ অধ্যক্ষ্যকে একটা চারপায়ে তুলিয়া লইয়া মারাঠারা গিরি-সঙ্কট পরিত্যাগ করিয়া চলিল। পশ্চাদপসরণের সময় ক্লান্ত, শত্রুসৈন্যরা তাহাদিগকে উৎপীড়ন করে নাই।

রঙ্গনা গিরিপথের প্রতিরোধ পশ্চিম ভারতে রোমাঞ্চকর কাহিনীর পর্য্যায়ে পরিণত হইয়াছে। শিবাজীর নেতৃত্ব যে তাহার অনুচরগণের মধ্যে কিরূপ তেজস্বী মনোভাব উদ্দীপ্ত করিয়াছিল এই ঘটনা তাহারই একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। এতকাল মাথা নীচু করিয়া থাকিতে অভ্যস্ত এক

অনাদৃত ও অবহেলিত হিন্দু উপজাতি তাহাদের অপেক্ষা বহুরূপে শ্রেষ্ঠ সমর বাহিনীকে ঐতিহাসিক স্পারটানদের মত সমানতালে প্রতিরোধ করিল।

এই ঘটনার পরে যুদ্ধ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিল। বিজাপুর রাজ্য যে শিবাজীকে পরাভূত করিতে পারিবে না ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। মারাঠাদিগের পক্ষেও তখন বিজাপুর জয় করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বিজাপুরের শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং বিজাপুর তাহার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলে শিবাজীও সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইলেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আলোচনা আরম্ভ হয়। বিজাপুরের পক্ষ হইতে এই দৌত্যকাজে মনোনীত করা হয় শিবাজীর পিতা শাহজীকে।

শিবাজীর শৈশবকালে শাহজী পুত্রকে অবহেলা করিয়া তাহার প্রতি অপ্রীতিকর ব্যবহার করিতেন। সর্ব্বদা উৎপাতকারী এবং শূয়রের মত জেদী ও একগুঁয়ে পুত্র পরে দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহী হওয়ায় তাহার কার্য্যাবলীর জন্য পিতার কারাবাস হয়। সকল সমস্যা ও অসুবিধার মূল সেই পুত্র এখন বিজয়ী বীর, স্বাধীন নৃপতি ও সমগ্র দেশবাসীর আদর্শ নেতা।

পিতা এবং পুত্রের কূটনীতি সংক্রান্ত এই সাক্ষাতকার স্বভাবতঃই কৌতুহলোদ্দীপক। শিবাজীর বয়স ১৯ বৎসর অতিক্রম করার পরে তাহাদের পরস্পর দেখা হয় নাই। তিনি এখন বিশিষ্ট যোদ্ধা; তাঁহার মুখমণ্ডলে রেখাপাত হইয়া বেশ কঠোরতার লক্ষণ প্রকাশিত। জীজাবাঈ তাঁহাকে প্রথম যখন বিজাপুরে লইয়া আসেন তখন তিনি যেরূপ গেঁয়ো আচকান্ পরিয়াছিলেন তাহার পরিবর্ত্তে এখন তাহার অঙ্গে রাজকীয় বেশ।

অতীতে তাঁহার প্রতি শাহজী চরম ঔদাসীন্য দেখাইলেও শিবাজী বৃদ্ধ পিতাকে অপূর্ব্ব সমাদর ও শিষ্টাচারের সহিত অভ্যর্থনা করেন। বালক শিবাজী একদিন বিজাপুরের সুলতানকে অভিবাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে যদিও সুলতান অপেক্ষা লোকে

তাঁহাকে অধিকতর ভয় ও শ্রদ্ধা করিত তথাপি তিনি চিবুকের নীচে সবিনয়ে দুই হাত যুক্ত করিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সাষ্টাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন ও পিতার পদোপরি নিজ ললাট স্থাপন করেন। ভাবে অভিভূত শাহজীর দুই চোখ দিয়া অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল। পুত্রকে সাদরে তুলিয়া তিনি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গণ করিলেন।

পিতার জন্য শিবাজী রাজকীয় মর্য্যাদা অনুযায়ী এক সুসজ্জিত শিবিকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে নগ্নপদে শিবিকার পাশে চলিতে লাগিলেন। পিতাকে তিনি সুবৃহৎ ও কারুকার্য্যময় এক দরবারী শামিয়ানার ভিতর লইয়া যান। সেখানে বিরাট ভোজ সভার আয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি নিজে পিতার পাশে আহারে না বসিয়া বক্ষের উপর হাত জোড় করিয়া বিনম্র বদনে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহাকে পাশে বসিবার জন্য শাহজী পুনঃপুনঃ অনুরোধ করেন। শিবাজী উত্তরে বলেন "বিজাপুরের সুলতান যে আপনাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহতো আমারই জন্য। আপনি কি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন?" শাহজী পুনরায় অশ্রু বর্ষণ করেন এবং বলেন "পুত্র অতীতের অপ্রীতিকর ঘটনা ভুলিয়া যাও।" ইহার পরে পিতা-পুত্রে পুনর্মিলন হয় এবং উভয়ে একত্রে ভোজে উপবেশন করেন।

বিজাপুর রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ শাহজীকে রাষ্ট্রদূতের পূর্ণক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। শিবাজীর সমস্ত দাবি এক এক করিয়া পূরণ করা হইল। তাঁহার স্বাধীনতার দাবিও স্বীকৃত হয়। বোম্বাই হইতে গোয়া পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী সমস্ত এলাকায় ও তাহার অধিকৃত দুর্গসমূহের এবং ইন্দপুর (Indapur) পর্য্যন্ত সমগ্র দাক্ষিণাত্যের মালভূমির তাহাকেই অধীশর বলিয়া মানিয়া লওয়া হইল।

সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হওয়ার পরে শাহজী বিজাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুলতানের অধীনে নিজের পদ গ্রহণ করিলেন। পুত্রের সঙ্গে জীবনে তাঁহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। অল্পদিনের মধ্যে শিকারের মাঠে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

তৃতীয় খণ্ড

নায়ক

দশম অধ্যায়

বিজাপুর রাজ্যের সহিত সন্ধিস্থাপনের পূর্ব্বে শিবাজী ইংরাজদিগের সহিত পরিচিত হন। এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার দুই বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজেরা পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে বোম্বাই আয়ত্ত করেন। তখনও কিন্তু ইংরাজদের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল সুরাট। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে মুঘলসম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রদত্ত এক সনদে তাহারা ঐ স্থানে উপনিবেশ করার ও ব্যবসা বাণিজ্য করার অনুমতি পান। ১৬১৫ সালে স্যার টমাস রো (Thomas Roe) মুঘল দরবারে ইংল্যাণ্ডের রাজদূত হইয়া আসেন। তাঁহার সততা ও সাহস দেখিয়া সম্রাট অতিশয় মুগ্ধ হন এবং তাঁহার চরিত্রগুণে ইংরাজগণ এদেশে অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হন (১)। ইতিমধ্যে ইংরাজদের নৌচালনার কৌশল ভারত সমুদ্রের উপকুল অঞ্চলে যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল কিন্তু তখন ইংরাজেরা ছিলেন শুধু বণিক; তাঁহাদের অন্য কোনরূপ অহঙ্কার বা উচচ আকাঙ্খা ছিল না। কাজেই বিজাপুর সরকার আফজল খাঁয়ের পরাজয়ের সময় যে সব কামান প্রভৃতি হারাইয়াছিলেন ঐ গুলির প্রতিস্থাপনের জন্য তাহাদিগকে নূতন অস্ত্র সরবাহ করা রাজাপুরের

---

(১) সম্রাজ্ঞী নূরজাহান কিন্তু গুরুগম্ভীর ও অতিরিক্ত শুচিতা-প্রিয় এই বিদেশীকে অল্পবিস্তর উত্যক্ত না করিয়া ছাড়েন নাই। একটি ক্রীতদাসীকে শয্যায় পরিচর্য্যা করিবার জন্য তাঁহার নিকট পাঠান। স্যার টমাসের ভাগ্য ভাল যে এই রাশভারী মহিলার বয়স চল্লিশ হওয়ায় তাঁহার চারিত্রিক বিশুদ্ধতা কোনরূপে এ যাত্রায় রক্ষা পায়।

ইংরাজ কুঠিয়াল দিগের পক্ষে খুব সুবিবেচনার কাজ হয় নাই। হিসাবের খাতায় এবং মরিচ ও এলাচ বিক্রয়ের ফর্দ্দসমূহে দৃষ্টি রাখিতে অভ্যস্ত কতিপয় ইংরাজ কেরাণীর পক্ষে ঐ সব অস্ত্র শস্ত্র সমেত ইংরাজদের পতাকার নীচে বসিয়া শিবাজীর আকস্মিক রঙ্গনার দিকে পশ্চাদ্ধাবনের অনতিপূর্ব্বে পানহালায় তাঁহার শিবিরের দিকে গোলা ছুড়িয়া আমোদ উপভোগ করার অপচেষ্টাও তাঁহাদের পক্ষে আরও অবিবেচক কাজের পরিচায়ক।

শিবাজীর পক্ষে ইহার পর ইংরাজদের প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি হঠাৎ রাজাপুর আক্রমণ করিয়া ইংরাজ কুঠিয়ালদের ধরিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহাদিগকে তিন বৎসর কয়েদ রাখা হইল। বিজাপুরের সঙ্গে শিবাজীর যুদ্ধের সময় ইংরাজগণ নিরপেক্ষ নীতির অপব্যবহার করিয়াছেন, এই অভিযোগে শিবাজী তাঁহাদের নিকট হইতে খেসারত দাবি করিতে লাগিলেন; আর ইংরাজেরাও শিবাজী তাঁহাদের গুদামঘর ধ্বংস করিয়াছেন এই অনুযোগ করিয়া ক্ষতিপূরণ চাহিলেন।

চারিজন ইংবাজ বন্দীর প্রতি প্রথমদিকে ভাল ব্যবহারই করা হয়। কিন্তু অনভ্যস্ত বন্দী জীবনে অতিষ্ঠ হইয়া তাহারা পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা করে। সুরাটের ইংরাজকুঠির মন্ত্রনা সভা তীব্র ভাষায় "দুর্জয় বিদ্রোহী শিবাজীর" কাজের নিন্দা করিতে লাগিল এবং শিবাজীকে ঘায়েল করিবার মত তাহাদের উপযুক্ত অস্ত্রবল ও যথেষ্ট সময় না থাকায় আর্ত্তনাদ আরম্ভ করে। কিন্তু বন্দীরা অধৈর্য্য হইয়া তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি আরও অবহিত হওয়ার জন্য এবং তাহাদিগকে মুক্ত করার জন্য ইংরাজ কুঠিতে চিঠি দেওয়ায় সুরাটের মন্ত্রণাসভা দুর্দ্দশাগ্রস্থ বন্দী কুঠিয়ালদের (যাহাদিগকে এতদিন তাহারা "প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ" বলিয়া অভিহিত করিতেছিল) উপর চটিয়া কঠোর ভাষায় উত্তর দেয়। "তোমরা কেমনে কারাগারে নিবদ্ধ হইয়াছ ইহা তোমরা বেশ ভাল ভাবেই জান। ইংরাজ কোম্পানীর সম্পত্তি রক্ষার জন্য তোমারদের কয়েদ হয় নাই; তোমরা বন্দী হইয়াছ পানহালা গিরিপথে অবরোধ কাজে স্ফূর্ত্তি করিয়া সাহায্য করার জন্য। আমরা এখন কি করিব ?"

যাহা হউক বিজাপুরের সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করার পরে শিবাজী কোনরূপ খেসারত না লইয়া ইংরাজ বন্দীদের মুক্তি দেন। কিন্তু কোম্পানী ইহার পরেও পুনঃপুনঃ ক্ষতিপুরণের দাবি পেশ করিয়া থাকেন। ইংরাজদের প্রেরিত পরপর কয়েকজন দূতের প্রত্যেকের সঙ্গেই শিবাজী খুব ভদ্রভাবে ব্যবহার করেন। এমন কি, মিঃ নিকলস্ নামক একজন দূতকে তাহার পাশে সিংহাসনে বসাইয়া পর্য্যন্ত খাতির করেন। কিন্তু আসলে তিনি কতকগুলি বিরোধী প্রস্তাব উৎথাপন করা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করিলেন না। বৃথাই ইংরাজ কাউন্‌সিল শিবাজীর ধুর্ত্তামি, স্বার্থপরতা, এবং অনিশ্চিত ও অস্থির নীতির উল্লেখ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু শিবাজী তাহাদের দাবির এক কপার্দকও ক্ষতিপূরণ করিলেন না। এ বিষয়ে অবশ্য তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

শিবাজীর সঙ্গে ইংরাজ কোম্পানীর সাধারণ সরকারী কাজকর্ম্মে যথেষ্ট সৌজন্যের অভাব থাকা সত্ত্বেও, ইংরাজেরা ক্রমশঃ শিবাজীর ব্যক্তিগত গুণাবলিতে মুগ্ধ হন। আওরঙ্গজেব যখন মারাঠা শক্তি বিনষ্ট করিতে বদ্ধ পরিকর হন তখন রাজনীতিতে অভিজ্ঞ সমসাময়িক অনেকে মনে করেন যে এই শিশুরাষ্ট্র বেশী দিন টিকিবে না। কিন্তু বোম্বাইয়ের ইংরাজ কুঠির অধ্যক্ষ বিপরীত মত পোষণ করেন। শিবাজীর বিরুদ্ধে মুঘলদিগের জয় লাভের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। তিনি এক চিঠিতে লেখেন, "শিবাজী যে দ্বিতীয় সারটোরিয়াস (Sertorious) এবং যুদ্ধবিদ্যার কৌশল প্রয়োগে তিনি যে হ্যানিবলের (Hannibal) অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন ইহা সুবিদিত।" অল্পদিনের মধ্যেই মহাবীর শিবাজী সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া ইংরাজেরা "আমাদের পুরাতন এবং অতি প্রিয় বন্ধু শিবাজী'''—সানন্দে এইরূপ প্রশংসামান ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন।

রামপুরের চারিজন ইংরাজ কুঠিয়ালকে রায়গড়ে বন্দী করিয়া রাখা হয়। এই নগরটিকে ভবিষ্যতে তাঁহার রাজধানী করিবার জন্য শিবাজী তখন ওখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া উহা সুরক্ষিত করিতেছিলেন। ইহাই শিবাজীর বৃহত্তম দুর্গ। উহার বিশালতা আজিও পর্য্যটকের মনে গভীর

রেখাপাত করিয়া থাকে। শিবাজীর রাজসভায় দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত ডাঃ ফ্রায়ার (Fryer) তাহার ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দের অভিযানের বর্ণনায় বলেন "স্থাপত্য কৌশল অপেক্ষা প্রাকৃতিক পরিবেশ ইহাকে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন করিয়াছে। এই দুর্গে প্রবেশ করিবার ছায়াতরু-শোভিত প্রধান রাজপথ মাত্র একটি। ইহার দুই দিক সঙ্কীর্ণ গিরিপথে আবদ্ধ। বুরুজ সম্বলিত প্রকাণ্ড প্রাচীর দ্বারা ইহা সুরক্ষিত। পাহাড়ের উপরে রাজপ্রাসাদ, মন্ত্রীদিগের আবাস প্রভৃতি অনেকগুলি সুদৃঢ় অট্টালিকা অবস্থিত।" প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ডাঃ ফ্রায়ার দেখেন, "রাজা মনিমুক্তা খচিত জাঁকাল এক বৃহৎ সিংহাসনে উপবিষ্ট; বহুমূল্য পোশাকে সজ্জিত অমাত্য বর্গ, পদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও অন্যান্য লোকজন চারিদিকে পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান। ইংরাজদূতেরা দূর হইতে রাজাকে অভিবাদন করেন। তিনি (শিবাজী) তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সিংহাসনের পাদপীঠের নিকট আসিতে আদেশ করেন। সেখানে তাহাদের পদমর্য্যাদার নিদর্শন স্বীকৃত হওয়ার পরে তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে বলা হয়। কিন্তু এত শীঘ্র বিদায় না লইয়া তাহারা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সিংহাসনের দুই পাশে স্বর্ণমণ্ডিত মস্তক বিশিষ্ট দুইটি দোলায়মান বল্লম, অন্যান্য রাজ্যের নানা প্রকারের প্রতীক, সিংহাসনের দক্ষিণ দিকে বৃহৎদন্ত বিকশিত ও স্বর্ণ নির্ম্মিত মস্তক সহ দুইটি প্রকাণ্ড মৎস্য, এবং বামদিকে কয়েকটি অশ্বের লাঙ্গুল, অতি উচ্চ একটি বল্লমের মাথায় বিচারের সমতা রক্ষার প্রতীকরূপে এক জোড়া সোনার মানদণ্ড—প্রভৃতি অনেক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইল। ফিরিবার পথে তাঁহারা প্রাসাদের সিংহদ্বারে দুইটি অনতিবৃহৎ হস্তী, ও বহুমূল্য আভরণে সজ্জিত ও লাগাম সম্বলিত দুইটি অশ্ব দেখিতে পাইল। প্রাসাদের মহার্ঘ্য আসবাব ও গৃহসজ্জার দ্রব্যাদি দেখিয়া তাহারা ভাবিয়া অবাক হইল যে কি করিয়া এত সঙ্কীর্ণ ও বন্ধুর পথ দিয়া এই সব জিনিষ পাহাড়ের উপরে আনা হইল।"

উপরোক্ত জাকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনার বিবরণ শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে শিবাজী রাজকীয় সম্পদ ও আড়ম্বরের জন্য খুব লালায়িত

ছিলেন। বাস্তবিক বিলাসীতার যাবতীয় সামগ্রী ব্যবহৃত হইত কেবলমাত্র বিদেশী ও ভিন্ন রাষ্ট্র হইতে আগত অতিথিদিগের জন্য। সাধারণতঃ প্রাচ্যদেশের প্রচলিত জাঁকজমকের সম্পূর্ণ বিপরীত সাদা সিধা আচরণ ছিল শিবাজীর দরবারের বৈশিষ্ট। ঐতিহাসিক ওর্ম্ম শিবাজীর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ শুনিয়া খুবই আশ্চয্যান্বিত হইয়াছিলেন :—

"তিনি এত সাদাসিধা জীবনযাপন করিতেন যে অনেকে হয়তো তাঁহাকে কৃপণ বলিয়া ভুল করিত। তাহার আচরণ ছিল একেবারে ঔদ্ধত্য ও আড়ম্বর বিহীন। রাজা হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও প্রজাদিগের উপকারের জন্য অতিশয় ব্যগ্র। .... আভ্যন্তরীন শাসন কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যাপারেও ঠিক একই রকমের মিতব্যয়িতা লক্ষিত হইত। নিজে বাহ্যিক জাঁকজমক ও বিলাসীতার মোহের বহু উর্দ্ধে ছিলেন বলিয়া তাহার অমাত্যদের মধ্যেও কেহ যোগ্যতার সহিত কাজ করিবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত কিছু আকাঙ্খা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। ইতিহাস বর্ণিত কোন্ লোকই ব্যক্তিগত কর্ম্মতৎপরতায় তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। অবিচলিত সাহস ও অটল সহিষ্ণুতার সহিত ত্বরিৎগতিতে যে কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাহার প্রতিষ্ঠিত জাতির পিতা বা অভিভাবকরূপে সর্ব্বজন-সম্মানিত মহারাজ শিবাজী তাহাদের সহিত সন্দেহ বিহীন নিরাপত্তার অনেক সময়ে একা বিচরণ করিতেন।" (১)

(১) "তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন;
পালিবে যে রাজধর্ম্ম জেনো তাহা মোর কর্ম্ম
রাজ্যলয়ে রবে রাজ্যহীন।
বৎস, তবে এইলহ মোর আশীর্ব্বাদ সহ
আমার গেরুয়া গাত্রাবাস;
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিও"
কহিলেন গুরুরামদাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'প্রতিনিধি' কবিতা, "কথা ও কাহিনী", পৃ ১৯

শিবাজী রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা সৈন্যগণের মধ্যে বিচরণ করিতে অধিক-তর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেন। সুশিক্ষিত ও মার্জিতরুচি ডাঃ ফ্রায়ার তাঁহার সম্বন্ধে বলেন— "এই অমার্জিত সৈন্যাধ্যক্ষকে সিথিয়ান (Scythian) অ্যাটিয়াস (Ateas)এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রবাদ এই যে এক বংশীবাদকের অতি মধুর সুরধ্বনি শুনিয়া অ্যাটিয়াস্ হলপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে ইহা অপেক্ষা তিনি অশ্বের হ্রেষাধ্বনি ও ঢং ঢং শব্দ বা যুদ্ধের ভেরীবাদ্য বেশী পছন্দ করেন। স্থুলবুদ্ধি ব্যবহার অথচ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিরোধী এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে শিবাজীর স্থান নির্দ্দিষ্ট করার সময় সৈনিক ফ্রায়ার শিবাজীর ধর্ম্মের প্রতি গভীর অনুরাগ ও তাঁহার কাব্যপ্রীতির কোন মর্যাদা না দিয়া নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। তুকারামের পদ্যরচনার প্রতি শিবাজীর আন্তরিক অনুরাগ ছিল। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার এরূপ গভীর ও অপরিসীম উৎসাহ ছিল যে মাঝে মাঝে তাঁহার সংসার ছাড়িয়া তপস্বীবেশে বেশে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করিত। এ সব কথা বিদেশীদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। তাহারা শুধু শিবাজীর কৃশ দেহ, বটিতে অশি তরোয়াল, শ্যেন দৃষ্টি, সুবিস্তীর্ণ নেত্রদ্বয় ও কথা বলিবার সময় সুমিষ্ট হাসি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য গুলিই আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইত।

আনুষ্ঠানিক সমারোহ উপলক্ষ্যে শিবাজীর জাঁকজমকপূর্ণ দরবারের সহিত তুলনায় মারাঠা সমর বাহিনীর দুরবস্থা সহজেই লক্ষ্যণীয় হইত। ফ্রায়ার মোটামুটি সৈন্যবাহিনীর সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলেন যে ইহারা ছিল অনসনক্লিষ্ট, পাজি, বদমায়েস শ্রেণীর লোক। ইহারা কঠোর পরিশ্রম করিতে ও দ্রুত চলিতে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু ইহারা আমোদ প্রমোদের আনন্দ উপভোগ করিতে জানিত না। আসলে ইহাদিগকে পুরাকালের অর্দ্ধনগ্ন ও হিংস্র বৃটনদের মত দেখাইত। কিন্তু উক্ত সমালোচকই আবার মুসলমান সৈন্যদিগের তুলনায় কোন কোন বিষয়ে ইহাদের শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মেজাজ অপেক্ষাকৃত রুক্ষ হইলেও ইহারা ছিল অধিকতর পরিশ্রমী ও গান বাজনার অভিরুচি বিলাসীতা প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তিগুলির প্রতি অনেকটা অনাসক্ত। মুঘলবাহিনীর তুলনায়

ইহাদিগকে অনেক কঠোরতর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে চলিতে হইত। নিয়মের অবাধ্যতার জন্য অনেক সময় তাহাদিগকে মৃত্যু দণ্ডও দেওয়া হইত। সৈন্য শিবিরে কোন স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার ছিল না, এবং যুদ্ধের অভিযানের সময় কোন সৈনিকের পত্নী বা রক্ষিতার সমরবাহিনীর অনুগমন করিবার অনুমতি ছিল না। এই সুরুচি-সম্পন্ন নীতি তখন এশিয়া মহাদেশে এবং এমনকি ইউরোপেও (নূতন প্রণালীতে গঠিত সমর বাহিনী ব্যতীত) সামরিক আইনের বহির্ভুত ছিল। এই নিয়মে শিবাজীর সমর বাহিনী এমন একটা সবল গতিতে চলাফেরা করিতে পারিত যাহা সমসাময়িক ভারতবর্ষের যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসে অন্যত্র মোটেই লক্ষ্যণীয় ছিল না।

অভিযানের সময় মারাঠা সমরবাহিনীর গতিবিধির পরিচয় পাওয়ার জন্য সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধানী ক্যাপটেন ব্রাউটনের (গ্রীক আনন্দ-দেবতা কোমাসের প্রতি অনুরাগী মারাঠাদের সম্বন্ধে ইহার সমালোচনা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে) বিবরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। (১) কুচ-কাওয়াজ করিয়া সমরবাহিনীর অভিযানে চলিবার দিন অতি প্রত্যূষে সরবরাহ বিভাগের অধ্যক্ষ সকলের পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়া সৈন্যদলের ছাউনি ফেলিবার স্থানে পৌঁছিয়া প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের শিবিরের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি ক্ষুদ্র শ্বেত পতাকা প্রোথিত করেন। এই শিবির গুলিকে সমবেত ভাবে দীয়োরী (Deeoree) বলা হইত। তারপর বিভিন্ন বিভাগের মালপত্র পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান সমূহে সারিসারি পতাকা প্রোথিত হয়। সৈন্যদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দোকানগুলি রাস্তার দুই দিকে সাজান হয়। এইরূপে সম্মুখ ভাগ হইতে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যক্ষগণ প্রধান রাস্তার দক্ষিণে এবং বামে শিবির স্থাপন করেন। প্রত্যেক তাঁবুর সম্মুখে আগুন জ্বালান হয়। ইহার ধোঁয়া সমস্ত ছাউনিতে ছড়াইয়া পড়ে এবং আবহাওয়া ঈষৎ গরম করিয়া

---

(১) ইনি শিবাজীর মৃত্যুর শতাধিক বৎসর পরে এই কাহিনী লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বিষয় বস্তুর বৈশিষ্ট্য তখনও প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল।

গবাদি পশুদিগকে কীটপতঙ্গের অত্যাচার হইতে রক্ষা করে। কিন্তু এই আবহাওয়ার সঙ্গে যাহারা সম্যক পরিচিত নহে তাহাদের পক্ষে এখানে চোখ মেলিয়া তাকান কষ্টকর হইত।"

উক্ত সূক্ষ্ম সমালোচক যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মারাঠা সমর—শিবিরের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু শিবাজীর অভিযান সমূহ অধিক ক্ষেত্রেই কেবল অশ্বারোহী সন্য দ্বারা চালিত হইত। উন্মুক্ত আকাশের নীচে তাহাদের রাত্রিবাসের রীতি ছিল অন্য রকমের। মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যের গুণাবলির মধ্যে তীব্রগতির উপর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইত। ছদ্মনামা এক ইংরাজ গ্রন্থকার ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে তিনি ৫০।৬০ জন মারাঠা সৈন্য একসঙ্গে দিনের পর দিন দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে দৈনিক ৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে দেখিয়াছেন। (১) তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে সাধারণতঃ ঘোড়াগুলি দেখিতে বিশেষ সুন্দর ছিল না। তবে কৃশ হইলেও উহাদের হাড় ছিল খুব শক্ত। অশ্বারোহীরা গায়ে তুলার জামা ছাড়া অন্য কোনরূপ প্রতিরক্ষামূলক বর্ম পরিধান করিত না তাহাদের সমস্ত মালপত্র জিনের পাশে আবদ্ধ থলিতে রাখিয়া দিত। পূর্ব্বাহ্ণে সেঁকা কয়েকখানা পিষ্টক, কিছু ছাতু ও নুন—এই ছিল তাহাদের খাদ্য। ঘোড়াগুলিকে রসুন, গরমমশলা ইত্যাদি মিশান মটর কলাইয়ের দলা করিয়া সাধারণতঃ খাইতে দেওয়া হইত। ক্লান্তিজনিত অবসাদের পর ঘোড়াগুলিকে পুনরায় বলীয়ান করিবার জন্য এক প্রকার শরবত মিশ্রিত এই মটরের দলাগুলি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত।" পদাতিক সৈন্যদের তুলনায় অশ্বারোহীরা খুবই কম তাবু ব্যবহার করিত। এমনকি সৈন্যাধ্যক্ষরা পর্য্যন্ত সামান্য একটি গালিচা ভিন্ন বসিবার বা শয়ন করার জন্য অন্য কোন আসবাব ব্যবহার করিত না। সেনাপতির সমস্ত লট বহর উটের

---

(১) *Present State of the Native Power of Hindustan* নামক গ্রন্থের লেখক।

এখানে বলা প্রয়োজন যে শিবাজীর রাজত্বকালে মারাঠা সমর শক্তি খুব কম সময়ই ত্রিশ হাজারের সীমা ছাড়াইয়া যাইত।

পিঠে এক হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হইত। অশ্বারোহী সৈনিকেরা প্রথম ঘোড়াকে আহার্য্য দিয়া পরে নিজ নিজ পরিমিত আহার গ্রহণ করিত। আহার সম্পন্ন হইলে সন্তুষ্ট চিত্তে ঘোড়ার পাশে শয়ন করিত। 'নাগা' অথবা বিশাল ভেরীর শব্দ শোনা মাত্র তাহারা তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়িতে প্রস্তুত হইত।" এই ভেরীগুলি হইতে প্রদোষে গুরুগম্ভীর গর্জন ধ্বনিত হওয়া মাত্র পাতলা কুয়াসার মধ্যে সমস্ত শিবিরে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইত। তারপব কাঠের আগুনের চারিপাশে বসিয়া সৈন্যগণ তাহাদের সামান্য প্রাতরাশ গ্রহণ করিত। অল্পক্ষণের মধ্যেই সমগ্র শিবির গুটাইয়া সৈন্যরা অদৃশ্য হইয়া যাইত। ঐ স্থানে শিবিরের চিহ্ন মাত্র থাকিত না।

অশ্বের প্রতি মারাঠাদের গভীর অনুরাগ ও উহাদিগকে কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইত—এ বিষয়েও ঐ ছদ্মনামা ইংরাজ লেখক উল্লেখ করিয়াছেন। "সতত তাহারা বাহকের সঙ্গী হওযায় ও বাহকেরা তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করায় ও তাহাদের উদ্দেশে কথা বলায় তাহাদের মধ্যে অন্যান্য গৃহপালিত জন্তুর মত বেশ বুদ্ধি ও বাধ্য-প্রবণতার উন্মেষ হইত। দ্রুততম বেগে ধাবমান অবস্থায় ও কি প্রকারে হঠাৎ থামিয়া দণ্ডাকৃতি পিছনের পদযুগলের উপর ভর করিয়া পশ্চাতে তাকান যায় ইহাও তাহাদিগকে শিখান হইত।"

অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে স্থায়ী পেশাদার বেতনভুক ও অস্থায়ী এই দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছিল। স্থায়ী সৈন্যগণের প্রত্যেককে একটি করিয়া ঘোড়া দেওয়া হইত। তাহাদের মাসিক বেতন ছিল বার টাকা কিন্তু অশ্বারোহী প্রধান সেনাধ্যক্ষ পাইতেন প্রায় আটশত টাকা। অস্থায়ী সৈন্যদের বেতন ছিল অপেক্ষাকৃত কম। তাহাদিগকে নিজ নিজ ঘোড়া সংগ্রহ করিতে হইত। তাহাদর আহার্য্য এবং পোশাকের বরাদ্দ পাশ্চাত্যদেশের ও সমসাময়িক মুঘল শাসনে প্রচলিত মাপকাঠিতে অত্যল্পই বলিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে শিবাজী দিনে একবার মাত্র আহার করিতেন।

পদাতিক সৈন্যদের মাসিক কোন বেতন ছিল না। তাহাদিগকে টাকার বদলে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দেওয়া হইত। ইহাই ছিল এই

শ্রেণীর সাধারণ সৈন্যদের বেতন দেওয়ার রীতি। তবে পাহাড়িয়াদের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া নিযুক্ত শিবাজীর দুই হাজার দেহরক্ষী সৈন্যদের উত্তম বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তাহাদের পোশাকেও ছিল বেশ ফিটফাট ধরণের।

শিবাজীর সমর বাহিনীতে সামন্ততান্ত্রিক শুল্ক আদায় করার বা অস্থায়ী সৈন্য নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল না। সামরিক কাজ একটা দুর্লভ সুযোগ বলিয়া মনে করা হইত এবং সৈনিক বৃত্তি গ্রহণেচ্ছুক যুবকদের স্বীয় যোগ্যতা প্রমাণ করিতে হইত। সৈন্যদলে ভর্ত্তি হওয়ার সময় শিবাজীব সহিত ব্যক্তিগত সাক্ষাত বাধ্যতামূলক ছিল। শিবাজীর সমর বাহিনীভূক্ত দুইজন সৈন্যকে নবাগত সৈনিকের জামিন থাকিতে হইত।

শিবাজীর রাজত্বকালে মারাঠা সমব বাহিনীব দুর্বলতন অংশ ছিল গোলন্দাজ সেনা বিভাগ। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রাগেব মধ্যে ভারতে নির্ম্মিত দুই চারিটি লঘুভার কামানও ছিল; কিন্তু সেগুলির নির্ম্মাণ পদ্ধতি ছিল অতি প্রাচীন এবং এলোমেলো ধরণেব। জনৈক ওলন্দাজ পর্য্যটকের মতে লোহার আংটা দিয়া আবদ্ধ দীর্ঘ ও প্রশস্ত কতিপয় লৌহখণ্ড দ্বারা উহা নির্ম্মিত হইত।

কামান সরবরাহের জন্য শিবাজী প্রধানতঃ পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজদিগের উপব নির্ভরশীল ছিলেন। ইংরাজেরা প্রথম দিকে জোর গলায় ঘোষণা করিতেন যে তাহাদের পক্ষে শিবাজীর নিকট কোন কামান বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না, কারণ ইহাতে তাঁহারা নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করার দোষে অভিযুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু পর্ত্তুগীজ ও ফরাসীদিগের এরূপ কোন সঙ্কোচ তো ছিলই না বরং তাহারা মারাঠাদেব সহিত এই সব দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মুনাফা পাইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র ছিলেন। দেখা-দেখি ইংরাজেরাও শিবাজীর নিকট তাঁহার প্রয়োজনীয় কামান প্রভৃতি সরবরাহ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক ১৬৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজদের সুরাট কুঠির দপ্তরে মারাঠাদের নিকট কামান বিক্রয় সম্বন্ধীয় অনেক দলিলপত্র পাওয়া গিয়াছে। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে লিখিত এক দলিলে দেখা যায় যে কামান দাগার কাজে সুশিক্ষিত গোলন্দাজ কারীগর অনেক সময় কামানের সঙ্গে প্রেরিত হইত। বোম্বাইয়ের ইংরাজ কুঠিয়ালেরা লিখিয়াছিলেন

যে "একজন এঞ্জিনিয়ার এবং কামান চালাইতে দক্ষ দুই একজন লোককে গোপনে শিবাজীর নিকট পাঠান যাইতে পারে। কিন্তু ইংরাজগণ এই প্রকার কাজ করিতে প্রায়ই বিবেকের দংশন অনুভব করিতেন। একবার ইংরাজদের প্রতিশ্রুত কামান প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় শিবাজী কুঠির প্রধানের নিকট অতিশয় বিনয় ও কিছু উপঢৌকন সহ একখানা অদ্ভুত রকমের চিঠি লিখিতে বাধ্য হন। যাহা হউক একথা সত্য যে মূল্যের তুলনায় এই কামানগুলি ছিল অনেক নিকৃষ্ট। সরল প্রকৃতি মারাঠাদের নিকট বিক্রীত এই কামানগুলির দোষত্রুটি লিপিবদ্ধ করিতে ইংরাজ কুঠিয়ালেরা বেশ আমোদ উপভোগ করিত। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত কামান সম্বন্ধে তাহারা লিখিয়াছিল যে "এইগুলির ভিতরের অবস্থা খুবই খারাপ, তবে কিছুকাল ইহা দ্বারা কাজ চলিতে পারে।" ১৬৭২ সালে বিক্রীত কামানগুলি ছিল, "পুরাতন, ত্রুটিপূর্ণ এবং উহাদের মধ্যে কতকগুলি মৌচাকের ন্যায় ছিদ্রবহুল"। অনেক সময়, আবার ইংরাজেরা শিবাজীর নিকট কামান এবং এমন কি জাহাজ বিক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া উহা হস্তান্তর করিবার নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই পিছাইয়া যাইতেন। "কোনওরূপে চুক্তিপত্রের মধ্যে ত্রুটি বাহির করিয়া একটা না একটা অজুহাত দেখাইয়া" তাহারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেন।

পরপর দুর্গশ্রেণী প্রস্তুত করিয়া নূতন রাষ্ট্রের সামরিক সংগঠন পূর্ণাঙ্গ করা হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি শিবাজীর অধিকৃত এবং বিজাপুরের কর্ত্তৃপক্ষের তৈয়ারী। শিবাজী ঐ দুর্গগুলি সংস্কার করিয়া অধিকতর শক্তিশালী করেন। আর অন্যগুলি শিবাজী নিজেই তাঁহার রাজ্যের মধ্যে উপযুক্ত সামরিক কেন্দ্র সমূহে নির্ম্মিত করেন। প্রত্যেকটি দুর্গের তত্ত্বাবধান করিত মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষের পরিচালনায় পাহাড়িয়া সৈন্যরা। দুর্গের ইঞ্জিনিয়ার সাধারণতঃ নিযুক্ত হইত মারাঠা প্রভু জাতীয় সম্প্রদায় হইতে। অসামরিক কাজের ভার ছিল ব্রাহ্মণ অমাত্যদের উপর।(১)

(১) বিভিন্নজাতি হইতে সংগৃহীত কর্ম্মচারীদের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা লাঘব করিবার জন্য এইরূপ নিয়োগ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

প্রত্যেক দুর্গের বাহিরের গ্রামসমূহে নীম্নশ্রেণীর উপজাতীয় লোকেদের উপনিবেশ স্থাপন করা হয়। বহিরাক্রমণের সম্ভাবনা হইলেই তাহারা পূর্ব্বহ্নে অমঙ্গলের আশঙ্কার সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জ্ঞাপন করিত।

শিবাজীর নির্ম্মিত যাবতীয় দুর্গের মধ্যে তাঁহার রাজধানী রায়গড় দুর্গনগরীকে সুরক্ষিত করিতেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এই দুর্গটিকে সম্পূর্ণরূপে অভেদ্য-করা। কিন্তু ইহার সুরক্ষণের সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হইয়াছে এবং কোন মনুষ্যই ইহার একমাত্র সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথে ব্যতীত নগরীর অভ্যন্তরে ঢুকিতে বা ইহা হইতে বহির্গত হইতে পারিবে না, এইরূপ মনে করিয়া তিনি যখন বেশ আত্মতৃপ্তি ও গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁহার এই মনোভাব যে নিতান্ত অসাময়িক তাহা একটি চাষী স্ত্রীলোকের কাজে প্রমাণিত হইল। এই রমনীর নাম ছিল হীরাকানী। সে প্রতিদিন সৈন্যদিগের নিকট দুগ্ধ বিক্রয় করিতে রায়গড় দুর্গে আসিত। উচ্চ প্রাচীরের নীচে একটি গ্রামে সে বাস করিত। রাত্রি হওয়ার পূর্ব্বেই সে প্রতিদিন গৃহে ফিরিয়া যাইত। কিন্তু একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে বাড়ী ফিরিতে গড়িমসি করায় দুর্গের দ্বার বন্ধ করার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। দুর্গদ্বারে আসিয়া সে দেখে যে দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার অনুনয় বিনয় সত্বেও প্রহরীরা তাহাকে বাহিরে যাইতে দিল না। গৃহে ছিল তাহার শিশুপুত্র। শিশুটিকে সারারাত্রি একাকী ও অনাহারে থাকিতে হইবে এই আশঙ্কায় রমণী এক অসম সাহসের কাজে প্রবৃত্ত হইল। শিবাজীর অভিজ্ঞ চক্ষু যে প্রাচীর গাত্র অলঙ্ঘনীয় মনে করিয়াছিল অন্ধকারের মধ্যে সেই খাড়া প্রাচীরের দেওয়ালের গায়ে ভর করিয়া সে ধীরে ধীরে নামিয়া আসে ও নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী পৌছায়। এই অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া শিবাজী ঐ রমণীকে তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে আহ্বান করেন ও তাহাকে যথোচিত পুরস্কৃত করেন। তারপর তিনি দুর্গের ঐ ব্যূহ অধিকতর সুরক্ষিত করার জন্য ঐ স্থানে অতিউচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ গোয়ালিনী রমনীর সাহসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তিনি উহার নাম

দেন হীরাকানী অট্যালিকা। আজিও উহার ধ্বংসাবশেষ ঐ রমণীর নাম বহন করিতেছে।

একাদশ অধ্যায়

বিজাপুরের দিকে অগ্রসর হইবার সময় শিবাজী যে তাঁহার সৈন্যদিগকে পশ্চাত হইতে আক্রমণ করিয়াছিলেন একথা আওরঙ্গজেব কখনও ভুলিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে অবিসম্বাদী সম্রাট ও মুঘল সাম্রাজ্যের অফুরন্ত সম্পদের অধীশ্বররূপে তিনি এই 'কুত্তার বাচচাকে' সমুচিত শিক্ষা দিতে মনস্থ করেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার মাতুল ও সাম্রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান ওমরাহ শায়েস্তা খাঁকে এক লক্ষ অশ্বারোহী, একদল পাঠান সৈন্য এবং এক বৃহৎ গোলন্দাজ বাহিনী সহ দক্ষিণাভিমুখে পাঠাইলেন। কাজেই বিজাপুরের সহিত সন্ধিপত্র সাক্ষর করিতে না করিতেই শিবাজীকে বাধ্য হইয়া বিজাপুর সুলতানের অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের সহিত দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষদিকের (ফাল্গুন মাসে) মুঘল সমর বাহিনী শিবাজীর অধিকৃত এলাকায় প্রবেশ করে। এই সময়ে মারাঠা সৈন্যদের সংখ্যা সম্ভবতঃ দশ সহস্রের অধিক ছিল না। কাজেই মুঘলদের সহিত সমতল ভূমিতে কোন নির্দ্দিষ্ট রণক্ষেত্রে সুচিন্তিত ভাবে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ করার কল্পনা তাহাদের মনে উদিত হয় নাই। শিবাজী পর্ব্বত শ্রেণীর দিকে সরিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অস্থায়ী শিলাদার অশ্বারোহী সৈন্যরা মুঘলবাহিনীর পাশে পাশে অনুধাবন করিতে থাকে ও সুবিধা পাইলেই দলভ্রষ্ট সৈন্যগণকে নিধন ও সামরিক মালপত্র লুঠ করে। মুঘল ও মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যদের মধ্যে মাঝে মাঝে খণ্ড যুদ্ধ হয়। এই সব যুদ্ধে সাধারণতঃ মুঘলেরাই জয়লাভ করে। মুঘল সমরবাহিনীর গতি কোনরূপ তীব্র বাধা না পাইয়া অগ্রসর হইতে থাকে, অগ্রগতির পথে একমাত্র অন্তরায় ইহাদের সংখ্যার বিশালতা। মে মাসে পুণা আক্রমণ করার সম্ভাবনা দেখা যায়। প্রথম জীবনে শিবাজী

এই স্থানের জীর্ণ জনশূন্য রূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। দাদাজীর সযত্ন পরিচালনায় এখানে পরে বিশেষ বিশেষ সমৃদ্ধিপন্ন নগরী গড়িয়া উঠে। আজ আসন্ন মুঘল আক্রমণের সম্ভাবনায় শিবাজী তাঁহার বাল্য ও কৈশোরের লীলাভূমি পুণা নগরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

অতঃপর শায়েস্তা খাঁ জয়োল্লাসে পুণা নগরীতে প্রবেশ করেন। তিনি মনে করিলেন যে তাহার অভিযানের প্রথম পর্য্যায় সমাপ্ত হইল। মারাঠা-দিগকে তিনি পাহাড়ের অভ্যন্তরে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছেন এবং বর্ষার পরেই তিনি তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সমূলে বিনষ্ট করিবেন। ঐ বৎসর বর্ষা অপেক্ষাকৃত সত্বর শুরু হয় এবং ইহাতে সামরিক গতিবিধি ব্যাহত হইয়া যায়। পুণায় শায়েস্তা খাঁ তাহার বাসের জন্য রংমহল বা চিত্রাঙ্কিত প্রাসাদটি মনোনীত করেন। শিবাজী ও তাঁহার মাতা বিজাপুর হইতে পুণায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দাদাজী তাহাদের জন্য এই সুরম্য অট্যালিকা নির্ম্মান করেন। এইখানে অতিকষ্টে স্বীয় অসহীষ্ণুতা সংযত করিয়া শায়েস্তা খাঁ সময় কাটাইতে লাগিলেন। প্রশস্ত গবাক্ষের মধ্য দিয়া তিনি বাহিরে টালির ও খড়ের ছাতের উপর অবিশ্রাম বারিপাতের দৃশ্য দেখিতেন। প্রাসাদের তৃণমণ্ডিত প্রাচীরের গায়ে তীক্ষ্ণধারায় বৃষ্টিপাত ও রাজপথের কর্দ্দমাক্ত অবস্থাও তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

শায়েস্তা খাঁর পদমর্য্যাদার জ্ঞান তাঁহার অস্থির মনোভাবের নিকট পরাভূত হয়। তিনি শিবাজীর ক্রোধ উদ্রেক করিয়া তাঁহাকে পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে বাহির করিয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করেন। পারসী ভাষায় লিখিত একটি শ্লোকে শিবাজীর প্রতি বানরের ন্যায় কাপুরুষতা আরোপ করিয়া এবং গোপন স্থান হইতে বাহির হইয়া অসিয়া মনুষ্যোচিত সাহসের সহিত শিবাজী তাঁহার সহিত যুদ্ধ করুন—এই মর্ম্মে শায়েস্তা খাঁ শিবাজীকে এক পত্র লেখেন। এই চিঠির জবাবে শিবাজী পাল্টা এক শ্লোক লিখিয়া তাঁহার যে বানরসুলভ কিছু কিছু গুণ আছে তাহা স্বীকার করেন এবং শায়েস্তাকে স্মরণ করাইয়া দেন যে হিন্দুদের কাব্যগ্রন্থে বানর গণ কর্ত্তৃক রাক্ষসদিগের রাজার নিধনের কাহিনী বিবৃত আছে। বলাবাহুল্য যে এই উত্তরে শায়েস্তার ক্রুদ্ধ মেজাজের উপশম

হইল না। তবে শিবাজীকে পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া আসিতে আমন্ত্রণ করার জন্য তাহাকে শীঘ্রই অনুতপ্ত হইতে হয়।

পুণার একটি মন্দিরে এজন প্রসিদ্ধ চারণ গায়ক তুকারামের কবিতা আবৃত্তি করিবেন বলিয়া ঘোষণা হয়। শিবাজীর নিকটও এই সংবাদ পৌঁছায়। প্রায় অবিশ্রান্ত ভাবে অপরিহার্য্যে যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও শিবাজী কখনও ঐ সুগায়কের সহিত তাঁহার সাক্ষাতকারের কথা বিস্মৃত হন নাই। যে সঙ্গীত একদা তাহার হৃদয় এমন গভীর ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল উহার সুচারু আবৃত্তি শুনিতে আকাঙ্খা হইল। তাঁহার অমাত্যগণকে কিছু না বলিয়া তিনি শিবির ত্যাগ করিয়া দিনেব শেষে গোধূলির সময় সমতল ভূমিতে উপস্থিত হইলেন।

পুনানগরীর প্রবেশ পথগুলির পাহারার খুব জোর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; কারণ শায়েস্তা খাঁ প্রকাশ্যে শিবাজীর প্রতি যতই অবজ্ঞার ভাব দেখান না কেন শত্রুকে ফাঁকি দেওয়ার শিবাজীর অদ্ভূত কৌশল ও ক্ষমতার কাহিনী তিনি এত শুনিয়াছিলেন যে মারাঠা দিগের আকস্মিক আক্রমন প্রতিরোধ করার জন্য সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা তিনি খুবই সমীচীন মনে করেন। শিবাজী প্রহরীদিগের দৃষ্টি এড়াইয়া কয়েক ঘণ্টা পরে শহরে উপনীত হইলেন। যে মন্দিরে কথকতা ও ভজন হওয়ার কথা ছিল সেখানে পৌছিয়া মন্দিরের অঙ্গনে ভিড়ের মধ্যে বসিয়া পড়েন। পাগড়ি জড়ান থাকায় রাত্রির অন্ধকারে শিবাজীকে তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী লোকদের মধ্য হইতে পৃথক করা গেল না। কিন্তু বাজারের মধ্য দিয়া যাওয়ার সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে চিনিতে পারেন। গুজব ক্রমশঃ বাতাসে উড়িতে লাগিল। শহরের প্রত্যেক অঞ্চলেই শিবাজীর পুণায় উপস্থিতি সম্বন্ধে হিন্দুরা গোপনে বলাবলি করিতে আরম্ভ করে। একদল বেতনভূক আফগান সৈন্য এই গুজব শুনিয়া মন্দিরের চারিদিক ঘিরিয়া ফেলে। বন্দী মারাঠা বীরকে শায়েস্তা খাঁর নিকট উপস্থিত করিতে পারিলে তাঁহারা যে বহুমূল্য পুরস্কার পাইবে এই ভাবিয়া খুব সম্ভব তাঁহারা পরস্পরকে অভিনন্দন জানাইতে আরম্ভ করে।

বর্ত্তমানে যেমন পুনার মন্দির সমূহে গায়কদিগকে তুকারামের রচিত

কবিতা আবৃত্তি করিতে দেখা যায়, সেই রূপ ঐদিনও মন্দিরে একটি জলচৌকির উপর জোড়াসন করিয়া চারণ গায়ক সঙ্গীত করিতেছিলেন। পূজাবেদীর ঔজ্জ্বল্যে তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্‌ভাসিত আর হাঁটুর উপর আড়াআড়ি ভাবে রক্ষিত বীণারতারে দক্ষিণ হস্ত বাজনায় রত। এমন সময় মন্দিরের প্রবেশদ্বারের নিকট হইতে কোন ব্যক্তি আসন্ন বিপদাশঙ্কার সাঙ্কেতিক ধ্বনি করে। আফগান সৈন্যরা মন্দির অবরোধ করিয়াছে। ক্ষণকাল সকলেই সন্ত্রাসে অভিভূত। একমাত্র শিবাজীই আফগানদের আগমনের প্রকৃত কারণ জানিতেন। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার পলায়নের সব পথ রুদ্ধ। কিন্তু তিনি চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। আবৃত্তি ও সঙ্গীত ক্রমে শেষ হইল। আফগানেরা চলিয়া গিয়াছে বলিয়া শ্রোতাদের মধ্যে চুপিচুপি কথা হইতে লাগিল। মন্দিরের অঙ্গন খালি হইয়া গেল। সুদীর্ঘ স্তম্ভশ্রেণীর অভ্যন্তরে শুধু প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছিল, আর মশালের অস্থির আলো নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ। এইরূপ অবসরের সুযোগ পাওয়ায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া শিবাজী ধীরে ধীরে উঠিয়া রাস্তায় বাহির হইলেন। আফগানদিগকে কোথাও দেখা গেল না।

মহারাষ্ট্রদেশে জনশ্রুতি এই যে আফগান সৈন্যগণ যখন মন্দিরের দিকে তাড়াহুড়া করিয়া অগ্রসর হইতেছিল ঠিক সেই সময় আপাত দৃষ্টিতে শিবাজীর মত দেখিতে এক মস্তকাবৃত মনুষ্যমূর্ত্তি পাশের একটি দরজা দিয়া বাহির হইয়া রাস্তায় দৌড়াইতে থাকে। শিকার পলায়ন করিল ভাবিয়া আফগানেরা চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু ঐ মূর্ত্তি আরও বেগে ছুটিয়া চলে। আফগানেরা চারিদিকের রাস্তায় উহার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই ঐ অস্পষ্ট ধাবমান মূর্ত্তির পুরোবর্ত্তী হইতে পারিল না। ইহা একটা দৈবঘটনা অথবা (মারাঠারা যেমন বিশ্বাস করিতে চায়) কোন অতি প্রাকৃত শক্তির সাহায্যে শিবাজী এ-যাত্রায় রক্ষা পাইলেন বলা শক্ত। যাহা হউক শিবাজী নিরাপদে নিজ শিবিরে পৌঁছিয়া গেলেন।

এই বীরত্বপূর্ণ অভিযানের স্বল্পকাল পরে শিবাজী দ্বিতীয়বার পুণায় আগমন করেন।

পুণা শহরের প্রাচীর এবং দরজায় এত কঠোর পাহারার ব্যবস্থা হয় যে কোন হিন্দু বাহির হইতে এই শহরে প্রবেশ করিতে কিম্বা শহরের ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে পারিত না। কিন্তু প্রয়োজন হইলে কখনও কখনও এই নিয়মের কঠোরতা অল্প বিস্তর হ্রাস করা হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে মুঘল সমর বাহিনীযুক্ত হিন্দুসৈন্য এবং পুণার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা শিবাজীর প্রতি অনুরক্ত বলিয়া সন্দেহভাজন ছিল, এই দুই প্রকার লোকের মধ্যে মুঘল কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। ইতিমধ্যে একদিন মুঘল রাজকার্য্যে নিযুক্ত কয়েকজন হিন্দু পুণায় অসামরিক শাসন কর্ত্তার সহিত সাক্ষাত করিয়া তাহাদের বন্ধু জনৈক হিন্দু অধিবাসীর বিবাহের শোভাযাত্রা হিন্দু প্রথানুযায়ী যাহাতে নগরে প্রবেশ করিতে পারে তাহার অনুমতি চাহেন। উক্ত শাসনকর্ত্তা মনে করেন যে এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া হিন্দুগণ চলিয়া যান।

সন্ধ্যায় বিবাহের শোভা যাত্রা নগরদ্বারে উপস্থিত হইল। প্রথমে আসিল অশ্বপৃষ্ঠে তরুণ বর। তাহার গায়ে সোনালী রঙের শাল ও মস্তক দোলায়মান চাঁপাফুলের মালায় আবৃত এবং ঈষৎ অবনত। তাহার পিছনে ছিল ঢাক, ঢোল বাঁশী প্রভৃতি লইয়া গায়কের দল। এবং পরে এই শুভ অনুষ্ঠানের উপযোগী নানা প্রকার পোষাকী বস্ত্র পরিহিত বরপক্ষের নিমন্ত্রিত অতিথি, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবেরা হাসি-ঠাট্টা করিতে করিতে আসিতেছিল। প্রহরারত সৈন্যগণ কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া শোভাযাত্রা প্রবেশ করিতে দেয়।

কয়েক মিনিট পরে একদল মুঘল অশ্বারোহী সৈন্য কতকগুলি মারাঠা কয়েদীকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে করিতে পুণা নগরীর দ্বারে উপস্থিত হইল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য প্রহরীরা চীৎকার করিয়া উঠে। তাহাদিগকে বলা হয় যে নিকটেই একটা দাঙ্গা হইয়াছে। মারাঠারা মুগলদের একটা ছাউনি আক্রমণ করার চেষ্টা করে কিম্বা মুঘল সৈন্যরা পাহাড়ে হানা দেয়—এইরূপ একটা লড়াইয়ের সময় মারাঠারা সামান্য প্রতিরোধ করিয়া আত্মসমর্পণ করে। প্রহরীরা ইহা শুনিয়া হাসাহাসি করিতে থাকে এবং অশ্বারোহী সৈন্যদের অভিনন্দন জানায়। সৈন্যদল

ইহার পরে শহরে প্রবেশ করে। ক্লান্ত মারাঠা কয়েদীয়া তাহাদের সম্মুখে হোচট খাইয়া কোনরূপে চলিতে থাকে।

কিয়ৎকাল পরেই রাত্রি ঘনাইয়া আসে এবং নগরের সমস্ত দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। শহরের এক নিরালা অঞ্চলে বিবাহের শোভাযাত্রা, মুঘল অশ্বারোহীদল ও মারাঠা কয়েদীরা মিলিত হইয়া তাহাদের ছদ্মবেশ ফেলিয়া দেয়। বলা বাহুল্য, তাহারা সকলেই শিবাজীর দলভুক্ত। পুনার শাসন কর্ত্তার নিকট যাহারা আবেদন পেশ করেন শিবাজী নিজে তাহাদের মধ্যে ছিলেন এবং শোভাযাত্রার ছিলেন তিনি ঢাকীর বেশে। ঐ রাত্রি ছিল অতিশয় অন্ধকার। জনৈক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে রজনীর অন্ধকার শিবাজীর "হৃদয়ের অন্ধকারের সহিতই তুলনীয়।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বারিপাত শুরু হয়। বর্ষার অবিশ্রাম বৃষ্টি। শহরের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এলাকার সঙ্কীর্ণ গলিপথে শিবাজী তাঁহার অনুচরদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যান। নদীর ধারে পৌঁছাইলে শিবাজীর পূর্ব্বতন আবাস বাটী "চিত্রাঙ্কিতপ্রাসাদ' অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা গেল। মুহূর্ত্তের জন্য সকলে কান পাতিয়া রহিল।

বর্ষার তীব্র বারিপাতের ফলে স্ফীত বিক্ষুব্ধ স্রোতস্বিনী আবেগপূর্ণ উত্তেজনায় প্রবহমান। আঁধারের মধ্যে বন্যার উদ্দাম তরঙ্গরাশির উপর প্রবল বৃষ্টি পড়িয়া ফোঁস ফোঁস শব্দ হইতেছে। মারাঠাদের—আগমনের শব্দ বন্যার ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। রাজ প্রাসাদে কোন নড়াচড়ার লক্ষণ ছিল না। সেখানে না ছিল কোন আলো, না ছিলো কোন শব্দ। সেখানে প্রহরী নিযুক্ত থাকিলেও তাহারা বৃষ্টির ভয়ে নিশ্চয়ই নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল। দেওয়াল টপকাইয়া শিবাজীর প্রাসাদের অভ্যন্তরে বাগানে প্রবেশ করার সময় কোন বিপদাশঙ্কার সঙ্কেত ধ্বনি দ্বারা প্রতিরোধ কার কোন চেষ্টা হইল না। প্রাসাদে প্রবেশ করিবামাত্র শিবাজী শত্রুপক্ষের অসুবিধার পূর্ণ সুযোগ নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইলেন কারণ তাঁহার কিশোর জীবনে আবাস এই প্রাসাদের প্রতি গজ ভূমির অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল খুবই প্রখর। তিনি অধিকাংশ অনুচরদিগকে বাগানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বিশজন সঙ্গী লইয়া দেওয়াল টপকাইয়া প্রাসাদের অন্দর

দরজায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে কিন্তু একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। কতকগুলি খোজা প্রহরী অর্দ্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় খোশগল্পে মত্ত। দেওয়ালের পাশ দিয়া শিবাজী ছায়ার মত রন্ধনশালার দরজায় পৌঁছান। তখন রোজার সময়। কয়েকজন পাচক ভোর বেলায় পরিবেশনের জন্য রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। রন্ধনশালার দরজা অর্গল বদ্ধ ছিল না। শিবাজী একটু ধাক্কা দিতেই দরজা খুলিয়া যায়। পাচকেরা দরজার দিকে পেছন করিয়া ডেকচির উপরে ঝুঁকিয়া কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। মারাঠারা পাচকদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তাহাদিগকে মাটিতে ফেলিয়া গলা টিপিয়া হত্যা করে। সমস্ত ব্যপারটা নিমেষের মধ্যে শেষ হইয়া গেল। একটু কান্নার শব্দও উত্থিত হয় নাই।

শিবাজীর এখন মনে পড়িল যে রন্ধনশালার এং., বাল্যকালে তিনি যে প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতেন তাহার মধ্যে মাত্র একটি মাটির দেওয়ালের ব্যবধান। এই প্রকোষ্ঠখানাই প্রসাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও জমকাল। শায়েস্তা খাঁ নিশ্চয়ই এই কক্ষে নিদ্রিত আছেন। শিবাজী তাহার সঙ্গীগণকে বাগানে রক্ষিত যন্ত্রপাতিগুলি আনিতে বলেন এবং কোদাল, খন্তা, গাঁইতি প্রভৃতি লইয়া তাঁহারা দেওয়াল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করেন। খাঁ সাহেবের একজন ভৃত্য দেওয়ালের গায়ে গদিতে হেলান দিয়া ঘুমাইতেছিল। গাঁইতি দিয়া দেওয়াল ঠুকিবার অস্পষ্ট ভোঁতা শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সে দৌড়াইয়া গিয়া নিদ্রিত মনিবকে জাগাইল। শায়েস্তা খাঁ শয্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে হাই তুলিতে লাগিলেন। তাহার ঘুমের ভার তখনও কাটে নাই এবং ভৃত্যের এবম্বিধ সন্দেহে তিনি বিরক্ত বোধ করেন। রন্ধনশালায় শব্দ শোনা যাইতেছে! তাহাতে কি হইয়াছে? নিশ্চয়ই ইহা পাচকদের গোলমাল। তিনি অল্পক্ষণ কান পাতিয়া শুনবার চেষ্টা করেন। এক প্রকার "চক্-চক্" শব্দ তাহার কানে আসিল। ক্রুদ্ধস্বরে তিনি বলেন যে অশ্বারোহী প্রহরীরা ঘোড়া বাঁধিবার খুটি পুতিতেছে বলিয়া ঐ রূপ শব্দ হইতেছে। তারপর তিনি চাকরের দিকে ফিরিয়া তাকান ও সে ছেলেমানুষের মত আতঙ্কে ভীত হইয়া তাহার ঘুমের ব্যাঘাত করিয়াছে এই বলিয়া তাহাকে গালাগালি করেন। রাগে বিড়

বিড় করিতে করিতে তিনি পুনরায় শয়ন করেন ও নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুমাইয়া পড়েন। অল্পক্ষণের মধ্যেই মারাঠারা দেওয়াল ছিদ্র করিয়া ফেলে। তরবারি হাতে শিবাজী ঘরে ঢুকিয়া শায়েস্তা খাঁর শয্যার দিকে তীব্রবেগে অগ্রসর হন। এই আকস্মিক আক্রমণে শায়েস্তা খাঁ যথা-সম্ভব তৎপরতার সহিত বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়েন। শিবাজীর তরবারি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেও শায়েস্তা খাঁয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। পর মহূর্ত্তেই একটি চাকর একটা লণ্ঠন লইয়া আসায় ঘরটা সামান্য আলোকিত হইল। এদিক অন্ধকারের মধ্যে শায়েস্তা অন্দরমহলে পৌঁছিয়া তাহার ক্রীতদাসীদের মধ্যে লুকাইলেন। মারাঠাদিগের মধ্যে কয়েকজন হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাঁহার পিছনে ছোটে ও পুরুষ কি মেয়েমানুষ বুঝিতে না পারিয়া দুইটি স্ত্রীলোককে কাটিয়া ফেলে। শায়েস্তার পুত্র পিতার সাহায্যে ছুটিয়া আসিল ও বীরের ন্যায় শত্রুদিগকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু পরমহূর্ত্তেই মারাঠারা তাহাকে হত্যা করে। বীরপুত্রের এই হস্তক্ষেপের ফলে শায়েস্তা খাঁ পলায়ন করার সুযোগ পান। ক্ষিপ্রগতিতে তাঁহাকে প্রাসাদের বাহিরে আনিয়া লুকাইয়া রাখা হইল।

প্রাসাদের সর্ব্বত্র একটা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হইল। ভীতি বিহ্বল খোঁজা প্রহরীরা ক্ষিপ্ত হইয়া অশ্বারোহী রক্ষীদলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সজোরে ঢাকে বাড়ি দিতে লাগিল। কিন্তু রক্ষীগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে কে শত্রু, তাহারা কোথায় এবং কতজন এসব কথা কেহই জানিতে পারে না। রক্ষীগণ অন্ধকারে বারান্দায় ছোটাছুটি করিয়া কখনও বা ভীত ও আতঙ্কিত স্ত্রীলোকদিগকে পদদলিত করিল, কখনও বা ভুলে প্রাসাদের ভৃত্যদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের আগমনে বিশৃঙ্খলা বাড়িল বই কমিল না।

শিবাজীর অবশিষ্ট সৈন্যদল এতক্ষণ বাগানে অপেক্ষা করিতেছিল। সঙ্কেতধ্বনি শোনা মাত্র তাহারা প্রাসাদের সিংহদ্বারে ছুটিয়া আসিয়া নিদ্রিত প্রহরীদিগকে কাটিয়া ফেলে। তাহারা উল্লসিত হইয়া উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল, "আহা পাহারা দেওয়ার কি সুন্দর রীতি!" অধিকাংশ মারাঠা সৈন্য প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে। তিন চারিজন সিংহদ্বারের উপরে

নহবৎখানায় উঠিয়া যায়। তাহারা বাদ্যকরদিগকে জাগরিত করে এবং তাহাদিগকে দিয়া দেওয়ালে রক্ষিত বাদ্যযন্ত্রগুলি নামাইয়া জোর করিয়া তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব উচ্চরবে উল্লাস ও আনন্দের বাজনা বাজাইতে বাধ্য করে। কানে তালা লাগান স্ফূর্ত্তির বাজনার উচ্চ কলবর শুধ যে অসহনীয় বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি করিল তাহাই নহে, ইহার ফলে প্রাসাদের চারিদিকে সম্মিলিত বিহ্বল মুঘল সৈন্যরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রকৃত অবস্থা যে কি তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে শিবাজী দেখিতে পান যে একজন মুঘল ওমরাহ জানালা দিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই ব্যক্তি হয়তো স্বয়ং শায়েস্তা হইবে ইহা মনে করিয়া শিবাজী তাহার দিকে ধাবিত হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত তিনি স্বীয় লোকজন একত্র করিয়া শায়েস্তাখানের আবাসগৃহ হট্টগোলের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া অলিগলি রাস্তা দিয়া নগরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে প্রহরীদিগকে পরাস্ত করিয়া যে রণহস্তীদ্বারা প্রহরীরা তাঁহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল উহা এক কোপে কাটিয়া ফেলেন। তারপর তাঁহারা নগর দরজা খুলিয়া অন্ধকারে মিশিয়া যান।

নগরের বাহিরে দশ হাজার মুঘল অশ্বারোহী সৈন্য গুরুভার অস্ত্রসহ মোতায়েন ছিল। শিবাজীর আকস্মিক আক্রমণের সংবাদ উহাদের নিকট পেঁাছিবামাত্র সেনাপতিরা মারাঠাদিগকে পাকড়াও করিতে আদেশ দেয়। ডঙ্কা বাজাইয়া শিবিরে নিদ্রিত সৈন্যদিগকে জাগাইয়া তোলা হয়। অনতিবিলম্বে একদল অশ্বারোহী সৈন্য পাহাড়ের পথ ধরিয়া অগ্রসর হয়। এইরূপ ভাবে মুঘলেরা তাঁহার অনুসরণ করিবে শিবাজী পূর্ব্বেই ইহা ভাবিয়া এক সুচতুর উপায় অবলম্বন করেন। পথিমধ্যে এক ঝোপের আড়ালে তিনি তাঁহার সঙ্গীদিগকে আসিতে বলেন এবং প্রত্যেক গাছের মাথায় একটি করিয়া ঝুলন্ত মশাল বাধিয়া রাখিতে আদেশ দেন। পথের আলোকচ্ছটা দেখিয়া মুঘল অশ্বারোহীরা ঘোড়া থামাইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। সমগ্র মারাঠা বাহিনী নিশ্চয়ই অল্পকয়েক গজের মধ্যে শিবির স্থাপন করিয়াছে এই মনে করিয়া মুঘলেরা আর অগ্রসর হইতে

সাহস করিল না। তাহারা পুনায় ফিরিয়া গিয়া মারাঠা সেন্যদের অবস্থিতির সংবাদ দিবে স্থির করিল।

শিবাজীর সহিত সংঘর্ষের ফলে শায়েস্তা খাঁর কিঞ্চিৎ বুদ্ধি বিপর্য্যয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার অঙ্গুলি কাটিয়া যাওয়ায় পরদিন সকালে তাঁহার অমাত্যেরা তাঁহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতে আসিলে তিনি তাহাদের সহিত কথা না বলিয়া দুর্জয় ক্রোধে নিজের ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ যোধপুরের মহারাজার প্রতি দৃষ্টি পড়িতে তিনি মহারাজাকে কাপুরুষতা ও কর্ত্তব্যে অবহেলাজনিত দোষারোপ করিয়া মনের আবেগে বলেন, "শত্রুরা যখন আমাকে আক্রমণ করে তখন কি আপনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে আপনিও সম্রাটের অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী?" যোধপুরের মহারাণা ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের একজন বিশ্বস্ত সামন্ত নৃপতি। শায়েস্তা খাঁয়ের কথা শুনিয়া রাজপুত বীর ক্রোধে অভিভূত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়ান ও তখনই ঐ প্রাসাদ পরিত্যাগ করেন। তারপর জোড়াতালি দিয়া কোনওরূপে একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শায়েস্তা খাঁ পাহাড়শ্রেণীর দিকে মারাঠাদের উদ্দেশে অগ্রসর হন। এই বাহিনীতে কোন কামান ছিল না (তখনও খুব বৃষ্টি হইতেছিল; এই ভীষণ বৃষ্টিতে কামান লইয়া চলাফেরা করা সম্ভব ছিল না)। অভিযানের সাফল্যের অতি প্রয়োজনীয় স্থানীয় অবস্থার প্রাথমিক নিরীক্ষণের জন্য কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। এদিকে মারাঠা গোলন্দাজ সৈন্যরা ছোট ছোট ঝোপের মধ্যে কামান লুকাইয়া রাখে। এবং মুঘলবাহিনীর পুরোভাগ তাহাদের নিকটস্থ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া মাত্র কয়েকগজের ব্যবধান হইতে তাহারা কামানের গোলা ছুড়িতে সমর্থ হয়। ভীষণ ও অতিব্যাপক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল। শায়েস্তা খাঁ যে হাতীতে আরোহণ করিয়াছিলেন উহাও মারা পড়িল। আকস্মিক আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া মুঘলেরা ঘোরতর বিশৃঙ্খলার মধ্যে পশ্চাদ্ধাবন করিতে আরম্ভ করা মাত্র একদল মারাঠা অশ্বারোহী উন্মত্ত কলরবে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে।

বিধ্বস্ত সৈন্যগণ সহ ক্ষিপ্রগতিতে পশ্চাদ্ধাবন করিবার সময় শায়েস্তা খাঁয়ের মুখ হইতে নির্গত "বিশ্বাসঘাতকতা," "রাজদ্রোহিতা" ইত্যাদি নানা প্রকারের উক্তি শোনা যাইতে লাগিল। তাঁহার পুণা পৌঁছিতে

পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। পাহাড়ের উপর ঝলমল করা আলোর আভার দিকে তিনি ফিরিয়া তাকান ও দেখেন যে প্রতিটি শিখরে জয়গর্বিত মারাঠাদের দ্বারা বহ্যুৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উহার উপরে নূতন ইন্ধন পড়ামাত্র অগ্নিশিখা উচ্চে আকাশের দিকে প্রবাহিত হইয়া গোধূলির সবুজ সন্ধ্যারাগ আলোয় উদ্‌ভাসিত করিয়া দিল।

প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শায়েস্তা দিন কয়েক একান্ত নিরালায় কাটান। পুণা হইতে দলবল অপসরণ করিবার জন্য অবশেষে প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন।(১)

শিবাজীর অদ্‌ভূত বীরত্ব কাহিনীর সংবাদে দিল্লীতে অত্যন্ত ভীতির সৃষ্টি হইল। সেখানে কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা শিবাজীর উপর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আরোপ করিতে লাগিল। জনৈক ইংরাজ কুঠিয়াল লেখেন, "জনশ্রুত এই যে শিবাজী নিশ্চয় পক্ষসম্বলিত দেহে শূন্যে উড়িতে পারেন, অন্যথায় তাঁহার পক্ষে একই সময় এত বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত থাকা অসম্ভব হইত। লোকে তাঁহাকে গ্রীক বীর হারকিউলিস্ অপেক্ষাও পরিশ্রমী মনে করে। বাস্তবিক সকল পর্য্যার লোকের নিকটই তিনি একটি অত্যাশ্চর্য্য আলোচ্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছেন।"

শিবাজীর কার্য্যকলাপে গোয়ার পর্ত্তুগীজরাও অনুরূপ বিস্ময় প্রকাশ করে। সেনহর ডা গার্দ্দা (Senhor de Guarda) লেখেন, "শিবাজী অন্যলোককে নিজবেশে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করিতেন অথবা

(১) শিবাজীর মৃত্যুর পর জনৈক মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ এই বীরত্বপূর্ণ অসম সাহসিক কাজের অনুকরণ করেন। মাত্র দুই হাজার সৈন্য লইয়া তিনি মুঘলসম্রাটের শিবির আক্রমণ করিয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। কিন্তু তিনি দেখেন যে বিশ্বাসঘাতকতার আতঙ্কে আওরঙ্গজেব ঐ শিবিরে শয়ন করেন নাই। বিজয়ের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ তিনি সম্রাটের তাঁবুর স্বর্ণ নির্ম্মিত দণ্ডগুলি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তিনি জাদুকর কিংবা শয়তান---এ প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয় নাই।" (১)

মুঘল দরবারে সম্রাটের মাতুলের এইরূপ হাস্যকর বিফলতায় মর্ম্মন্তুদ অনুতাপ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণের মনে তখনও যুবরাজ দারার স্মৃতি মুছিয়া যায় নাই। সাম্রাজ্যের একজন উচ্চতম সেনাপতির পক্ষে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হারাইয়া জীবনরক্ষার জন্য ক্রীতদাসী স্ত্রীলোকগনের মধ্যে আশ্রয় লওয়ার বাজারে নানা প্রকার গল্পগুজব রটিতে থাকে। সম্রাট মাতুলকে সৌজন্যহীন এক চিঠি লেখেন। তিনি তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের প্রধান সেনাপতির কাজের দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেন ও বঙ্গদেশের প্রদেশপালরূপে এক অপেক্ষাকৃত নিম্নতর কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ঐ প্রদেশে অবাধ-লুণ্ঠনের সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উহার অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর ভয়ে কেহ ওখানে যাইতে পছন্দ করিত না। বাস্তবিক ঐ প্রদেশের নাম দেওয়া হইয়াছিল, "পর্য্যাপ্ত রুটি পরিপূর্ণ নরক।"

ইংরাজ লেখকেরা শায়েস্তাখাঁর প্রতি খানিকটা সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহার যোগ্য নহেন। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ চালনায় নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়া তিনি বঙ্গদেশে অর্থলোলুপতার জন্য

---

(১) সেনের "মিলিটারী সিস্টেম অফ্ মারাঠাস্" (Vides eaccoens do famoso efelicissimo Sevagy) নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য। শিবাজীর দুইবার পুণা অভিযানের মধ্যে দ্বিতীয় অভিযানের বৃত্তান্ত কেবল মারাঠা ঐতিহাসিকেরাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এমন নহে; বার্ণিয়ে, মানুচিচ প্রভৃতি সমসাময়িক ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরাও ইহার বিবরণী লিখিয়াছেন। প্রথম অভিযানের একমাত্র নজির হইল মারাঠা জনশ্রুতি ও সংস্কার। সমালোচকেরা ইহা রূপ রহস্য মনে করিতে পারেন। তবে প্রত্যেক মারাঠা ইহা বিশ্বাস করে বলিয়া আমি ইহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

এত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন যে অদ্যাপি সেখানে লোকে তাঁহার নাম মনে রাখিয়াছে।(১)

শাহজাদা মুয়াজ্জেম শায়েস্তা খাঁর পরে দাক্ষিণাত্যের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন।

আওরঙ্গজেব যদি স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন তবে মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে হয়তো ভাল হইত। কারণ তিনি ছিলেন একজন সুযোগ্য সেনাপতি। পক্ষান্তরে যুবরাজ ছিলেন অলস ও আরামপ্রিয়। শিকার এবং পলো খেলা ছিল তাঁহার প্রধান আকর্ষণ। আওরঙ্গজেবের অতি প্রিয় ভগিনী ও কুগ্রহ রোশানারা এই সময় কাশ্মীর ভ্রমণের জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এই ভগিনীর চক্রান্ত অবশ্য যুবরাজ দারাকে পরাজিত করিতে আওরঙ্গজেবকে বিশেষ সাহায্য করে। মারাঠাদিগের সহিত যুদ্ধ যে "স্প্যানীশ ক্ষত" (Spanish ulcer") রূপে আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য বিভ্রান্ত করিবে এবং ইহার গুরুত্ব যে তাঁহার ভগিনীর প্রাচ্যের ভূস্বর্গ কাশ্মীর ভ্রমণের প্রতিবন্ধক হইতে পারে একথা আওরঙ্গজেব কখনও কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

সংসারে একমাত্র রোশানারার প্রতি আওরঙ্গজেবের শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের ধর্ম্মবিষয়ে সরল নিষ্ঠা ও গোঁড়ামি সমর্থন করা দূরের কথা, তিনি ছিলেন অত্যন্ত জাঁকজমক ও বিলাসিতা প্রিয়। ব্রহ্মদেশ হইতে আগত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ না করিয়া তিনি কখনও প্রকাশ্যে বাহির হইতেন না। এই হাতীর গলদেশে দুলিত একটি বিরাট ঘণ্টা। মণিমুক্তা শোভিত ও চিত্রাঙ্কিত জাফরি বেষ্টিত ইহার হাওদার ছাদ শোভিত হইত সিল্কের জালি কাপড়ে। ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত বালিকারা জানু পাতিয়া বসিয়া সতত পাখা দিয়া তাঁহাকে বাতাস করিত। তাঁহার হস্তীর দুইপাশে উদ্ভট পোষাকে সজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে খোজারা স্বর্ণ দণ্ড বহন করিয়া চলিত, আর অসংখ্য ছড়িদার ভৃত্য তাঁহার পথ পরিষ্কার

(১) উত্তরপশ্চিম ভারতে যেমন নাদির শাহের নাম জনসাধারণের অপ্রিয়, তেমনই ঘৃণিত রাজকর্ম্মচারীদিগকে গালি দেওয়ার সময় শায়েস্তা খাঁর নাম আজিও ব্যবহৃত হয়।

রাখিতে ব্যস্ত থাকিত। বিশিষ্ট মহিলাসঙ্গীরা শোভাযাত্রায় অনুসরণ করিত। সমগ্র শোভাযাত্রায় সাধারণতঃ সরকারী হাতীর সংখ্যা হইত ষাট। ইহা ছাড়া আশে পাশে অশ্বারোহী থাকিত। ফরাসী সমালোচক বার্ণিয়ার পর্য্যন্ত এইরূপ শোভাযাত্রা দেখিয়া মুগ্ধ হন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "দার্শনিক ঔদাসীন্যের সহ এই সব দৃশ্য না দেখিলে, আমিও হয়তো ভারতীয় কবিদের মত ভাবের আবেগে মনে করিতাম যে হাতীগুলি দেবীমূর্ত্তিদিগকে ইতরলোকের দৃষ্টি হইতে গোপন করিয়া লইয়া চলিয়াছে।"

এই যাত্রায় কাশ্মীর ভ্রমণকালে বার্ণিয়ার সম্রাটের সঙ্গী হইয়াছিলেন। (১) পথে গ্রীষ্মাতিশয্য অস্বাচ্ছন্দ্য ও অভিযানের মন্থরগতি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করা সত্ত্বেও তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক জাঁকজমক ও আড়ম্বর দেখিয়া বিশেষ চমৎকৃত হন। রক্তবর্ণের বস্ত্রে প্রস্তুত সম্রাটের শিবির, উহার মধ্যে সোনা রূপায় জরীর কাজ করা রেশমী আবরণ, হাতে চিত্রাঙ্কিত সিল্কের পর্দ্দা, সুচীশিল্পে পরিশোভিত নানা রঙ্গের ও সুরুচিপূর্ণ অথচ প্রগাঢ়ভাবে রঞ্জিত পাড়ের সার্টিন বস্ত্রাদি; দৈহিক সৌন্দর্য্যের জন্য মনোনীত দিনের বেলায় শিবির রক্ষী সাম্রাজ্যের প্রতীক ও পতাকা বাহীর দল, রৌপ্য নির্ম্মিত মৎসদ্বয়, দুইটি পক্ষ বিশিষ্ট দানবমূর্ত্তি, স্বর্ণ নির্ম্মিত তুলাদণ্ড, সগর্ব্বে উত্থিত সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্বের প্রতীক উন্মুক্ত হস্ত, ছায়াসম্বলিত শায়িত সিংহের চিত্র সহ সম্রাটের নিজ পতাকা, সন্ধ্যার প্রারম্ভে সম্রাটকে অভিবাদন

---

(১) কাশ্মীরের অধিবাসীরা সত্যই ইহুদী কিনা ইহা নির্ণয় করিবার জন্য বার্ণিয়ার খুব ব্যগ্র হন। ইহাদের মধ্যে সলোমন, মুসা প্রভৃতি নাম তাহার মনে গভীর রেখাপাত করে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতেই যে ইহুদী বণিকেরা কাশ্মীরে ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করে ইহা আলবেরুণীর কাশ্মীর ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাওয়া যায় (ই,সি, সাচনের ইংরাজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। কাশ্মীরীরা অবশ্য সত্য সত্যই ইহুদী নহে, যদিও আধুনিক কালেও এইরূপ একটা ধারণা চালু আছে।

করিবার জন্য আমীর ওমরাহগণের আনুষ্ঠানিক সম্মিলিত শোভাযাত্রা প্রভৃতি দৃশ্য দেখিয়া তিনি বিমোহিত হন। অন্ধকার রাত্রিতে এই শোভাযাত্রার সুদীর্ঘ দীপমালায় উদ্‌ভাসিত দীর্ঘ শিবির শ্রেণীর মধ্যস্থ পথে ওমরাহদের দলে দলে আগমন এবং মসলিপট্টমে প্রস্তুত নানারূপ পুষ্প চিত্রিত কাপড়ে মোড়া পথ দিয়া তাহাদের নিজ নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন এক অতি মনোরম ও অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করিত।

প্রাচ্য দেশে ভ্রমণের স্বাভাবিক মন্থর গতি পথিমধ্যে শিকার অভিযানে আরও বিলম্বিত হইত। মুঘল রাজবংশের অন্যান্য সকলের মত আওরঙ্গজেবও শিকার করিতে ভালবাসিতেন। শিকারের প্রতি আসক্তিকে গোঁড়া মুসলমান সম্রাট শুধু আমোদ প্রমোদ লাভ ছাড়া অন্য কারণ দেখাইয়া সমর্থন করিতেন। তাঁহার নিয়োজিত সরকারী লিপিকার সোজাসুজি লিখিয়াছেন, "বাস্তবিক শিকারের মাধ্যমে সম্রাট তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার অধিকতর বর্দ্ধিত করেন। এতদ্ব্যতীত শিকার অভিযানের দ্বারা সম্রাট অনেক সময় প্রজাদের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক তথ্য জানিতে পারেন। এই সব মহান উদ্দেশ্য লইয়া তিনি শিকারের আনন্দ উপভোগ করেন। ক্ষুদ্র দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা মনে করে যে শিকার করা ভিন্ন সম্রাটের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানেন যে সম্রাটের উদ্দেশ্য অনেক মহত্তর।"

দ্বাদশ অধ্যায়

উত্তরভারতে অনুচরবর্গসহ কাশ্মীর অভিমুখে সম্রাটের শোভাযাত্রা যখন মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছিল এবং মধ্য ভারতে যুবরাজ মুয়াজম ভোজ সভায় এবং পোলো খেলার মাঠে হেলায় সময় কাটাইতেছিলেন সেই সময় শিবাজী মুঘলদিগের পুণা অধিকারের প্রতিশোধ স্বরূপ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য চলাচলের একটি শীর্ষ কেন্দ্রে হানা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

এই সময় ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিপন্ন বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল সুরাট। এখান হইতেই হজ যাত্রীদের জাহাজ প্রতিবৎসর মক্কা অভিমুখে রওনা

হইত। এখানে আরব ও চীনদেশের নানা প্রকার তরণী এবং ইংরেজ, ওলন্দাজ, পর্তুগীজদের বাণিজ্যপোত ইউরোপ ও আফ্রিকার পণ্যাদি সরবরাহ করিত এবং এখানকার বাজারে সর্বজাতীয় বণিকদের ব্যবসা করিবার সুযোগ মিলিত। সুরাটে প্রবাহিত পণ্যদ্রব্যাদির প্রাচুর্য্যের কিছু আভাষ পাওয়া যায় এই বন্দরের রাজস্ব আয় হইতে। কেবলমাত্র আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের উপর ধার্য্য শুল্ক হইতে বন্দরের বার্ষিক আয় ছিল তৎকালিন প্রচলিত মুদ্রায় সত্তর হাজার পাউণ্ড।

তাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত এই সুরাট শহর। নদীর স্রোত খুব প্রখর এবং জোয়ার ভাটার তারতম্য খুব বেশী। শিবাজীর আমলে জোয়ারের মুখে নদীর জলস্ফীতির অবস্থায় ১০০০ হাজার টনের জাহাজ শহরের তীরে আসিয়া নোঙ্গর করিত। বাণিজ্যপোতগুলি সাধারণতঃ নদীর মুখে অবস্থিত সুহায়লী নামক বন্দর পর্য্যন্ত আসিয়া থামিত। এখানে প্রায়ই শতাধিক জাহাজ নোঙ্গর ফেলিয়া অবস্থান করিতে দেখা যাইত। ইহাদের মধ্যে ইংরাজ এবং ওলন্দাজগণের জাহাজের সংখ্যাই বেশী। আরবদেশের জাহাজ সমূহের রক্তবর্ণের সিল্কের প্রকাণ্ড পতাকা-গুলি হাওয়ায় আন্দোলিত হইয়া বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। জাহাজ ঘাটে বিদেশী বণিকদের পণ্যদ্রব্য মজুত রাখিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুদাম নির্মিত হইয়াছিল। এইসব বিশাল গুদামবাড়ীর ছাদে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা শোভা পাইত। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রবেশ-পথ স্বরূপ এই নগরীতে আগমনের পরেই প্রত্যেক ভ্রমণকারী এবং বণিককে শুল্কদফতরে যাইতে হইত। কিন্তু দ্বাররক্ষীদের সহিত বহু বাগবিতণ্ডা ও কুলিমজুরদের সঙ্গে অনেক দরকষাকষির প্রয়োজন হইত। শুল্ক বিভাগের প্রধান রাজকর্মচারী মালপত্র এবং পণ্যদ্রব্য সমূহ পরীক্ষা ও বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রচলিত নিয়ম কানুন নিয়ন্ত্রণ করিতেন। চাবুক হাতে কয়েকজন নিগ্রো ক্রীতদাস সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত। যাবতীয় দ্রব্য অতিশয় কঠোরতা সহ পরীক্ষা করা হইত। প্রত্যেকটি পুঁটলি এবং প্যাকেট খুলিয়া দেখা হইত। ফরাসী পর্য্যটক থেবেনো অভিযোগ করিয়া লিখিয়াছেন যে তল্লাসকারীদের ইচ্ছা হইলে তাহারা ভ্রমণকারীকে

মাথার টুপি, দেহের অন্তর্বাস, জুতা, মোজা প্রভৃতি শরীরের যাবতীয় আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দেখিত।

শুল্ক গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইত মুদ্রা বিনিময় আফিসে। এখানে বিদেশী মুদ্রার বদলে ভারতীয় মুদ্রা পাওয়া যাইত। ভারতীয় ব্যাঙ্কে কারবার থাকিলে বণিকেরা এখানে হুণ্ডিও(১) দাখিল করিতে পারিত। তারপর আগন্তুকেরা মুদ্রা বিনিময় করার অফিসের বাহিরে ভাড়াটিয়া দ্বিচক্রযানে অথবা বিদেশী আগন্তুক একটু অবস্থাপন্ন হইলে সিল্কের কাপড়ে আচ্ছাদিত গরুর গাড়ীতে চড়িয়াও সুরাটের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেন।

সুরাটে যাওয়ার পথটি ছিল বেশ মনোরম। ইহার দুইদিকে ছায়াবিথি ও ইক্ষু ও তামাকের ক্ষেত। শহরের দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইলে অসংখ্য উদ্যান পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছায়া-সুনিবিড় এই উদ্যানগুলিতে সূর্য্যালোক তেমন প্রখর হইত না এবং কাছাকাছি সরোবর ও অন্যান্য জলাশয় থাকায় এখানে সর্ব্বদাই একটা স্নিগ্ধতা বিরাজ করিত। ধনী ও বিভবশালী বণিকেরা মাঝে মাঝে এখানে আমোদ প্রমোদ ও উৎসব করিতে আসিতেন। রাশভারী ইংরাজ বণিকেরাও কখনও কখনও এই সব উৎসবে যোগদান করিতে রাজী হইতেন। সঙ্গে মেয়েরা না থাকিলে তাঁহারা সাধারণতঃ উন্মুক্ত বিরাট গাড়ীতে চড়িয়া আসিতেন। জাঁকাল চার-ঘোড়ার এই গাড়ীর হাতলগুলি রূপায় বাঁধান ছিল। (২)

সাধারণের ব্যবহারের জন্য উদ্যান ছাড়াও ধনী বণিকদের বাগানবাড়ী ছিল এবং তাঁহারা উহার জন্য বেশ গর্ব্ব অনুভব করিতেন। ওখানে তাঁহারা সাময়িক আমোদপ্রমোদের জন্য অথবা গ্রীষ্মাবাসের জন্য প্রমোদগৃহ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। ঐ গৃহগুলির মেঝে প্রাচ্যদেশের

---

(১) ইহা একপ্রকারের চেক। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে হুণ্ডির প্রচলন আছে। এখনও দেনাপাওনা শোধের কাজ ব্যবহৃত হয়।

(২) Ovington

প্রথা অনুযায়ী নানা প্রকারের কার্পেটে মণ্ডিত থাকিত এবং কোথাও কোথাও পলেস্তারা লেপিত চৌবাচ্চা স্থিত নলের মুখ হইতে বহির্গত উর্দ্ধমুখী জলধারায় চিত্র শোভা পাইত। কিন্তু পরিদর্শকেরা, বিশেষতঃ ইউরোপীয় পথিকেরা এই সব গৃহে কাঁচের জানালার অভাব লক্ষ্য করিতেন। বাস্তবিক ঐ অঞ্চলে কাঁচ তৈয়ার করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। উহা সাধারণতঃ ভেনিস্ বা কনস্টান্টিনোপল হইতে আমদানী করা হইত। কাঁচের অভাবে জানালায় চীক, কাঠের অথবা শামুকের খোসার ফ্রেমে আটা জালি কাপড় ব্যবহার হইত। এই সব প্রাসাদে ধনী শেঠেরা আরামে দিন কাটাইতেন। তাহারা যেমনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেন তেমনই ব্যবহার ও চলাচলনে বেশ রাশভারী ছিলেন।(১)

শহরের শাসনভার ন্যস্ত ছিল একজন নগরপাল (গভর্ণর), উপনগরপাল (ডেপুটি গভর্ণর), বিচারকর্ত্তা (কাজী) ও কোটালের (পুলিশের প্রধান) উপর। প্রতিদিন প্রাতে নগরপাল তিনশত প্রহরী, যুদ্ধকার্য্যে অভ্যস্ত ও সোনালী বস্ত্র আচ্ছাদিত তিনটি হাতী, চল্লিশটি অশ্বারোহী ও চব্বিশটি রাষ্ট্রীয় পতাকা সহ শোভাযাত্রা করিয়া শহরের মধ্য দিয়া বিচারালয়ে যাইতেন। প্রধান কাজী অনুরূপ অনুচরবর্গের সহ তাঁহার অনুসরণ করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে থাকিত নানা প্রকারের বাজনা ও উচ্চ নিনাদকারী দুন্দুভি বাদ্য। কোতোয়ালকে দিনের বেলায় প্রায় দেখা যাইত না। কিন্তু রাত্রে দুন্দুভি নিনাদে ও ঢাকের বাজনায় তাঁহার আগমন ঘোষিত হইত। মশাল ও অন্যান্য অনেক রকম আলো লইয়া সঙ্গীদের সহিত হৈ চৈ করিতে করিতে তিনি নগর প্রদক্ষিণ করিতেন।(২)

বিদেশী বণিকেরাও স্থানীয় উচ্চ কর্ম্মচারীদের জাঁকজমক ও বিলাসীতা অনুসরণ করা নিজেদের স্বার্থের অনুকূল বলিয়া মনে করিতেন। ইংরাজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ প্রকাশ্যে বাহির হইবার সময় সর্ব্বদাই মুঘল সাম্রাজ্যের একজন প্রধান ওমরাহের ন্যায় বেশভূষা করিতেন। তাঁহার সম্মুখে থাকিত রাষ্ট্রিয় শ্বেত অশ্ব, বাদ্যকর দল, দণ্ডধারী পরিচারক বর্গ এবং

---

(১) Fryer (২) Fryer

রৌপ্যদণ্ডে উড্ডীয়মান সিল্কের কাপড়ে প্রস্তুত পতাকা। তিনি পাল্কীতে হেলান দিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে অবস্থান করিতেন। ভৃত্যেরা পাখীর পালকের পাখায় তাহাকে বাতাস করিত। সুরাট শহরে ইংরাজ কুঠিই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিপন্ন। তাহারা সাধারণতঃ চীনদেশে হইতে আমদানি করা চা, চীনামাটির বাসন ও তামার দ্রব্যের ব্যবসা করিতেন। (এই সব জিনিষ প্রধানতঃ আসিত আরবদিগের জাহাজে, কারণ আরবেরা ভারত সমুদ্র হইতে চীনা জাহাজ প্রায় হটাইয়া দিয়াছিল।) শ্যাম দেশে সংগৃহীত কড়ি ও সুমাত্রার সোনা এবং গজদন্তও ইংরাজদের পণ্য দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাবতীয় পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ইংরাজেরা চায়ের উপরই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পন করিতেন। কারণ ওভিঙ্গটনের মতে ইহা ছিল মাথাধরা, পাথুরি, পেটের ব্যথা, বাত, জ্বর, সর্দ্দি শ্লেষ্মা প্রভৃতি নানা প্রকার রোগের সর্ব্বজনপ্রিয় ঔষধ। ওলন্দাজগণ প্রধানতঃ মণিমুক্তার অলঙ্কার ও ব্যাটাভিয়া হইতে আনীত নানা প্রকার মশলার ব্যবসা করিতেন। ফরাসীদের কুঠির ব্যবসা তেমন জাকাল ছিল না, কারণ উহাতে টাকা কড়ির অপেক্ষা ফুলবাবুদের আমদানিই বেশী লক্ষিত হইত।

এক শতাব্দী পূর্ব্বে সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সম্রাট আকবর এই নগরী সুরক্ষিত করেন। নগরের শাসন কর্ত্তাকে (গভর্ণর) তাহার সৈন্যাদি উপযুক্ত ব্যবস্থায় রাখিবার জন্য বার্ষিক যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করা হইত। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের ও সুরাটের অধিবাসীদের দুর্ভাগ্য যে বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা ছিলেন যেমন ঘুষখোর তেমনই ভীরু। সৈন্যদিগের বেতন আত্মসাৎ করিবার জন্য তিনি নানা প্রকার অজুহাতে তাহাদিগকে স্থানান্তরে বদলির ব্যবস্থা করিতেন। প্রাচ্যের অন্যান্য শহরে বিদেশী বণিকেরা তাঁহাদের বাসভবন ও গুদাম পাহারা দেওয়ার জন্য সাধারণতঃ নিজস্ব রক্ষীদল নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু সুরাটে মুঘল সরকারের সাধারণ নিরাপত্তা ও শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষমতার উপর জনসাধারণের এত আস্থা ছিল যে এখানে ঐ নিয়ম ও বিধি ব্যবস্থা প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল।

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অতিশয় ছিন্ন ও ময়লা কাপড়

পরিহিত এক ভিখারী সমুদ্র উপকূলের রাস্তা দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সুরাট বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল।(১) একখানা বাঁশের লাঠি ও ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া তাহার আর কোন সম্বল ছিল না। বর্ত্তমান কালে যেমন, তখনও তেমনই, ভারতবর্ষের রাস্তাঘাটে ভিখারীর ভীড় সর্ব্বদাই একটা অতি সাধারণ দৃশ্য। এই ভিখারীর সুরাটে আগমন লইয়া কোন মন্তব্য শোনা গেল না। এ দেশের ভিখারীরা তাহাদের অহেতুক কৌতুহলের জন্যও কুখ্যাত। কাজেই এ ভিখারী মাঝে মাঝে কথা-বার্ত্তায় মত্ত বাজারের আড্ডাধারীদের কোন কোন বৈঠকের আশে পাশে নিরীহভাবে বসিয়া খুব আগ্রহ সহকারে তাহাদের খোশগল্পাদি শুনিলেও কেহ এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোন প্রয়োজন মনে করে নাই। এই সব আড্ডায় গল্পের বিষয় ছিল হরেক রকমের। সুরাট শহরের স্থানীয় রাজনীতি, এখানকার শাসনের নানা প্রকারের ত্রুটি বিচ্যুতি, রাজকর্ম্ম-চারীদের অকর্ম্মন্যতা, শয়তান শিবাজীর কাজকর্ম্ম ও গতিবিধি ইত্যাদি নানা প্রকারের মুখরোচক গল্পগুজবের আলোচনায় তাহারা মত্ত ছিল। শিবাজী যে পর্ত্তুগীজদের অধিকৃত এলাকা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ইহা তাহারা পরস্পরকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। এইরূপ একটা জনশ্রুতি বহুলোকেও শুনিয়াছিল, কারণ শহরে নবাগত প্রত্যেকেই সংবাদ লইয়া আসিত যে পর্ত্তুগীজদের বেসীন শহরে আক্রমণ করিবার জন্য এক বৃহৎ মারাঠা সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিয়া শিবাজী যেন একটা উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। কারণ স্বরূপ তাহারা বলিত, "শিবাজী কি প্রকাশ্যে বড়াই করিয়া বলেন নাই যে শীঘ্রই তিনি গোয়া আক্রমণ করিয়া এই শহরের স্বর্ণমণ্ডিত গির্জাগুলি লুঠ করিবেন?" পশ্চিম ভারতের পান্থনিবাস বা সরাইখানায় প্রতি রাজনীতি বিশারদই শিবাজীর এই বেপরোয়া আক্রমণের সম্ভাবনার বেশ আমোদ অনুভব করিত। তাহাদের ধারণা যে মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি এখন পর্ত্তুগীজদিগকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একমাত্র সুরাটের ইংরাজ কুঠির প্রধান শাসন কর্ত্তা শিবাজী কর্ত্তৃক পর্ত্তুগীজদের

---

(১) থিবেনো (Thevenot)

এলাকা আক্রমণের বহু বিজ্ঞাপিত ঘোষণার সম্বন্ধে সন্দিহান হন। বাণিজ্যে অভিজ্ঞ এই বিচক্ষণ ব্যবসায়ী লেখেন, "যে স্থান এত দৃঢ়রূপে বহিরাক্রমনের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত উহা যে শিবাজী আক্রমণ করিবেন ইহা আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। পূর্ব্বাপর চিরকালই তিনি "চলতি ভোজসভা" লুণ্ঠনের নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন।" কিন্তু অন্যকেহ এইরূপ দূরদর্শী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। শিবাজী যে অবিলম্বে পর্ত্তুগীজদের আক্রমণ করিবেন এই বিষয়ে সাধারণ লোকের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া ভিখারী নিশ্চয়ই মৃদু হাস্য করিয়া থাকিবে।

ভিখারী উপকূলের পথ দিয়া পুনরায় ফিরিতে লাগিলেন এবং যেদিন শিবাজী তাহার শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন ঐদিন হইতে তাহাকে আর দেখা গেল না। ঐ ঘটনার কয়েক রাত্রি পরে চারিহাজার অশ্বারোহী-সৈন্য সহ শিবাজী গোপনে শিবির হইতে বাহির হইয়া গেলেন। শিবাজীর শিবির ত্যাগ করার ব্যাপারটা এমন গোপন ছিল যে কেবল যে কয়টি বাছাই করা উচ্চ কর্ম্মচারীকে উহা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিতে শপথ করাইয়াছিলেন তাহারা ভিন্ন এই ব্যাপার আর কেহ জানিত না। অশ্বপৃষ্ঠে মুঘল সাম্রাজ্যের এলাকা নির্ব্বিরোধে দ্রুত অতিক্রম করিয়া তাঁহার শিবির ত্যাগ করার ঘটনা প্রকাশ হইবার কয়েকদিন পরে তিনি সুরাট শহর হইতে কিছু দূরে আবির্ভূত হইলেন।

১৬৬৪ সালের ৫ই জানুয়ারী মঙ্গলবার সুরাটের অধিবাসীরা নিদ্রাভঙ্গে জানিতে পারে যে শহর হইতে দশ মাইল দূরে শিবাজী শিবির স্থাপন করিয়াছেন। তাহাকে প্রতিরোধ করার মত কোন সৈন্যবাহিনী শহরে ছিল না। সুরাটে ছিল জাঁকাল পোষাক পরিহিত একদল প্রহরীমাত্র। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র অপেক্ষা গভর্নরের দরবারের আনুষ্ঠানিক সমারোহ সমূহে উপস্থিত থাকিতেই অধিকতর অভ্যস্ত ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের মূল সমর বাহিনী মরাঠাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে ভাবিয়া দক্ষিণপূর্ব্ব অঞ্চলে শতাধিক মাইল দূরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল।

সুরাটের গভর্নর শিবাজীর সহিত সন্ধি করার উদ্দেশে এক দূত পাঠাইলেন। কিন্তু মারাঠারা দূতকে ফেরত পাঠাইয়াছে ও শিবির গুটাইয়া শহরের দিকে অগ্রসর হইতেছে এই সংবাদ পাইয়া তিনি আর মাথা

ঠিক রাখিতে পারিলেন না। তিনি দুর্গরুদ্ধ করিয়া প্রহরী ও স্বীয় ভৃত্যগণ সহ উহার মধ্যে আশ্রয় লইলেন। সুরাট নগর মারাঠাদিগের অনুকম্পার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। শিবাজীর অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনী ব্যক্তিদিগের গৃহে ভীতি বিরাজ করিতে লাগিল। বহুবর্ষের সঞ্চিত ধনদৌলত মাটির নীচে পুতিবার অথবা অন্যভাবে গোপন করিবার কিছু কিছু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। দরিদ্র লোকেরা তাহাদের সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া কোনরূপে মাছধরার নৌকা কিংবা শালতির ডিঙি নৌকায় উঠিয়া ভাঁটার অভিমুখে নৌকা চালাইয়া পালাইল। কেহ কেহ বা নিকটস্থ গ্রাম কিংবা বনে জঙ্গলে বিক্ষিপ্ত হইয়া আশ্রয় লইল।

শিবাজী সুরাট নগরীর প্রাচীরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। সৈন্যদিগেকে থামিতে বলিয়া তিনি গভর্ণরের নিকট এক চরম পত্র পাঠান। শিবাজী প্রস্তাব করেন যে যদি সর্ব্বাপেক্ষা ধনী তিনজন মুসলমান শ্রেষ্ঠী তাঁহার শিবিরে আসিয়া তাঁহাদের ও সুরাটের অন্যান্য অধিবাসীদের মুক্তির বিনিময়ে উপযুক্ত অর্থ প্রদান করেন তবে তিনি এই শহরকে লুঠ হইতে অব্যাহতি দিবেন। এই প্রস্তাব বেশ সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু গভর্ণর এত ভীত হইয়াছিলেন যে এ বিষয়ে বিবেচনা করার তাহার শক্তি লোপ পাইয়াছিল। অথবা তিনি হয়ত এই ভাবিয়া নিজকে সান্ত্বনা দেন যে শহরে যাহাই ঘটুক না কেন তিনি দুর্গের প্রাচীরের অভ্যন্তরে নিরাপদেই থাকিবেন। তাহার প্রস্তাবের কোন উত্তর না পাওয়ায় নগরের সিংহদ্বার সজোরে কিন্তু বিনা আয়াসে খুলিয়া ফেলিয়া ৬ই জানুয়ারী বুধবার দ্বিপ্রহরে মুক্ত অসি হস্তে শিবাজী সুরাট নগরীতে প্রবেশ করেন।

সুরাটের শাসন কর্ত্তৃপক্ষ নিয়মিত প্রথানুযায়ী শিবাজীর বশ্যতা স্বীকার কিংবা তাহার নিকট আত্মসমর্পন না করায় শিবাজী তাঁহার সৈন্যদিগকে প্রায় জনশুন্য সুরাট নগরী লুণ্ঠনের অনুমতি দেন। একমাত্র ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকেরা মারাঠা দিগকে বাধা দেয়। তাহারা নিজ নিজ কুঠি রুদ্ধ করিয়া রাখে ও মারাঠাদিগের উহার ভিতরে ঢুকিতে দিতে অসম্মত হয়। বিশেষতঃ ইংরাজেরা "অদ্‌ভূত সাহস প্রদর্শন করে। তাহারা শুধ নিজেদের ঘর বাড়ী রক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই;

প্রতিবেশীদের বাড়ী ঘরও রক্ষা করে।(১) এমন কি তাহারা ধনী মুসলমান ব্যবসায়ী সৈয়দ বেগকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করে। শিবাজী যে তিনজন ধনী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে সুরাট বন্দর লুঠ না করার জন্য খেসারত দাবি করিয়াছিলেন সৈয়দ বেগ হইলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইংরাজেরা তাঁহার বাড়ীর চারিদিকে বন্দুকধারী সৈনিক দিয়া পাহারার ব্যবস্থা করে এবং মারাঠারা তাহার বাড়ী আক্রমণ করিলে ইংরাজ সৈন্যদিগকে গুলি চালাইবার হুকুম দেওয়া হয়। তাঁহার সৈন্যদিগকে বাধা না দেওযার জন্য শিবাজী তৎক্ষণাৎ ইংরাজদিগের নিকট সংবাদ পাঠান। কিন্তু ইংরাজ কোম্পানীর স্থানীয় সভাপতি মনে করেন যে ইংরাজ জাতির চরিত্র অনুযায়ী তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষাব জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। তিনি তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্যদলকে লইয় ভেরী বাদ্যের সহ মারাঠাদের সম্মুখীন হইয়া শিবাজীর মুখের উপর বলেন, "আমরা আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত এবং কিছুতেই পশ্চাদপৎ হইব না।"

ইংরাজকুঠির সভাপতির এই সাহসের প্রশংসা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। "নিজের ও তাঁহার অধীনস্থ কুঠিয়ালদের প্রতিরক্ষার জন্য তিনি এত সাহস প্রদর্শন করেন যে মুঘল সম্রাট তাঁহাকে একটি শিরোপা ও আপাদমস্তক পরিধানের উপযুক্ত রাজকীয় সম্মানের প্রতীকস্বরূপ এক পোশাক উপহার দেন। ইহা ছাড়া সম্রাটের আদেশে ইংরাজ কোম্পানীর দেয় শুল্ক শতকরা মাত্র আড়াই টাকায় সাব্যস্ত করা হয়। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাহার সাহসিক কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বর্ণপদক উপহার দেন। উহাতে লেখা থাকে "সম্পত্তি অর্জন করিতে যেমন সাহসের প্রয়োজন উহা রক্ষা করিতে তেমনই সাহসের প্রয়োজন হয়।"(২)

শিবাজী স্বয়ং এই বিদেশী বণিকদের সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়া চমৎকৃত হন। ইহার পরে তাঁহার সৈন্যরা ইংরাজদিগকে পুনরায় আক্রমণ করে নাই। কিন্তু ভারতীয় শ্রেষ্ঠীদের মধ্যে যাহারা পলায়ন

(১) বার্ণিয়ার
(২) Fryer

করিতে পারে নাই বা যাহারা ইংরাজ কুঠিয়ালদের মত বিশস্ত ও সাহসী মিত্রপক্ষের সাহায্য পায় নাই তাহাদের দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না। কিন্তু ইহার মধ্যেও অবশ্য শিবাজীর স্বাভাবিক দয়ার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক ও মিসনারীদের বাড়ী ঘরের কোন ক্ষতি করা হয় নাই। শিবাজী তাহার সৈন্যদিগকে বলেন "ফিরিঙ্গী পাদ্রীরা লোক ভাল, উহাদের উপর কোন অত্যাচার করিও না।" একজন ফরাসী মিশনারী শিবাজীর নিকট উপস্থিত হন ও তাহার ভৃত্যগণের মধ্যে তিনি যেসব লোককে ধর্ম্মান্তরিত করিয়াছেন তাহাদের কোন অনিষ্ট না করিতে অনুরোধ করেন। শিবাজী খুব ভদ্রভাবে তাহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং এক ঘোষণাপত্রে ফাদার অ্যামব্রেসের (Father Ambrase) খৃষ্টান অনুচরদিগকে লুণ্ঠন হইতে রেহাই দেওয়ার আদেশ দেন। এতদ্ব্যতীত জনৈক বিত্তশালী শ্রেষ্ঠী খৃষ্টান মিশনারীদিগের প্রতি সদয় ছিলেন এবং সারা বৎসর তাহাদের আহারের জন্য চাউল, মাখন, শাক সবজি, প্রভৃতি দিয়াছেন শুনিয়া শিবাজী তাঁহার বাড়ীঘর রক্ষা করার জন্য সৈন্য পাঠান এবং ঐ ব্যক্তির বা তাঁহার সম্পত্তির যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় তাহার ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু ইহা সত্য যে সুরাট শহর তন্ন তন্ন করিয়া লুণ্ঠন করা হয়। বুধবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত বাড়ী ঘর কারখানা, দোকান প্রভৃতি একের পর এক খুব নিয়ম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে লুণ্ঠন করা হয়। সম্ভবতঃ মারাঠা গুণ্ডাদলের ও নগরীর দুর্গমধ্যস্থ সৈন্যদের মধ্যে বেপরোয়া গুলিচলাচলের ফলে অনেক বাড়ীতে আগুন লাগিয়া যায়। ইহাও সম্ভব যে দুর্গমধ্যস্থ গোলন্দাজ সৈন্যদের দ্বারা মাঝে মাঝে হঠাৎ আক্রমণকারীদের উপর ব্যর্থ গুলিচালনার ফলে শত্রুপক্ষের কোন ক্ষতি না হইয়া বরং গ্রামবাসীদের সম্পত্তির সমূহ ক্ষতি হয়। বাস্তবিক মারাঠাদের পূর্ব্বকল্পিত ধ্বংসাত্মক কার্য্যে শহর বসীদের যত না ক্ষতি হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী তি হয় নগর রক্ষীদের এলোমেলো গুলি করার ফলে। শুক্রবারের মধ্যে শহরের দুই তৃতীয়াংশ আগুনে পুড়িয়া যায়। স্থানীয় গির্জায় ইংরাজ ধর্ম্মযাজক লিখিয়াছেন, "প্রজ্বলিত আগুনের আলোকে রাত্রির দৃশ্য দিনের মত হইয়া যায়; আবার কিছুকাল

পূর্ব্বে দিনের বেলায় ঘন ধোঁয়া বিরাট মেঘের ন্যায় সূর্য্যকে একেবারে ঢাকিয়া দিয়া দিনকে প্রায় রাতে পরিনত করিয়াছিল।

গভর্ণরের তাড়াহুড়া করিয়া দুর্গে ঢুকিবার সময় অনেক মুঘলসৈন্য বাহিরে রহিয়া যায়। তাহাদিগকে বন্দী করা হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক জঘন্য ঘটনার ফলে নগর লুণ্ঠন প্রায় সার্ব্বজনীক নরহত্যায় পরিণত হয়। দুর্ব্বলচিত্ত মুঘল গভর্ণর দুইদিন দুর্গের মধ্যে বিষণ্ণভাবে কাটাইবার পর শিবাজীকে হত্যা করিবার জন্য এক যুবক সেনাপতিকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। গভর্ণর শিবাজীর নিকট দুর্গসমর্পন করিবার উদ্দেশ্যে ইহাকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন এই মিথ্যা পরিচয়ে সে শিবাজীর সহিত সাক্ষাত প্রার্থী হয়। শিবাজীর কিন্তু এই বিষয়ে খুব উৎসাহ ছিলনা, কারণ এই নগর দখল করার তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিলনা। দুর্গ আক্রমণ করা বা উহা নিজের আয়ত্বে রাখিবর জন্য সৈন্য ক্ষয় করার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন নাই। কিন্তু যুবক সেনাপতি সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করায় তিনি তাহার সহিত দেখা করিতে সম্মত হন। শায়েস্তা খাঁ যে শিবাজীকে কাপুরুষ বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ এই কথা মনে পড়ায় শিবাজী গভর্ণরের দূতকে অনুরূপ ভাষায় সম্বর্দ্ধিত করিয়া বলেন, "আপনার মনিব তো বাড়ীর ভিতরের সলজ্জ বালিকার মত লুকাইয়া আছেন।" মুসলমান যুবকের অবশ্য এই দৌত্যকার্য্য বিশেষ মনঃপুত ছিলনা। রাগের মাথায় সে বিড়বিড় করিয়া বলিয়া ফেলিল, "আমরা সকলেই স্ত্রীলোক নহি।" কিন্তু ইহার পরেও শিবাজী তাহার প্রতি বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য বর্ষণ করায় সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ছোরা বাহির করিয়া শিবাজীকে আক্রমণ করে। মারাঠা প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার হাত হইতে ছোরা কাড়িয়া লয়। কিন্তু তাহার আক্রমণের জোর এত বেশী ছিল যে সে শিবাজীকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলে এবং দুইজনে মাটির উপর গড়াইয়া পড়িল। প্রহরীরা উভয়ের শরীরের উপর দাঁড়াইয়া মুসলমান যুবকের পাগড়ির ভিতর লুক্কায়িত লোহার শিরস্ত্রানের উপর কঠোর আঘাত করিয়া তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া দেয়।

কিন্তু শিবাজী নিহত হইয়াছেন এই গুজব সহসা মারাঠা শিবির

সমূহে বিদ্যুৎবেগে ছড়াইয়া পরে। চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিশোধ লওয়ার জন্য উচ্চরবে চীৎকার হইতে লাগিল, উন্মত্ত অবস্থায় মারাঠারা প্রতিহিংসা দাবি করিয়া পাইকারী ভাবে শত্রুহত্যা আরম্ভ করে। শিবাজীর পরিচ্ছদ তখনও রক্তরঞ্জিত। এই অবস্থায় তিনি কোনরূপে টলিতে টলিতে উঠিয়া নিজ শিবিরের দিকে অগ্রসর হন এবং তাঁহার অনুচরদিগেকে উচ্চৈস্বরে বলেন যে তিনি বাঁচিয়া আছেন। শিবাজী সকলকে নিজ নিজ কাজে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দেন। কিন্তু তাঁহার ঐন্দ্রজালিক কণ্ঠস্বরও ঐদিন বিফল হইবে মনে হইল। তিনি বন্দীদিগের প্রতি সমুচিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে তাঁহার সৈন্যদের ক্রোধ কিঞ্চিৎ উপশম হয়। তিনি আদেশ দেন যে চারিজন মুঘল বন্দীর শিরচ্ছেদ ও অন্য বন্দীদের মধ্যে চব্বিশ-জনের হস্তচ্ছেদ করা হউক। ইহা বলা আবশ্যক যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের মধ্যে ছিলেন একজন ইংরাজ। মুঘল সৈন্যদের সহিত তাহাকেও বন্দী করা হইয়াছিল। টুপি খুলিয়া তিনি নিজ জাতিত্বের পরিচয় দিলে শিবাজী (যদিও বিদেশী বণিকদিগের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে ও অন্যায় ভাবে আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় তাঁহার উত্তেজিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল) তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তি দেন ও সঙ্গে লোক দিয়া তাহাকে ইংরাজ কুঠিতে পোঁছাইয়াদেন। এইরূপ সদয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্বত্বেও নির্দ্দোষ ব্যক্তিদের একটি মাত্র বিশ্বাসঘাতকার কাজের জন্য যেরূপ কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় উহা বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশীয় অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়ে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থার তুলনায় অন্য-বশ্যক নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে এই প্রকারের একটা সহজ লক্ষণীয় বা এমনকি রোমাঞ্চকর এবং নাটকীয় প্রতিহিংসার ব্যবস্থা দ্বারাই হয়তো মারাঠাদের মধ্যে দুর্দ্দান্ত গুণ্ডাশ্রেণীর ক্রুদ্ধ ও বর্ব্বরোচিত বিস্ফোরণ বন্ধ করা সম্ভব হইয়াছিল। অনুরূপ ক্ষেত্রে মারাঠাদের উত্তরভারতে অভিযানের সময় নানা পোষাকে সজ্জিত হিন্দু উপজাতীয় লোকেরা দলে দলে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া "মুক্তিদাতার" পতাকার নেতৃত্বে যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত ছিল।

রবিবার সকালে সংবাদ আসে যে একদল মুঘল বাহিনী সরাট

উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইতেছে। মারাঠারা ইতিমধ্যে লুণ্ঠিত দ্রব্য সমূহ গুছাইয়া ফেলিয়াছে। লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমান অতি বৃহৎ। কাফি খাঁ অভিযোগের সুরে লিখিয়াছেন "দুষ্ট ও শয়তান শিবাজীর আয়ত্বে লক্ষ লক্ষ টাকা ও বহুমূল্য দ্রব্য সঞ্চিত হইল"। মারাঠারা ঘোড়ার পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া কাশ্মীর ও আহমদাবাদে প্রস্তুত নানা প্রকারের বস্ত্র এবং অজস্র সোনা, রূপা, মুক্তা, হীরা ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া চলিল। মুঘল সৈন্যবাহিনী এড়াইয়া তাহাদের স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে মারাঠারা উপকূল বাহিয়া শিবাজীর রাজধানী রায়গড় অভিমুখে রওনা হইল।

মুঘল বাহিনীর অগ্রভাগ সুরাট নগরে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত গভর্ণর দুর্গের বাহিরে আসিতে সাহস করেন নাই তিনি বাহির হইয়া আসিলে চারিদিকে হইতে লোকে তাহার উপর গালি গালাজ, অভিশাপ ও অপমানজনক মন্তব্য বর্ষণ করিতে লাগিল। মারাঠাদের ভয়ে কম্পিত কিন্তু নিরস্ত্র বণিকদের শাসাইতে ওস্তাদ গভর্ণরের পুত্র বন্দুক তুলিয়া নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের মধ্যে একজনকে মারিয়া ফেলে। ইহাতে নাগরিকদের পক্ষ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি নবাগত মুঘল সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট গভর্ণরের বিরুদ্ধে নালিশ করেন এবং ইংরাজদিগের বীরত্বের প্রশংসা করিয়া বলেন যে সুরাট বন্দর লুণ্ঠনের সময় মুঘল রাজকর্ম্মচারিগনের কাপুরুষতার সহিত তুলনায় ইংরেজদের আচরণের বৈশিষ্ট্য খুবই লক্ষণীয় ছিল। ইংরাজ কুঠির সভাপতিকে পুরস্কৃত করিবার জন্য তাঁহারা সেনাপতিকে অনুরোধ করেন।

স্যার জর্জ অক্সিণ্ডানের (Oxindor) সহিত সাক্ষাত করিয়া মুঘল সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে একটি সোনার কাজকরা জামা, একটি অশ্ব ও একখানা তরবারী উপহার দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু অক্সিণ্ডন ছিলেন পরবর্ত্তীযুগের বিজয়দর্পী বিলাসী ও দাম্ভিক ইংরাজদের অপেক্ষা অনেক নম্র ও সরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি এই সব দামী উপহার লইতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া বলেন, "এই সব দামী জিনিষ সৈনিকদের পক্ষেই শোভা পায়; আমরা বণিক মাত্র।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সুরাটে সংঘটিত সংবাদ শুনিয়া বাদশাহ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। দরবেশ এবং উলেমারা প্রকাশ্যে অনুতাপ করিয়া বলিতে লাগিল যে পবিত্র নগরীতে ভক্ত হজ যাত্রীগণ এত ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন এবং যে শহর পবিত্র তীর্থযাত্রা এবং মক্কার দ্বার রূপে ব্যবহৃত হয় তাহারই মধ্যে কিনা এক কাফের এত সহজে প্রবেশ করিয়া তাহার সবিধামত নগর লণ্ঠন করিয়া গেল। শায়েস্তা খাঁর পত্নীর প্ররোচনায় প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ মহিলারাও শোকে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গে ক্রমে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শায়েস্তাখাঁর পত্নীর সহিত শাহজাদী রোষণারা বেগমের ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। স্বামীর সহিত বাঙলা দেশে না গিয়া তিনি রাজধানীতেই বাস করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই যে হিন্দু বিদ্রোহী তাঁহার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে ও স্বামীকে অত্যন্ত অপমানিত লাঞ্ছিত করিয়াছে তাহার প্রতি সম্রাটের ক্রোধ ও বিদ্বেষ প্রজ্বলিত করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

সম্রাট নির্জন কক্ষে প্রায়ই দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন; আর এদিকে দূত মারফৎ প্রায়ই নব নব দুঃসংবাদ আসিতে লাগিল। শাহজাদা মুয়াজ্জম সুরাট রক্ষা করিতে বা শিবাজীর প্রত্যাবর্ত্তনের বাধা দিতে পারেন নাই। কিন্তু পিতার তিরস্কারে উত্তেজিত হইয়া তিনি কোনরূপে এবড়ো খেবড়ো ভাবে মারাঠাদের অধিকৃত দেশ আক্রমণ করেন; কিন্তু সিংঘাদ দুর্গ আক্রমণ কালে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার না ছিল যুদ্ধে কোনরূপ উৎসাহ অথবা অভিযানের কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা। শিকার বা পোলো খেলার পর যেটুকু সময় থাকিত তিনি তখন সামরিক জীবনের অসুবিধার সম্বন্ধে নানারূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। মারাঠাদের নিকট একবার প্রতিহত হইয়া তিনি আর দ্বিতীয়বার অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন নাই। পরন্ত অনিশ্চিতভাবে সীমান্তের চারিপাশে উদ্দেশ্যহীন ভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বর্ষা আরম্ভ হইলে গুরুভার অস্ত্রে সজ্জিত তাঁহার সমর বাহিনী অকর্ম্মণ্য ও যুদ্ধের গোলাবারুদ প্রভৃতি সাজসরঞ্জাম এক বোঝা

হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বর্ষায় লঘুভার অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত শিবাজীর অশ্বারোহী সৈন্যদের কোনই ক্ষতি হইল না। ১৬৬৪ সালের সমস্ত বর্ষাকাল ব্যাপী শিবাজী মুঘল এলাকা বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। কখনও বা তিনি মুঘল দিগকে পশ্চাত হইতে আক্রমণ করিতেন। বাস্তবিক সহরের পর সহর শিবাজীর আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। জনৈক ইংরাজ লিখিয়াছেন, "শিবাজী ও তাঁহার অনুচর বর্গ সমস্ত দেশে অবাধে ছড়াইয়া পড়ে এবং অগ্নি ও তরবারি দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্য্য চালাইতে থাকে।"

মুঘল দিগের মনে হইতে লাগিল যে এই শত্রু যেন একই সময়ে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছে এবং যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। বাস্তবিক মুঘলেরা খুবই অসহায় বোধ করিতে লাগিল। শত্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে কোনরূপ ধারনা পোষণ করা একরকম অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাহার আঘাত এতই আকস্মিক ও দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল যে উহা প্রতিহত করার সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হইল। মুঘলেরা দুর্গাদিতে অধিক সৈন্য সরবরাহ করিয়া সামরিক ব্যবস্থা দৃঢ়তর করা সত্ত্বেও মারাঠাদের সর্ব্বগ্রাসী আক্রমণের ফলে মুঘলের সমর বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। মুঘলের মূল ঘাঁটী হইতে দূরে এবং সীমান্তে অবস্থিত দূর্গে নূতন নূতন সৈন্যদল প্রেরিত হইল, কিন্তু সামান্য কাল পরে সেই সব স্থানে ধূম মিশ্রিত ধ্বংশাবশেষ এবং পরিত্যক্ত কয়েকটি কামান ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইত না।

জনৈক ইংরাজ কুঠিয়াল লিখিয়াছেন "শিবাজী হইলেন অত্যন্ত কর্ম্ম-তৎপর ও পরিশ্রমী ব্যক্তি। তিনি অদ্ভুত কষ্ট সাধ্য কার্য্য সমূহ নিজে সম্পন্ন করেন ও তাঁহার প্রধান সহকর্ম্মীদের নিকট হইতে অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত কাজ আদায় করেন।" গরিলা যুদ্ধের নেতা হিসাবে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁহার সুকৌশল যুদ্ধ প্রণালী দেখিয়া মুঘলেরা দিশাহারা হইয়া যাইত। কাজেই মারাঠাদের অধিকৃত দেশ দখল করা দূরের কথা তাহারা বাদশাহের সাম্রাজ্যে মারাঠাদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন বন্ধ করিতে পারিল না। ফলে সমগ্র দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল।

বিজাপুর রাজ্যের অধীনস্থ মুসলমান ভূম্যধিকারিদের মধ্যে কেহ কেহ

শিবাজীর আক্রমণের ফলে বিশৃঙ্খলাজনিত অবস্থার সুযোগ লইয়া মারাঠাদের বিজিত অঞ্চলে লুণ্ঠন কার্য্য চালাইতে লাগিল। রুস্তম নামে ইহাদের একজনের সম্বন্ধে ইংরাজ কুঠিয়ালেরা লিখিয়াছেন, "এই ব্যক্তি লুণ্ঠনের মধুর আস্বাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, শীঘ্রই ইহা তাহার অভ্যাসে পরিণত হইবে।"

মুঘল সাম্রাজ্যের শাসকদের মধ্যে গতানুগতিক পথে না চলিয়া শিবাজী রাজ্য সুরক্ষণে নৌবলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পশ্চিম ভারতে বিদেশীয় উপনিবেশ গুলির সমৃদ্ধি ও প্রসার যে প্রধানতঃ নৌবলের উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা তিনি সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নূতন যন্ত্ররূপে তিনি একটি নৌশক্তি গঠন করিতে আরম্ভ করেন।

তখনকার দিনে নাবিক পাওয়া খুব সহজ ছিল না। তাল তমাল ও ঈষৎ সাদা ও বাদামী রঙের নারিকেল গাছগুলি বাতাসে উপকূলস্থ ভূমির দিকে হেলিয়া থাকিত। উহারই মধ্যে খড়ের ঘর সমন্বিত গ্রাম সমূহে মৎসজীবিরা বাস করিত। ইহারা মারাঠাদেরই মত হিন্দুদের এক জাতি। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ইহারা নাবিক বৃত্তিতে অভ্যস্ত ছিল। তাহাদের পরিচালিত নৌকাগুলির গঠন প্রণালীতে এমন কিছু কারুকার্য্য ছিল না। শুধু মাথার দিকে সামান্য কিছু ভাস্কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু ঐ তরণীর নাবিকেরা সমুদ্রের তুফান বা আরব দিগের জাহাজ কোন কিছুতেই ভয় পাইত না। পরন্তু জোয়ার-ভাঁটা, স্রোতের গতি এবং খাল ও নদনদীতে পূর্ণ ঐ উপকূলের প্রতিটি মাইলের সহিত ছিল তাহাদের নিবিড় পরিচয়। একটি নৌবাহিনীর প্রথম কেন্দ্ররূপে সংগঠিত হওয়ায় ইহারা শীঘ্রই মুঘল বণিকদেব পরম ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

মককায় হজ্ যাত্রা একটা দুঃসাহসিক ও বিপজনক অভিযানে পরিণত হইল। মুঘল জাহাজ সমুদ্রে চলিতে থাকার সময় যাত্রীরা নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে উজ্বল গৈরিকবর্ণের প্রকাণ্ড ত্রিকোণ পালের নীচে মারাঠাদের তীক্ষ্ম ও তীব্রগতি জাহাজ-নৌকাগুলির গতিবিধি নির্ণয় করিবার জন্য সর্ব্বদা দিগন্তের প্রতি তাকাইয়া থাকিত।

নৌবল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মরাঠাদের বাণিজ্য প্রসারের স্পৃহা এবং

উদ্যমও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইতি পূর্ব্বেই ১৬৬৩ সালে শিবাজী আরবদেশে দুইটি বাণিজ্য তরী পাঠান। ইংরাজ দিগের পুঁথিপত্রে দেখা যায় যে দুই বৎসর পরে শিবাজী পারস্য, ইরাক ও আরবদেশের নয়টি প্রধান বন্দরে প্রতি বৎসর দুইটি করিয়া বাণিজ্যপোত পাঠাইতেন। স্বাভাবিক দূর দৃষ্টিতে শিবাজী যুদ্ধ অভিযানে নৌবলের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। নৌবলের সুযোগে তিনি সমর বাহিনীর গতি সুচারুরূপে পরিচালনা করিতেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম তিনি তাঁহার সমগ্র সক্রিয় বাহিনী ৮৫টি ক্ষদ্র রণতরীর ও তিনিটি বৃহৎ বাণিজ্যপোতে সমুদ্রের উপকূল বাহিয়া সহসা তীরে নামাইয়া দেন ও শত্রুদের উপর আকস্মিক আক্রমণ করেন।

নৌবল গঠনে উৎসাহ প্রকাশ করিলেও একথা স্বীকার্য্য যে শিবাজী আসলে ছিলেন পাহাড়িয়া যোদ্ধা। নৌবলের প্রতি প্রকৃতি বা ঐতিহ্য গত তাঁহার কোন আসক্তি ছিল না। সমসাময়িক ইউরোপীয় রণতরীর মাণদণ্ড অনুসারে তাঁহার জাহাজগুলি অতন্ত নিম্ন পর্য্যায়ে স্থান পাইত। একজন পদস্থ ইংরাজ নৌসেনাপতি "ঐ জাহাজগুলি অতিশয় নগণ্য" বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। "বাস্তবিক ইংরাজদের একটি উচচ-স্তরের জাহাজ শিবাজীর একশত জাহাজ হেলায় বিনষ্ট করিতে পারিত।" কিন্তু "ঐ লঘুভার জাহাজগুলি সহজেই সমদ্রকূলে আশ্রয় লইতে পারিত এবং সংখ্যাধিক্য বশতঃ তাহারা বেশ সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, যদিও গোলাবারুদ সম্পর্কে বা মধ্য সমুদ্রে সহজ গতিবিধির পক্ষে তাহাদের অনেক ক্রটি ছিল।" (১)

মারাঠাও ইংরাজদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য একমাত্র যুদ্ধ হয় ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর। সাই নায়ে নামক একজন মারাঠি নৌসেনা-পতির নেতৃত্বে দেড়শত সৈন্য বোম্বাইয়ের নিকট খান্দেরী নামক স্থানে

---

(১) ইনি আরও লিখিয়াছের যে শিবাজী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নৌ-বাহিনী পরিচালন করিতে চাহিতেন। কিন্ত তাহার শারীরিক ধাতে সমুদ্র যাত্রার ব্যাঘাত ঘটাইত কারণ তিনি বমনোদ্রোকে কষ্ট পাইতেন।

অবতরণ করে। ইংরাজেরা ইহাতে শঙ্কিত হইয়া উহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানে ত্যাগ করিতে বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয় দেখাইয়া বলে যে "মারাঠারা চলিয়া না গেলে ইংরাজরা তাহাদিগকে প্রকাশ্য শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিবে ও বল প্রয়োগ করিয়া ওখান হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিবে।" এই নৌযুদ্ধ একরূপ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় বটে; তবে ইহা সত্য যে ইংরাজদের মাত্র আটখানা জাহাজ ও মারাঠাদের ষাটখানা জাহাজ থাকা সত্ত্বেও মারাঠারাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ইংরাজেরা একখানা জাহাজ হারায়। ঐ জাহাজের সেনাপতি মাতাল অবস্থায় লোকজন সহ উপকূল ভূমিতে অবতরণ করে। মারাঠাদের সহিত সংঘর্ষনে ছয় জন সৈন্য সহ সে নিহত হয়। অন্যান্য সৈন্যদিগকে বন্দী করিয়া মারাঠারা ঐ জাহাজ গ্রেপ্তার করে।(১) এই নৌযুদ্ধের সময় প্রথম মনে হয় যে মারাঠাদের জাহাজের সংখ্যাধিক্যের জন্য ইংরাজদের উন্নততর কামান ও অস্ত্র শস্ত্র থাকিলেও মারাঠারাই জয়ী হইবে। যুদ্ধারম্ভের আধঘণ্টার মধ্যে সার্জেণ্ট মৌলেভারার (Mauleverer) পরিচালিত "ডোভার" নামক একখানা ইংরাজ জাহাজে উঠিয়া মারাঠারা উহার পতাকা অপসৃত করে। পাঁচখানা ইংরাজ জাহাজ বোম্বাইয়ের দিকে দ্রুত পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু "রিভেঞ্জ" বা "প্রতিশোধ" নামক একটি জাহাজ তাহার নামের উপযোগিতা প্রমাণ করিয়া সমগ্র মারাঠা নৌবাহিনীকে প্রতিরোধ করে ও কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া শত্রুপক্ষের পাঁচখানা জাহাজ সমাধিস্থ করে। ফলে "রিভেঞ্জ" রণতরীর বিজয় মানিয়া লইয়া মারাঠারা পলায়ণ করে।

ইংরাজদের জয় আরও সম্পূর্ণ না হওয়ায় সুরাট কুঠির কর্ত্তৃপক্ষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাহারা সার্জেণ্ট মৌলভারায়ের কার্য্যের তীব্র তিরস্কার করিয়া বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট লেখেন, "যুদ্ধের সময় ইহারা কিরূপ কাপুরুষের মত ব্যবহার করিয়াছে ইহা সম্যক বিবেচনা করিয়া আমরা তাহাদের নাম নৌবাহিনীর তালিকা হইতে অপসৃত করিলাম। তবে

(১) ওর্ম্ম

তাহাদের যাহাতে অনাহারে মরিতে না হয় এই নিমিত্ত আমরা তাহাদের জন্য সামান্য ভাতা বরাদ্দ করিয়াছি।"

এই নৌযুদ্ধে জয়লাভ করা সত্ত্বেও ইংরাজগণ মারাঠাদিগকে খান্দেরী হইতে বহিস্কৃত করিতে সমর্থ হইলেন না। সুরাট কৌন্সিল এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে "আমাদের সমস্ত পরিকল্পিত চেষ্টা সত্ত্বেও মারাঠারা নানা রকমের উপায় উদ্‌ভাবন করিয়া এই দ্বীপে দুর্গাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শক্তি সঞ্চয় করিয়া এখানে রসদ সংগ্রহ করিয়াছে।" সমুদ্রপথে চাপ দিয়া বোম্বাই সহরের উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে অসমর্থ হইলেও শিবাজী স্থলপথে বোম্বাই আক্রমণ করিবার ভয় দেখাইয়া ইংরাজদিগকে সন্ত্রস্ত করিতে লাগিলেন এবং চারিহাজার মারাঠা সৈন্য বোম্বাইয়ের সীমান্তে মোতায়েন করেন। এই অবস্থায় সুরাট কৌন্সিল স্থির করেন যে "সময় মত আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া ওখান হইতে অপসরণ করাই শ্রেয়।" তাঁহারা শিবাজীর বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ করিয়া তাঁহার নিকট এক চিঠিতে লেখেন, "শিবাজীর ন্যায় বিশিষ্ট ও বহু গুণালঙ্কৃত রাজার পক্ষে এইরূপ ভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা অত্যন্ত অন্যায় ও অশোভন। তবুও আমাদের অকপট ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের প্রমাণ স্বরূপ আমরা অতীতের অপ্রিয় কাহিনী উপেক্ষা করিতে ও ভুলিতে প্রস্তুত।" অতঃপর ইংরাজদিগের নৌবলে শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও খান্দেরী দ্বীপ মারাঠাদের দখলেই রহিল।" (১)

সামুদ্রিক অভিযানে কেবল মাত্র ইংরাজগণই যে মারাঠাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এমন নহে। জানজিরা (Janjira) দ্বীপের হাবসী জলদস্যুরাও তাহাদের রক্ষিত অংশ সমূহে মারাঠাদের সমস্ত আক্রমণ

(১) ইহা মনে রাখা উচিত যে জলপথে মারামারির আনুষঙ্গিক একটা ঘটনা দ্বারা উভয় পক্ষে যে সত্যই যুদ্ধ হইয়াছিল ইহা প্রমাণিত হয়না, যেমন পরবর্ত্তী শতাব্দীতে আমেরিকার ইংরাজ ও ফরাসী ঔপনিবেশিকদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটিতে এই দুই পক্ষের গভর্ণমেন্টও যে সর্ব্বদাই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন ইহারও কোন প্রমাণ নাই।

প্রতিহত করে। অত্যন্ত সহিষ্ণুতার সহিত শিবাজী নিয়মিতরূপে বহুকাল যাবত জাঞ্জিরা ও দণ্ডরাজপুরীর দুর্গের উপর সুগঠিত অভিযান পরিচালনা করেন। "যতই ক্ষতি হউক না কেন এই দুর্গ দখল করিতেই হইবে"। এইরূপ মনোভাব লইয়া তিনি ভাসমান কামান প্রস্তুত করেন, তীরভূমি হইতে জাঞ্জিরা দ্বীপ পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপর দিয়া একটি বৃহৎ বাঁধ প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন এবং ইংরাজদের অধিকতর উন্নত নৌবাহিনী হইতে নৌযুদ্ধের অস্ত্রাদি ধার লইবার জন্য তাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র চালান। কিন্তু ইংরাজ কাউন্সিলের সভাপতি শিবাজীর প্রস্তাবগুলির সোজাসুজি জবাব না দিয়া উহা এড়াইয়া যান। ইংরাজেরা স্থির করেন যে তাঁহারা "শিবাজীকে, অস্ত্রশস্ত্র ধার দেওয়ার কোন স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না দিয়া তাঁহাকে একেবারে সাহায্য করিবেন না এরূপ কোন কথাও বলিবেন না।" কিন্তু শিবাজীর প্রতিটি অভিযানই বিফল হইতে লাগিল। মারাঠা ইতিহাসকার দুঃখের সহিত লিখিয়াছেন, "মহারাজার সৈন্যরা হতাশ হইয়া ফিরিতে লাগিল।" বাস্তবিক জাঞ্জি রাজ্য আজিও বিদ্যমান, এবং শিবাজী যে সব জলদস্যুদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া ছিলেন তাহাদের বংশধরেরা এখনও উহা শাসন করিতেছে। (১)

১৬৬৪ সালের বর্ষাশেষে শিবাজীকে কিরূপে দমন করা যায় এই প্রশ্ন মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে অন্য সমস্ত সমস্যা হইতে গুরুতর হইয়া উঠিল এবং সম্রাট এ বিষয়ে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। আওরঙ্গজেব অবজ্ঞাভরে মারাঠা নেতার নাম দিয়াছিলেন "পার্ব্বত্যমূষিক"। শিবাজীর নাম মনে পড়ামাত্র বা অন্যকেহ তাঁহার নিকট শিবাজীর নামের উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে আওরঙ্গজেব স্বীয় পুত্রের অযোগ্যতা ও তাঁহার সেনাপতিদের অক্ষমতা স্মরণ করিয়া ক্রোধে ফাটিয়া পড়িতেন। অবশেষে ৩০শে সেপ্টেম্বর তাঁহার জন্মদিনে তিনি এক দরবার আহ্বান করেন। সভাসদদিগের শুভেচ্ছাজ্ঞাপন শেষ হইলে তিনি জন্মদিন উপলক্ষ্যে

---

(১) জাঞ্জিরা কথাটা আরবী "জাজিরা" বা দ্বীপ এই বাক্যের মারাঠির বিকৃতরূপ। হাবসীরা তাহাদের শিলাস্তপ নির্ম্মিত দুর্গের সম্বন্ধে এই কথাটা ব্যবহার করিত।

প্রদত্ত খেতাব ও সম্মানাদি ঘোষণার আদেশ দেন। ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করা হয় মারাঠাদের দমন করিবার জন্য দক্ষিণভারতে যুবরাজ মুয়াজ্জামের স্থলে জয়সিংহকে প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত।

কত দুঃখে যে আওরঙ্গজেবের ন্যায় গোঁড়া মুসলমান সম্রাট নিজ-মাতুল ও পুত্রের পর পর বিফলতা স্বীকার করিয়া লইয়া একজন হিন্দু-সেনাপতিকে এই উচ্চপদে নিয়োগ করিতে বাধ্য হন তাহা সহজেই অনুমেয়।

তবে জয়সিংহের এই পদে নিয়োগ যে খুবই উপযুক্ত হইয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ছিলেন বিখ্যাত জয়পুর রাজপরিবারের একজন বিশিষ্ট ও উচ্চতম পদমর্য্যাদাসম্পন্ন বীরপুরুষ। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমানে জয়পুরের মহারাজা এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার সপ্তত্রিংশৎ বংশধর।(১) বার বৎসর বয়সে পিতৃহীন জয়সিংহ তরুণ বয়সে মুঘল সেনা-বিভাগে প্রবেশ করেন এবং বাল্যকাল হইতেই সম্মুখ সমরে অভ্যস্ত হন। তাঁহার অসাধারণ বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া উৰ্দ্ধতন সেনাধক্ষ্যরা সকলেই তাহার উন্নতির জন্য সুপারিশ করেন এবং তিনিও মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক বিভাগে উচ্চতম পদ লাভ করিতে সমর্থ হন। যে শৌর্য্যবীর্য্য রাজপুত-দিগের বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তিনি ছিলেন উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাস্তবিক সাহস ও বলিষ্ঠতাই রাজপুতেরা পুরুষের একমাত্র মনুষ্যোচিত ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। প্রত্যেক রাজপুতের মত তিনিও তাঁহার রাজ্যের ও পূর্ব্বপুরুষদিগের বীরত্বের কাহিনী শুনিতে শুনিতে বাল্যা-বস্থা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। এই সব কাহিনীর বিষয়বস্তু ছিল অতিশয় রোমাঞ্চকর। হিন্দু রাজপুতদিগের সংগ্রামশীল জীবনে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধেই হউক আর আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য তুচ্ছ কারণে পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধেই হউক বীরের মত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে শিক্ষা করা ছিল অতিশয় শ্লাঘার বিষয়। (কারণ ইউরোপীয় ভাইকিঙ্গদের মত ইহারা যুদ্ধে বিজয় অপেক্ষা বীরের মত পরাজয় অধিকতর আদরণীয় মনে করিত)। চারণ কবিদের কাহিনীর

---

(১) ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত।

মধ্যে শোনা যাইত কেমন করিয়া রমণীর সম্মান রক্ষার জন্য অথবা প্রভুর প্রাণ ও মানমর্য্যাদা রক্ষার জন্য ইহারা অবলীলাক্রমে বিপদের সম্মুখীন হইত। আরও কত অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী—অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ভয়ঙ্কর মৃত্যু হাসিমুখে বরণ করিয়া পীড়নকারীদের অস্ত্রাঘাতে মহানিদ্রা ও মহাপ্রয়াণের মত শত শত রোমাঞ্চকর উদাহরণ; কেমন করিয়া রাজপুত্র বা সেনাপতিরা হাতীপোলের সূচীমুখ বৃহৎ কীলকে মস্তকাঘাতে মৃত্যুবরণ করিয়া নিজ সৈন্যদিগের আক্রমণের কাজ সহজ করিয়া দিতেন—এইরূপ অজস্র কীর্ত্তি-কাহিনী। এইরূপ ঐতিহ্যের কাহিনীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া জয়সিংহও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় দুঃসাহসিক বীর হইয়া উঠিলেন। আর এখন ৬০ বৎসর বয়সে সামন্ত নৃপতিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বীর জয়সিংহ বাদশাহের আত্মজদিগের পরেই দরবারে সম্মানীত স্থান অধিকার করিতেন। অতীতের বেপরোয়া অশ্বারোহী সৈনিক বর্ত্তমানে অতি বিচক্ষণ ও সতর্ক সৈন্যাধ্যক্ষ, সুবিজ্ঞ মন্ত্রদাতা এবং সুকৌশলী রাজনীতিবিদ। অপূর্ব্ব তাঁহার ক্ষমতা। তিনি চারিটি ভাষায় অতি সহজভাবে আলাপ-আলোচনা করিতে পারিতেন। জয়পুর রাজবংশের সুনাম ও মর্য্যাদা সহ তিনি ভুঁইফোরে ভর্ত্তি মুঘল সম্রাটের দরবারে অতি সূক্ষ্ম ও পুরাতন সংস্কৃতি ও সভ্যতার আচরণ ও কথাবার্ত্তার প্রচলন করেন।

রাজপুতদিগের আনুগত্যের উপর নির্ভর করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আকবর তাঁহার সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সম্ভ্রান্ত বংশীয় রাজপুতগণকে দরবারে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইত। রাজপুত রাজকন্যাদের সহিত বাদশাহের পরিবারের রাজ-পুরুষদের বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে মুঘল অন্তঃপুরে বধূরূপে গ্রহণ করা হইত। মুঘলেরা রাজপুতদের পোষাক পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতেন এবং রাজপুতনায় চিত্রকলার আদর্শ ও রাজপুতদের আচার ব্যবহার মুঘল রাজ-ধানীর শিল্প ও রীতিনীতি বহু প্রকারে প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু রাজপুতেরা কখনও মুঘল আধিপত্যের অবশ্যম্ভাবিতা মানিয়া লয় নাই। ইসলামের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম চালাইবার ঐতিহ্যের মধ্যে বর্দ্ধিত রাজা জয়সিংহ যে অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে হিন্দুনেতাকে দমন করার গুরুভার গ্রহণ করেন ইহা সহজেই অনুমেয়। বাদশাহের প্রতি সামরিক আনুগত্য রক্ষার

জন্যই সম্ভবতঃ তিনি এই কাজে সম্মতি দেন। আওরঙ্গজেবের মুখ দিয়া সাধারণতঃ সরল ও মনোরম কথা বাহির হইত না। কিন্তু তিনি অতিশয় মিষ্ট কথায় জয়সিংহকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে একমাত্র এই রাজপুত সেনাপতিই দক্ষিণ সীমান্তে মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। ময়ূর সিংহাসন হইতে দাঁড়াইয়া আওরঙ্গজেব নিজের মুক্তার মালা জয়সিংহের গলায় পরাইয়া দেন। কিন্তু ইহার পরেও সমসাময়িক অনেক রাজপুত নেতাদের মত জয়সিংহও মুঘল সাম্রাজ্যে হিন্দু-দিগের অবস্থার অবনতি দেখিয়া ক্রমশঃ শঙ্কিত হইতেছিলেন; কারণ পূর্ব্বতন বাদশাহদিগের হিন্দুগণের প্রতি সদয় ও উদার নীতির পরিবর্ত্তে তাহাদের প্রতি আওরঙ্গজেবের পক্ষপাতমূলক বিরুদ্ধ ও কঠোর মনোভাব ক্রমশঃ প্রকট হইতেছিল। রোমক সম্রাট থিয়োডিসিয়াসের (Theodecius) সময় পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী সেনাপতিগণ যেমন উৎসাহহীন ও উদাসীনতার মনোভাব লইয়া আধা খৃষ্টিয় সাম্রাজ্যের পতাকার অধীনে যুদ্ধ করিতেন তেমনই অনুভূতি সহ জয়সিংহ বৃদ্ধ বয়সে জীবনব্যাপী সামরিক বৃত্তির গতানুগতিক নিয়ম অনুযায়ী সম্রাটের আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হন।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি শিবিকায় আরোহণ করেন এবং প্রাসাদের বাহিরে সিংহদ্বারে প্রতীক্ষ্যমান তাঁহার দেহরক্ষী অশ্বারোহী সৈন্যদল সমভিব্যাহারে নিজ আবাস বাটিতে প্রত্যাগমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

দক্ষিণ ভারত অভিমুখে রওনা হইবার পূর্ব্বে জয়সিংহ সম্রাটের নিকট হইতে তাঁহার শাসনাধীনে ন্যস্ত সমগ্র অঞ্চলের উপর সামরিক এবং বেসামরিক সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব দাবি করেন। তিনি পরিস্কার বলেন যে তাঁহাকে যদি এই অভিযান শীঘ্র শেষ করিতে হয় তবে তাঁহার সহিত যেন দিল্লী হইতে কোন "উপদেষ্টা" বা মন্ত্রীমণ্ডলী হইতে কোনরূপ নির্দেশ কিংবা বাদশাহের কোন আত্মীয়স্বজনকে বিজিত কোন প্রদেশ বণ্টন করিয়া দিবার আদেশ দেওয়া না হয়। ইতিপূর্ব্বে কোন মুঘল সেনাপতিকে এত বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। আওরঙ্গজেবের মনে মনে তখনও তাঁহার সিংহাসন অধিকার সংক্রান্ত স্মৃতি জাগরিত ছিল। এবং তিনি হয়তো

নিজপুত্র বা জ্ঞাতিভ্রাতা তো দূরের কথা কোন মুঘল ওমরাহকেও এইরূপ প্রভূত ক্ষমতা দিতে দ্বিধা করিতেন। কিন্তু জয়সিংহের উদ্দেশের সম্বন্ধে সম্রাটের কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই এবং তিনিই এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। তথাপি এই অভিযান চলিবার সময় তিনি অনবরত জয়সিংহকে নানা প্রকারের উপদেশ ও নির্দেশ দিয়া বিব্রত করিতেন। তবে সম্রাট নেপোলিয়নের নিকট স্পেনে প্রেরিত বার্তাসমূহের মত এইগুলি গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে দেরী হওয়ায় প্রায়ই এমন হইত যে পত্রের নির্দ্দিষ্ট ঘটনা হওয়ার পরে মাসাধিক চলিয়া যাইত। কাজেই তখন আর উহার কোন মূল্য থাকিত না। কিন্তু জয়সিংহ যুদ্ধ পরিচালনা বিষয়ে সম্রাটের প্রেরিত কৌশলনীতি সম্বন্ধে উপদেশ বরাবরই উপেক্ষা করিয়া চলিতেন। যদি সম্রাট কোন বিষয়ে উত্তর পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত জেদ করিতেন তাহা হইলে জয়সিংহ মিষ্ট অথচ অস্পষ্ট ভাবে জবাব দিতেন যে তাঁহাকে যে কাজের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে তিনি উহা লইয়া খুবই ব্যস্ত।

জয়সিংহ দাক্ষিণাত্যে পৌঁছিয়া ধীর চিত্তে কাজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যে অভিযানের জন্যে তিনি অতিরিক্ত চৌদ্দ-হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করেন। ইহাদের অনেকেই ছিল তাঁহার জ্ঞাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত রাজপুত। তিনি দিলীর খাঁ নামক একজন যোগ্য অথচ উগ্রমেজাজী আফগান সৈন্যাধক্ষের অধীনে একদল আফগান পদাতিকও সঙ্গে রাখেন। এই সেনাপতি যেমন বলশালী ছিলেন তেমনই প্রচুর আহার করার ক্ষমতা সম্বন্ধেও তাহার সুনাম ছিল। ধনুকে জ্যা যোজন করিতে তাহার সমকক্ষ তখন আর কেহ ছিল না। একবার দিল্লীর লালকেল্লার উত্তর দিকের সিংহদ্বার দিয়া বাহির হওয়ার সময় তিনি হাতী বাঁধিবার একটি বৃহৎ লৌহ কীলক দেখিয়া উহা একহাতে মোচড়াইয়া দেন। এই ঘটনা যাহাতে লোকে বিস্মৃত না হয় সেইজন্য লৌহ কীলকটি ঐ অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হয়। আজিও উহা ঐ স্থানে দোমড়ানো দেখা যায়।(১)

ইতালী দেশ হইতে আগত দুঃসাহসিক মানুচিচকে জয়সিংহ কামান-

(১) Irvinis *Storia do Mogor*, quoting O. D. 45 R*iserve.*

বারুদ সমূহের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করেন। মানুচিচ জয়সিংহ 'হম্বার' (Humber) প্রণালীর তাসখেলা শিখাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি জয়সিংহের খুব প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাতের পর রাত তাঁহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাস খেলিতেন এবং মানুচিচ জয়সিংহের নিকট হইতে এ খেলায় অনেক অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত একজন মজাদার সঙ্গী ছাড়া মানুচিচর যে এইরূপ দায়িত্বসম্পন্ন পদে নিযুক্ত হইবার কোন বিশেষ গুণ আছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পরে দেখা যায় যে ঐ নিয়োগ বিস্ময়করর‍ূপে সার্থক হইয়াছিল। আরও তিনজন ইউরোপীয়কে মানুচিচ তাঁহার সহকর্ম্মী নিযুক্ত করেন। ইহারা ছিলেন একজন ফরাসী, একজন ইংরাজ ও একজন পর্ত্তুগীজ। তাঁহরা কেবল জয়সিংহের গোলন্দাজ বাহিনী উত্তমরূপে সংগঠিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইউরোপীয় পদ্ধতিতে কি করিয়া আক্রমণ করিতে হয় ও শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার সময় কেমন করিয়া পিস্তল ছোড়া যায় ইহা তাহারা জয়সিংহের অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে শিখাইয়া দেন। তঁহারা যখন এইরূপ শিক্ষা দান করিতেন তখন জয়সিংহ হাতীর উপর হইতে তাঁহাদের নিপুন সুকৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা পরিদর্শন করিতেন ও এই যুদ্ধ পদ্ধতি অনুমোদন করিতেন। এমনকি তিনি এইরূপ অভিমতও প্রকাশ করেন যে তিনি ইউরোপ হইতে একদল অশ্বারোহী সৈন্য ভাড়া করিয়া আনিবেন।

মানুচিচর অদ্‌ভূত পোশাকে তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্ম বা জাতি সম্বন্ধে অন্যান্য মুঘল সেনাপতিদের রীতিমত ধোঁকা লাগিল। কারণ তিনি গাউনের ফিতা কোমরের দক্ষিণ দিকে বাধিতেন। (হিন্দুদের প্রথা সাধারণতঃ বামদিকে বাঁধা) অথচ মানুচিচ রাজপুতদিগের ন্যায় গোঁফ রাখিতেন। তাঁহার আধা হিন্দু এবং আধা মুসলমান বেশ দেখিয়া সেনাপতিরা তাঁহার অনুসৃত প্রকৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন। মানুচিচ বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া যখনই বলিতেন "আমি খৃষ্টান"; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহরা আমোদ করিয়া বলিতেন "বেশ তো, আপনি বলুন আপনি হিন্দু-খৃষ্টান কিংবা মোস্লেম-খৃষ্টান"।

১৬৬১ সালের শুরুতেই জয়সিংহের অভিযানের জন্য সংগঠন কার্য্য

সম্পূর্ণ হইল। যেমন সুচিন্তিত কল্পনা করিয়া তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন তেমনই ক্ষিপ্রবেগে তিনি যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি এত দ্রুত দক্ষিণ ভারত আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে ঐরূপ তীব্র গতিতে চলিতে পারিলে শিবাজীর পর্য্যন্ত সুনাম বর্দ্ধিত হইত। একদিনের তরেও বিশ্রাম না করিয়া গোলন্দাজ, পদাতিক, অশ্বারোহী প্রভৃতি সমগ্র সমর বাহিনী তাপক্লিষ্ট পীতবর্ণ ও ম্রিয়মান বৃক্ষ বিশিষ্ট সমতল ভূমি ভেদ করিয়া রৌদ্রদগ্ধ বালুকাময় মৃত্তিকার উপর দিয়া চলিতে লাগিল। তপ্ত মৃত্তিকায় পা ফাটিয়া যাওয়ায় উপক্রম আর চারিদিকে রাশি রাশি ধূলিকণা উপরে উড়িয়া চলায় মানুষের নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করার আবহাওয়া। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তির প্রতি উদাসীন, প্রশস্ত-ললাটে জাতি-নির্দ্দেশক উজ্জ্বল তিলক অঙ্কিত করিয়া ও পিঙ্গলবর্ণ হস্ত তরবারির হাতলে রাখিয়া বৃদ্ধ রাজপুতবীর প্রতিদিন সৈন্যবাহিনীকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে অনুপ্রাণিত করেন। দিল্লী হইতে রওনা হওয়ার পরে একমাসের মধ্যে তিনি শাহজাদা মুয়াজ্জমের কেন্দ্রীয় ঘাঁটিতে আসিয়া পৌঁছান। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণের ক্ষয়প্রাপ্ত ও ভগ্নোৎসহ সমর বাহিনীকে শক্তিশালী ও সতেজ করিয়া তাহাদিগকে অবিলম্বে সরাসরি মারাঠা অধিকৃত এলাকা আক্রমণ করিতে অদেশ দিয়া তিনি একমাস পরে পুনা সহরে প্রবেশ করেন।

জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম এবং শেষ শিবাজী সামরিক শক্তিতে তাঁহারই সমশ্রেণীয় একজন যোদ্ধার সম্মুখীন হইলেন। দুই প্রতিদ্বন্দী যখন পরস্পরের শক্তি ও অভিযানের কৌশল এবং প্রণালী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন সেই সময় চারিদিকে যেন একটা স্তব্ধতার ভাব বিরাজমান ছিল। তখন পুরাদমে গ্রীষ্মকাল চলিতেছে। পুণার সঙ্কীর্ণ পথঘাট ও ঘেঁসাঘেঁসিভাবে নির্ম্মিত বাড়ীঘর আক্রমণকারীদের অস্বাচ্ছন্দ্য আরও বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। দিনের বেলায় ধূলিময় বালি একঘেঁয়ে বহিয়া চলিত, আর রাতে অত্যন্ত পীড়াদায়ক স্তব্ধ ও নিশ্চল আব-হওয়ায় নিদ্রা যাওয়া অতিশয় কষ্টকর হইত। কিন্তু জলবায়ু বা সঙ্কীর্ণ এবং দমবন্ধকারী আবাসগৃহ, দিনের বেলায় মাছির অত্যাচার ও রাত্রিতে চেরাগের চারিদিকে মশার গোঙানি ইত্যাদি উপদ্রব অগ্রাহ্য করিয়া জয়সিংহ অক্লান্ত ভাবে অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ, ভবিষ্যতের উপায় ও কৌশল উদ্‌ভাবন এবং

স্থানকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের পরিকল্পনায় সর্ব্বদা নিয়ত রহিলেন।

তাহার প্রধান কাজ হইল শিবাজীর অধিকৃত সমস্ত এলাকা মুঘলসৈন্য কিংবা মুঘলসাম্রাজ্যের মিত্র শক্তিদের সৈন্যদ্বারা একেবারে ঘিরিয়া ফেলা। শিবাজীকে পেছন দিক হইতে আক্রমণ করিবার জন্য তিনি বিজাপুরের নবাবকে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। বিশেষ করিয়া তিনি আফজল খাঁর পুত্রকে তাঁহার পিতার মৃত্যুর প্রতিহিংসা লইতে উত্তেজিত করেন। এই যুবক ব্যগ্রভাবে জয়সিংহের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া একদল অনুচর সহ মুঘল শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। জয়সিংহ ইউরোপীয় বণিকদের পশ্চিম দিকের সমুদ্রের উপকূলস্থ বন্দরের সমস্ত কুঠিতে দূত পাঠান এবং উদীয়মান মারাঠা নৌবল তাহাদের ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারে যে কতদূর অন্তরায় ও ভয়ের কারণ হইবে ইহা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকেও এই নবজাগ্রত মারাঠা শক্তিকে বিনষ্ট করিতে আহ্বান করেন। উপ-কূলের অরণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকগণের নিকট মানুচিচকে প্রচার কার্য্যে পাঠাইয়া তাহাদিগকে ঘুষদিয়া শিবাজীর ঘাঁটিগুলির উপরে অপ্রত্যাশিত ভাবে হানা দেওয়ার ব্যবস্থা করান।

দৌত্যকার্য্যে মানুচিচ বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। তিনি প্রথম উপস্থিত হইলেন রামনগরের রাজার দরবারে। অত্যন্ত দুর্গম ও ভয়ঙ্কর পাহাড়ের উপর এবং অন্ধকারময় জঙ্গলের মধ্যে এই রাজ্যের অবস্থান। মুঘলদিগের প্রতিহিংসা পরায়ণতার একটা অতিরঞ্জিত কাহিনী বর্ণনা করিয়া মানুচিচ এই দেশের রাজার মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার করেন এবং শিবজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে তাঁহাকে প্রচুর ধনরত্ন দিয়া পুরস্কৃত করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। শেষ পর্যন্ত রাজা-মুঘলদিগের সহায়তা করিতে রাজি হইলেন বটে; তবে তিনি তাহার প্রতিবেশী অন্যান্য সর্দ্দারদের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কয়েক দিন সময় চাহিয়া লহেন। মানুচিচও এক সপ্তাহ আরাম করিবার সময় পাইয়া খুব খুশি হইয়া মনের সুখে শিকার করিতে ও মাছ ধরিতে লাগিলেন। তখন প্রখর গ্রীষ্ম। টিক গাছের পিঙ্গলবর্ণ পাতাগুলিকে দেখিয়া মনে হইত উহারা যেন সোজা হইয়া কাঠের মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়াছে।

ধূসর ও ধূলিময় হাওয়া অপরাহ্নে দীর্ঘকাল দিকবিদিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। আর একদিকে সোনালী রঙের পাখীর কলরব শোনা যাইত ও মাঝে মাঝে রূপালী রঙের এক রকমের পাখী হঠাৎ ঝোপের মধ্যে বিদ্যুতের মত উড়িয়া যাইতে দেখা যাইত। এই নির্জন জঙ্গলময় স্থানগুলিতে জাদু ও সম্মোহণ বিদ্যায় ওস্তাদ অনেক লোক বাস করিত। জঙ্গলের একজন সর্দ্দার মানুচিচর ঘোড়া জাদুমন্ত্রে সম্মোহিত করে। এই ঘোড়াটি জয়সিংহ মানুচিচকে উপহার দেন। সম্মোহনের ফলে ঘোড়াটি নড়িতে চড়িতে একেবারে অসমর্থ হইয়া পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া রহিল। অবশেষে মানুচিচ তিন হাজর টাকায় ঘোড়াটি বিক্রয় করিতে সম্মত হইলে উহা পুনরায় জীবন লাভ করে। মানুচিচর ভৃত্য একদিন মূলার ক্ষেতের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। যেমনি সে একটি মূলা তুলিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে অমনি দেখে যে মূলাটিকে ও তুলিতে পারিতেছেনা এবং হাতও গুটাইয়া লইতে পারিতেছেনা। ঐখানে হাস্যম্পদ ও আড়ষ্টভাবে মূলার উপর ঝুঁকিয়া সে অনেক্ষণ পড়িয়া রহিল। শেষকালে মানুচিচ আসিয়া ক্ষেতের মালিককে সন্ধান করিয়া বাহির করে এবং তাহাকে ঘুষ দিয়া ভৃত্যকে মুক্ত করিতে সম্মত করায়। লোকটি নিকটে আসিয়া মূলার মাথায় ফিসফিস করিয়া কয়েকটা কথা বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুচিচর ভৃত্যের আড়ষ্টভাব কাটিয়া যায় ও তাহার হাত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

জয়সিংহ শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেন তাঁহার নিযুক্ত গুপ্তচরদের সাহায্যে শিবাজীর অমাত্য ও সেনাপতিগণকে ঘুষ দিয়া বশ করিতে। কিন্তু এই কার্য্যে তিনি বিশেষ সুফল পাইলেন না, কারণ শিবাজীর কর্ম্মাধ্যক্ষদের মধ্যে মাত্র দুজন তাঁহার প্রস্তাবে রাজী হয়। কিন্তু ইহারা কেহই জাতিতে মারাঠা ছিল না।

কূটনীতির কাজে তিনি সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া জয়সিংহ যুদ্ধপরিচালনায় মনঃসংযোগ করেন। মুঘল সেনাপতিদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই শিবাজীর "দুর্গসেতুর" তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে এই "দুর্গসেতুর" উপর ভিত্তি করিয়াই শিবাজীর

শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ইহা দ্বারাই পশ্চিমঘাটে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে শিবাজীর অধিকৃত স্থান সমূহের মধ্যে সংযোগ রক্ষা হয়। এই দুর্গগুলি শত্রুর হাতে চলিয়া গেলে মারাঠারা উন্মুক্ত সমতল ভূমিতে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য। এবং সেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুঘলদের চাপ সহ্য করা মারাঠাদের পক্ষে কষ্টকর। অন্যান্য মুঘল সেনাপতিরা এই দুর্গশ্রেণী আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত এড়াইয়া চলিতেন। কারণ এই দুর্ভেদ্য দুর্গনগরীগুলি এমন কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে সকলেই মনে করিত যে বাহিরের আক্রমণ প্রতিরোধ করা উহাদের পক্ষে খুব সহজ। পার্ব্বত্য দেশে অবস্থিত এই দুর্গগুলির মধ্যে থাকিত বেপরোয়া ও হিংস্র পাহাড়ীরা। আক্রমণকারিদিগের সহিত তাহাদের বিদ্বেষভাব ছিল খুব প্রকট।

তখনকার দিনে ভারতবর্ষে সামরিক রক্ষণপ্রণালী ও কৌশলাদি ইউরোপে প্রচলিত প্রণালীর মতই উন্নত ধরণের হইলেও দুর্গ অবরোধ প্রথার প্রকৃত কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এদেশে সম্যক ধারনা ও উপলব্ধি ছিল না। সম্রাট আকবরের মত বীরের আক্রমণও একটি দুর্গের প্রতিরোধে কোন কোন সময় ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। একজন সেনাপতির পক্ষে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে সমর পরিচালনা করায় আবার ভৎর্সনা এবং এমনকি অপমানিত হওয়ার ভয়ও ছিল। কোনও অবরোধ যদি অনেকদিন যাবত চলিত তবে ষড়যন্ত্রকারী অমাত্যেরা অনেক সময় শত্রুপক্ষের প্রতি সেনাপতির "দরদ" সম্বন্ধে সম্রাটের কানে নানা প্রকার সন্দেহজনক কথা তুলিত। অপরপক্ষে সেনাপতিদের সামান্য যুদ্ধবিগ্রহ বিরাট বিজয় বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রলোভন তো ছিলই। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ সেই সময়ে যুদ্ধ বিজয়ের পরে পরাজিত শত্রুর দুর্গগুলি যেন মরা গাছের শাখার মত ঝরঝর করিয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু মারাঠাদের বেলায় অন্যরূপ। তাহাদের সমগ্র সামরিক শক্তির মেরুদণ্ড ছিল এই দুর্গগুলি। শত্রুরা যদি কখনও কৃতকার্য্য হইত তবে মারাঠারা মনে করিত যেন তাহাদের দেহের উপর খানিকটা মাংস কাটা গিয়াছে মাত্র। কিন্তু উহাতে ক্ষতি যতই হউক না কেন শেষ পর্য্যন্ত তাহারা উহা মারাত্মক হইতে দিত না। এতদ্ব্যতীত ইহাও বলা আবশ্যক যে ভারতীয় অন্যান্য সেনানী তখন সামন্ত রাজাদিগের নানা উপজাতি

ও নানা ধর্ম্মের সৈন্য লইয়া গঠিত হইত। সার্ব্বভৌম সম্রাটের প্রতি দূরবর্ত্তী ও চূড়ান্ত আনুগত্য তাহাদিগকে কোনরূপে এক সংগঠনভুক্ত করিত। অপরপক্ষে মারাঠা সমর বাহিনী ছিল এক নেতার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অনুগত ও একত্রিত। তাহাদের আনুগত্য কোন মধ্যবর্ত্তী শাসকের প্রতি বিভক্ত ছিল না। তাহাদের একতার মূলে ছিল ধর্ম্মগত ও প্রকৃত জাতীয়তামূলক একটা নূতন উদ্দীপনার মনোভাব। পরোক্ষে নিজদের দেশ আক্রান্ত হইলে উহা রক্ষা করার জন্য এই মনোবৃত্তিই তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া রাখিত, যদিও তাহাদের দেশ ছিল অতি ক্ষুদ্র এবং একবার প্রতিরোধের মূল উৎস বিধ্বস্ত হইলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সেনাবাহিনীর পক্ষে উহা জয় করা সহজ হইত। জয়সিংহ সম্যক বুঝিয়াছিলেন যে মারাঠাদের প্রতিরোধের মূল শক্তিকেন্দ্র হইল এই পার্ব্বত্য দুর্গ লহরী। সুতরাং যুদ্ধের সমস্ত প্রস্তাব ও জমকাল বিজয়ের সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া তিনি প্রথমতঃ এই দুর্গগুলি এক এক করিয়া দখল করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

জয়সিংহ সর্ব্বপ্রথম পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিবেন বলিয়া স্থির করেন। এই দুর্গটি শিবাজী তিন কলহরত ভ্রাতাদের নিকট হইতে অধিকার করিয়াছিলেন। ইহা পুণার দক্ষিণ-পশ্চিমে এক সুরক্ষিত পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই পাহাড়ের পিঙ্গলবর্ণ শিখরগুলি সমতল ভূমি হইতে সোজা উঠিয়া গিয়াছে। ইহা চারিহাজার ফিট উচ্চ। মেঘলা দিনে ইহার ঈষৎ কালো চূড়া দৃষ্টিগোচর হয়না। পাহাড়ের উপর দুই উচ্চ শিখর। ইহারই একটির মধ্যে পুরন্দর দুর্গ প্রতিষ্ঠিত। শিবের "গোলাপবাগ" বলিয়া পরিচিত দ্বিতীয় শিখরটিও সুরক্ষিত করিয়া শিবাজী উহাতে সৈন্য রাখিতেন। ইহা প্রধান দুর্গের বহিরাংশের মত ব্যবহৃত হইত। ইহার এক কোণ হইতে দুর্গের পশ্চিমদিক ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা যাইত বলিয়া প্রতিরোধকারী সৈন্যরা ইহার সংরক্ষণের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করিত।

পুরন্দর দুর্গের পথগুলি বন্ধ করিবার জন্য জয়সিংহ কতকগুলি অবরোধ স্থাপন করেন। তারপর মার্চ্চ মাসের শেষদিকে পুণায় একদল সৈন্য রাখিয়া মারাঠারা যাহাতে দুর্গে সাহায্যকারী সৈন্য পাঠাইতে না

পারে এই জন্য তিনি তাঁহার প্রধান সমর বাহিনী লইয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে পুরন্দরের ছয় মাইল দক্ষিণে শাস্বদ অধিত্যকার দিকে অগ্রসর হন। দুর্গনগরী চারিদিকে হইতে সম্পূর্ণ রূপে বেষ্টিত হওয়ার পর তিনি দিলিরখাঁকে তাঁহার আফগান সৈন্যদল লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ দেন।

মুরার নামক এক সেনাপতির অধীনে পুরন্দরে এক হাজার মারাঠা সৈন্য মোতায়েন ছিল। আক্রমণকারী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার। তাহাদের সঙ্গে ছিল ইউরোপীয় সেনাপতি সহ গোলন্দাজ সৈন্য। সুকল্পিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরিখা খনন করিয়া আফগাণেরা অগ্রসর হইতে লাগিল। আক্রমণকারিদের বাধা দেওয়ার জন্য অবরুদ্ধ মারাঠারা বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শিবের "গোলাপবাগ" উপগিরির নীচে জড় হইতে লাগিল। ইহা দখল করাই জয়সিংহের প্রথম উদ্দেশ্য।

বড় বড় কামানগুলি এইবার বন্ধুর পার্ব্বত্যপথে উপরে টানিয়া তোলা হইতে লাগিল। সৈন্যরা উবু হইয়া পড়িয়া রুদ্ধশাসে রজ্জু টানিয়া যখন কামানগুলি তুলিত সেই সময় রৌদ্রের প্রখর তাপে তাহাদের পিঠ ফাটিয়া যাওয়ার মত অবস্থা হয়। এদিকে শুষ্ক ঘাসের গুড়ি তাহাদের মুখে চোখে পড়িতে থাকে, আর মারাঠারা উপর হইতে তীর, পাথর এবং বারুদভর্ত্তি ঘট তাহাদের উপর বর্ষণ করে। এই অবস্থায় জয়সিংহ প্রত্যহ নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সৈন্যদিগের কাজের প্রশংসা করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন, এবং আগের দিন যাহারা খুব ভাল করিয়াছে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিতেন।

"শিবের গোলাপ-বাগের" সম্মুখস্থ প্রবেশ পথের বিপরীত দিকে কামান বসাইতে অবরোধ কারিদের এক সপ্তাহ লাগিল। তারপর অল্পদূর হইতে লক্ষ্য বস্তুর প্রতি কেন্দ্রীভূত বোমা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; কামান হইতে ভীষণ বোমা নিক্ষেপের ফলে দুর্গের দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু তথাপি স্তূপীকৃত ধ্বংসাবশেষের পশ্চাতে থাকিয়া মারাঠারা প্রত্যেক আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ হওয়ায় দুর্গপ্রাচীরের একটা বৃহৎ অংশ ধ্বসিয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়া এবং ধূলা জড়িত আচ্ছন্ন আবহাওয়ায় দিলির খাঁ

তাঁহার আফগান সৈন্য লইয়া ভীষণভাবে মারাঠাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। দুর্গমধ্যস্ত অবশিষ্ট সৈন্য ব্যারাকের মধ্যে প্রবেশ করে। ব্যারাকের প্রাচীরের পশ্চাতে তাহারা ইস্পাতের মত শক্ত হইয়া শেষ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়।

শিবের গোলাপ-বাগ শত্রুর কবলিত হইলে উপরের প্রধানদুর্গ রক্ষা করা কত কঠিন হইবে ইহা উপলব্ধি করিয়া উক্ত দুর্গের অধিনায়ক মুঘলদের আক্রমণে বিভেদ সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদিগের অর্দ্ধেক, অর্থাৎ ৫00 শত সৈন্য লইয়া তিনি পাহাড়ের গা বাহিয়া অগ্রসর হন ও হঠাৎ আফগান সৈন্য দিগকে পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ করিয়া একেবারে গোলাপবাগে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার আক্রমণে এমন প্রচণ্ড সংঘাত হয় যে সৈন্যদিগের এক পার্শ্ব ধ্বসিয়া পড়ে এবং মারাঠারা প্রায় শত্রু শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ৭00 শত সৈন্যের প্রাণনাশ করে। কিন্তু তাহাদের পক্ষেও ১00শত সৈন্য বিনষ্ট হয়। হস্তীপৃষ্ঠে আরোহিত দিলীর খাঁ বীরভাবে মারাঠাদের অগ্রগমন লক্ষ্য করিতেছিলেন। মারাঠাসৈন্যদের অধ্যক্ষ মুরার লক্ষ্যীভূত হওয়া মাত্র দিলীর খাঁ তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া গুলি ছুড়িয়া তাহাকে হত্যা করেন। নেতার মৃত্যুতে মারাঠারা ভগোৎসাহ হইল এবং তাহাদের প্রাথমিক সাফল্যের উল্লাস উবিয়া গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আফগানদিগের আক্রমণের হাত হইতে কোনরূপে অব্যাহতি পাইয়া পুনরায় দুর্গের মধ্যে ফিরিয়া যায়। মারাঠাদিগের এক পাশ হইতে আকস্মিক আক্রমণে আফগানেরা প্রথমতঃ বিভ্রান্ত হয়; কিন্তু তাহারাও অনতিবিলম্বে মারাঠাদিগের প্রত্যাবর্ত্তনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। মারাঠারা তাহাদের এড়াইয়া চলিয়া যায়।

ঐদিন মুঘলেরা সারারাত শিবের গোলাপ-বাগে আক্রমণ চালাইতে থাকে এবং পরের দিন প্রাতে জয়সিংহ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ রাজপুত সেনাপতি সহ এই স্থানে প্রদর্শন করেন। মারাঠা সৈন্যগণ এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাদের দাঁড়াইবার সামর্থ্যও ছিল না। তবুও কোন রকমে দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া তাহারা মুঘলসৈন্যদিগের শেষ আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া জয়সিংহ কোনরূপ

অস্ত্রশস্ত্র না লইয়া একাকী তাহাদের নিকট অগ্রসর হইয়া সম্মানজনক সর্ত্তের প্রস্তাব করেন। তাহারা অবনতমস্তকে কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিল। এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ভিন্ন তখন তাহাদের আর উপায়ন্তর ছিল না। ধোঁয়ায় তাহাদের মুখ কালীময় আর তাহাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত। এই অবস্থায় কোনরূপে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাহারা অন্ধকার ব্যারাক হইতে বাহিরে আসিল। প্রকৃত রাজপুত বীরের উপযুক্ত ঔদার্য্যসহ জয়সিংহ তাহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করেন। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজভুক্ত রাজপুত বীর অদম্য সাহস প্রদর্শনের জন্য মারাঠাদিগের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। মারাঠাদিগের গাত্রে রক্তমাখা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বস্ত্র আর জয়সিংহের পরিধানে বহুমূল্য সিল্কের ও মস্‌লিনের পোষাক। এই অবস্থায় জয়সিংহ প্রত্যেক মারাঠা সৈন্যকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগকে সম্মানসূচক পোষাকে বিভূষিত করেন। ইহার পর আরও নানা রকমের সৌজন্য প্রকাশের পর তিনি তাহাদিগকে মুক্তির আদেশ দিয়া তাহাদের নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সুব্যবস্থা করেন।

তারপর জয়সিংহ ঐরূপ সর্ত্তের প্রস্তাব করিয়া প্রধান দুর্গে দূত পাঠাই-লেন। দূত তাহার আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পর ঘোষণা করে, "মারাঠাগণ, মহারাজা জয়সিংহ তোমাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন, তোমাদের সেনাপতি নিহত হইয়াছে।" উত্তরে মারাঠারা চীৎকার করিয়া বলে, "তাঁহার ন্যায় আমরাও বীরের মত মরিতে চাই।"

ইহার পর আবার যথাস্থলে কামান বসান হয় এবং মুঘলসৈন্য পুনরায় দুর্গের অবরোধ আরম্ভ করে।

ইতিমধ্যে শিবাজী চুপচাপ অলসের মত কালক্ষেপ করেন নাই। শাশ্বদ যুদ্ধক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত মুঘলসৈন্যের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই; কারণ তিনি জানিতেন যে যুদ্ধের জন্য তিনি যতই সৈন্য সংগ্রহ করুন না কেন সংখ্যায় প্রতি ৩।৪ জন মুঘলসৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার পক্ষে একজনের বেশী সৈন্য পাওয়া সম্ভব ছিল না। এখন তাহার একমাত্র ভরসা জয়সিংহের মনোযোগ বিভিন্নমুখী করিয়া তাহার সমরবাহিনী

বিভক্ত করিয়া দেওয়া। এই সময় শিবাজীর কর্ম্মতৎপরতা ও অধ্য-বসায় তাঁহার শত্রুদের পর্য্যন্ত বিস্ময় উৎপাদন করে। কাফী খাঁ তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "রাতের পর রাত আক্রমণ চলিতে থাকে আর ঘাঁটির পর ঘাঁটি ও জঙ্গলময় স্থানসমূহ দগ্ধ হইয়া যায়।" নৌবলের সাহায্যে শিবাজী গুজরাটের কতকগুলি বন্দর দখল করেন। বিজাপুরের নবাব মুঘলদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রপথে আগত বিজাপুর রাজ্যের বাণিজ্য সামগ্রী লুঠ করেন।

পুরন্দর দুর্গ পতনোম্মুখ; এবং দুই এক দিনের মধ্যে উহা জয় করা সম্ভব ইহা বুঝিতে পারিয়া দিলির খাঁকে যথেষ্ট পরিমানে সৈন্যসহ এই কার্য্য সম্পাদনের ভার দিয়া মুঘলসমরবাহিনী লইয়া জয়সিংহ স্বয়ং সহসা পাহাড়ের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব দিক হইতে এক নূতন আক্রমণ শুরু করেন। উন্মত্ত পাহাড়ীরা তাহাদের আশ্রয় হইতে বাহির হইয়া তীব্র বেগে মুঘল সৈন্যের উপর ঝাপাইয়া পড়ে। কিন্তু উহা অগ্রাহ্য করিয়া শিবাজী তাঁহার এই নতুন উদ্যমের সংবাদ অবগত হওয়ার পূর্ব্বেই জয়সিংহ সসৈন্যে রায়গড় উপস্থিত হন। জয়সিংহ গুপ্তচরগেণর মারফৎ শুনিয়া-ছিলেন যে শিবাজীর পরিবার রায়গড়ে অবস্থান করিতেছে। তাঁহার চরিত্রগত স্বাভাবিক সুপরিকল্পনা ও সতর্কতার সহিত জয়সিংহ রায়গড় অবরোধ আরম্ভ করেন। আক্রমণের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত পরিখা খনন এবং মারাঠা সৈন্যদিগের বিরুদ্ধে অবলম্বনীয় অন্যান্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র জয়সিংহ সমতল ভূমিতে অবস্থিত মারাঠা গ্রামগুলির মধ্যে দলে দলে সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা পূর্ব্বকল্পিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রবলবেগে গ্রামগুলি বিধ্বস্ত করিতে থাকে। কিন্তু এই সময় যে সব মারাঠা সৈন্য আত্মসমর্পন করে তিনি তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। জয়সিংহ মনে করেন যে এই প্রকারের দ্বৈত ব্যবহার দ্বারা তিনি শিবাজীর প্রতি মারাঠাদিগের অনুরক্তি ক্ষুন্ন করিতে সমর্থ হইবেন। শিবাজী দেখিলেন যে তাঁহার গঠিত রাষ্ট্র চোখের সম্মুখে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। পুরন্দর দুর্গ অবরোধ হইতে মুক্ত করার তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে এবং রায়গড়ের উপর জয়সিংহের বজ্রমুষ্টি ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতেছে। একবার রায়গড় দখল করিতে পারিলেই

শিবাজীর পরিবারবর্গ জয়সিংহের আয়ত্বে আসিবে। তিনি হয়তো তখন তাহাদিগকে শিবাজীর বিরুদ্ধে জামিন হিসাবে ব্যবহার করিবেন।

এইসব ভাবিয়া শিবাজী হঠাৎ স্থির করেন যে সামরিক অবস্থার আর বেশী অবনতি হওয়ার পূর্ব্বেই যে কোন সর্ত্তে তিনি জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিবন। শিবাজী কেন সহসা স্বীয় ক্ষমতায় বিশ্বাস হারাইলেন এই বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা নানারূপ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে উপযুক্ত সুযোগ সন্ধানই ছিল শিবাজীর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জয়সিংহ যে কতবড় প্রতাপশালী প্রতিদ্বন্দী এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে কতদূর ভদ্র ও ন্যায়পরায়ণ ইহা শিবাজী সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের বিশাল এবং ক্রমবর্দ্ধমান জনবল ও ধনবলের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ব্যাপী এবং ক্রমশঃ বিফল যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যগণ আর কতদিন বাধা দিতে পারিবে, এই ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইলেন। দূরদৃষ্টিতে বুঝিতে পারা যাইত যে শিবাজীর প্রথম প্রয়োজন সময়। এখন যুদ্ধের বিরতি করাইতে পারিলে সুযোগমত পুনরায় ইহা আরম্ভ করা যাইতে পারে। তিন বৎসর যে ক্ষুদ্ররাষ্ট্র সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সমানতালে যুদ্ধ চালাইয়াছে ও বহুবার আর্শ্চয্য রকম সফলতা লাভ করিয়াছে তাহার পক্ষে এতদিন পরে পরাজয় স্বীকার করা খুব লজ্জাকরও নহে।

জুন মাসের প্রারম্ভে শিবাজী জয়সিংহের নিকট যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করেন। কিন্তু শিবাজীর বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পন করার স্বীকৃতি না পাইলে জয়সিংহ কোনরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। শিবাজী তখন মুঘল শিবিরে যাইয়া তাঁহার ব্যক্তিগত আত্মসমর্পণ বিষয়ে আলোচনা করিবার প্রস্তাব করেন। শিবাজীর দূতের সম্মুখে জয়সিংহ তুলসী-জল সহ শপথ করিয়া বলেন যে শিবাজীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে তিনি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকিবেন। রাজপুতবীর প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন, ইহা নিঃসন্দেহ। শিবাজী শ্বেত অশ্বে আরোহণ না করিয়া একটি শিবিকায় চড়িয়া মুঘল শিবিরের দিকে রওনা হইলেন। এদিকে রায়গড়ের অবরোধ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া জয়সিংহ পুরন্দর পাহাড়ের নীচে

ফিবিয়া আসেন। শিবাজী আসিতেছেন শুনিয়া জয়সিংহ একজন ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া শিবাজী সত্য সত্যই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইচ্ছুক কিনা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। শিবাজী পালকি হইতে ইঙ্গিত করিয়া শান্তির জন্য তাঁহার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইহার পর জয়সিংহ তাঁহার একজন প্রধান অমাত্যকে পাঠাইয়া শিবাজীকে অভ্যর্থনা করেন।

শিবাজীব ছল চাতুরীব কাহিনী এমনভাবে রটিয়াছিল যে বাদশাহের সেনাপতিরা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে শিবাজী সত্যই শান্তি প্রতিষ্ঠাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসিয়াছেন। পরন্তু তাঁহারা মনে করেন যে ইহা শিবাজীব আর একটা ভয়ঙ্কর ফন্দি আঁটিবার প্রচেষ্টা। এমনকি মানুচিচর সঙ্গীরাও ক্রমশঃ অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। শিবাজী মুঘল শিবিরের নিকটস্থ হইতেছেন এই সংবাদ ঘোষিত হওয়ামাত্র তিনি যে একা আসিতেছেন ইহা সাধারণ লোককে বিশ্বাস করান খুব কঠিন হইয়া পড়িল। মুঘল সৈন্যরা বরং শিবাজী শিবির আক্রমণ করিতেছে এই মনে করিয়া চারিদিকে ছোটাছুটি করিতে লাগিল।

লাল সালুতে আবৃত, কার্পেট ও ফুলকাটা জরিদার রেশমী বস্ত্রশোভিত বাদশাহী তাঁবুতে বসিয়া জয়সিংহ ঔৎসুক্যের সহিত শিবাজীব জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁবুর সাজসজ্জা ও আসবাবপত্র দেখিয়া উহা ভোজসভার অনুষ্ঠানের আসর বলিয়া মনে হইতেছিল। বাছাইকরা বারজন সামন্ত রাজপুত বীর জয়সিংহকে বেষ্টন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মস্তকে পুচ্ছবিশিষ্ট পাগড়ি ও তাঁহাদের শ্মশ্রুগুচ্ছ বক্ষের উপরিস্থ বর্ম্মের দুইদিকে দোলায়মান। প্রত্যেকের হাতে এক একখানা উন্মুক্ত তরবারি। ক্লান্ত ক্লিষ্টদেহে শিবাজী বাদশাহী শিবিরে প্রবেশ করা মাত্র দেহরক্ষী রাজপুত সেনাপতিরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। সাধারণ লোকেরা শিবাজীকে একজন রোমাঞ্চকর অলীক পুরুষ, যাদু-বিদ্যায় পারদর্শী অতিমানব বলিয়া মনে করিত। কাজেই জয়সিংহ নিরাপত্তার জন্য কোন ব্যবস্থাই অসম্পন্ন রাখেন নাই। কিন্তু শিবাজী যখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করার জন্য নত হইয়া জয়সিংহের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন রাজপুতবীর তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া দুই হাতে

তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করেন।

জয়সিংহ শিবাজীকে বলেন, "আপনি বাদশাহের বিরুদ্ধে অতিশয় যোগ্যতা ও নিপুণতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। এখন আপনাকে তাঁহার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে।" তারপর হাতে ধরিয়া তিনি শিবাজীকে স্বীয় আসনে তাঁহার পাশে বসাইলেন।

জয়সিংহের কথায় যে আন্তরিকতা ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দুদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের কোন আশা আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। অদূর ভবিষ্যতে যে তাহারা বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। হিন্দু-দিগের ঐতিহ্যগত বিজয়ীবীর রাজপুতগণই যখন মুঘলদিগের সাম্রাজ্য বিস্তারে বাধা দিতে পারেন নাই তখন অর্দ্ধসভ্য ও যোদ্ধা বলিয়া অপ-রিচিত পাহাড়িয়াদিগকে লইয়া নবগঠিত একটা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে মুঘলদিগকে প্রতিরোধ করার কতটুকু সম্ভাবনা আছে? আর, জয়পুর রাণাবংশের একজন রাজা যখন মুঘল সাম্রাজ্যের সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করিতে লজ্জাবোধ করেন না, এ অবস্থার একজন অজ্ঞাতকুলশীল মারাঠার পক্ষে মর্য্যাদাহীনতা বা অবমাননা প্রভৃতি কথার উল্লেখ করা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। জয়সিংহ আরও বলেন যে শিবাজীর যোদ্ধা হিসাবে সুপরিচিত দক্ষতা ও যোগ্যতা বহুবিস্তৃত মুঘল সাম্রাজ্যে নিশ্চয়ই সমাদর লাভ করিবে। এবং পশ্চিম ঘাটের বনে জঙ্গলে স্থানীয় সমান্য দাঙ্গা হাঙ্গামা বা অতর্কিত আক্রমণাদির পরিবর্ত্তে তিনি তুর্কীস্থান বা ব্রহ্মদেশে পৃথিবীর বৃহত্তম সামরিক বাহিনী পরিচালনা করার সুযোগ পাইবেন। জয়সিংহ বলেন, "আপনি যদি বাদশাহের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন তবে আপনার পৈতৃক জায়গীর তো পাইবেন-ই, তদুপরি বিজাপুর রাজ্যের যে সব এলাকা আপনি জয় করিয়াছেন উহাও আপনার দখলে থাকিবে। কিন্তু এই সমস্তই আপনাকে একজন সামন্ত রাজার মত শাসন করিতে হইবে। আপনার যদি উচ্চাকাঙ্খা থাকে তবে আপনি মুঘল-সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ সেনাপতিদের অন্যতম পদেও অধিষ্টিত হইতে পারেন।

কিরূপ সর্ত্তাদিতে তাঁহাকে মুঘল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে এ বিষয়ে শিবাজী অনুসন্ধান করেন। এই সর্ত্তগুলি কঠোর

হইলেও উহা একেবারে অন্যায় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। উভয়পক্ষের স্বীকৃতি অনুযায়ী শিবাজীকে খেসারত দিতে হইবে; তাঁহার ২৩টি দুর্গের চাবি মুঘলদিগকে প্রদান করিতে হইবে এবং তিনি উহাতে মুঘলসৈন্য রাখিতে বাধ্য থাকিবেন। শিবাজী প্রথমতঃ এইরূপ সর্ত্ত বিবেচনা করিতে অসম্মত হন। কিন্তু ইহা লইয়া যখন জয়সিংহের সহিত বাদানুবাদ চলিতেছিল ঠিক সেই সময় হঠাৎ বাহিরের কলরব শোনা গেল।

জলন্ত স্থির দৃষ্টিতে শিবাজী সম্মুখে তাকাইলেন। জনৈক রাজপুত রক্ষী তাঁবুর একটি পর্দ্দা ঈষৎ তুলিয়া ধরিলেন। শিবাজী দেখেন যে দিলীর খাঁ তীব্রবেগে পুনর্বায় পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন আর দুর্গ প্রাচীর ধোঁয়ায় আবৃত হইয়া গিয়াছে। ঐদিন শ্বাসরুদ্ধকারী গরম আব-হাওয়া। বর্ষা আরম্ভ হওয়ার অনতিপূর্ব্বে আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায় কিন্তু বৃষ্টিহীন থম থমে ভাব। চারিদিকে শুষ্ক দৃশ্য ও ক্লান্তি ও অবসাদে প্রকৃতি যেন শ্বাসরুদ্ধ।

জয়সিংহ ও শিবাজী মুখামুখি দাঁড়াইয়া অবরুদ্ধ ও অবরোধীকারী সৈন্যদিগের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। স্তব্ধ আকাশের তলায় কামানের গোলার ধোঁয়ায় দুর্গের চারি পাশ আচ্ছন্ন। জ্বরে আক্রান্ত কীটপতঙ্গের মত সৈন্যদিগের উত্তেজনাপূর্ণ গতিবিধি ঈষৎ দেখা যাইতেছিল। তাহাদের আর্ত্তনাদের ক্ষীণ শব্দ নিস্তব্ধ আবহাওয়ার মধ্যে ভাসিয়া আসিতেছিল। আর পাহাড়ের কালো শিখর শ্রেণী কামান গর্জনের শব্দে প্রতিধ্বনিত। দুর্গপ্রাকারের একটি প্রাচীরের বুরুজ ধসিয়া পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইট-পাথরের নীচে একদল অবরোধকারী মারাঠা সৈন্য ভূতলে সমাধিস্থ হয়। আফগান সৈন্যরা ধূমায়িত ধ্বংসাবশেষের দিকে বেগে অগ্রসর হইল। দুর্গের দুইটি স্তম্ভ শত্রুর করায়াত্ত হইল। দুর্গের অভ্যন্তর মাত্র এখন অবশিষ্ট। মারাঠা শক্তির এই শেষ কেন্দ্রস্থল ধ্বংস করার জন্য যথাস্থানে কামান স্থাপিত হইতেছিল। তখনও ইহার উপর ছিন্ন ও ধোঁয়ায় মসীময় গেরুয়া রঙের পতাকা উড্ডীয়মান।

শিবাজী জয়সিংহের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন এবং এইরূপ অহেতুক নরহত্যা বন্ধ করার জন্য তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন।

জয়সিংহ বলেন, "আপনার সৈন্যরা এক মিনিটের মধ্যে

আত্মসমর্পণ করিবে।"

সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী উত্তর দেন, "আমার আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহারা আত্মসমর্পণ করিবে না।"

জয়সিংহ তখন প্রস্তাব করেন যে শিবাজী যদি তাহার সৈন্যদিগকে সম্মানজনক সর্ত্তে আত্মসমর্পণের আদেশ দেন তাহা হইলে তিনি দিলির খাঁর নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে নির্দ্দেশ দিবেন। শিবাজী ইহাতে সম্মত হন। তিনি একজন সেনাপতির মারফত সৈন্যদিগের নিকট চিঠি লিখিয়া অনুরূপ নির্দ্দেশ দেন। দুর্গের অভ্যন্তরস্থ মারাঠারা যদিও বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহাদের পক্ষে আর একদিনও প্রতিরোধ চালান সম্ভব হইবেনা তবুও শিবাজী যে এইরূপ আদেশ দিতে পারেন ইহা তাহারা প্রথমে বিশ্বাস করিতে রাজী হয় নাই। শিবাজীকে দ্বিতীয়বার সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহার চিঠির সত্যতা প্রমাণ করিতে হয়।

দিলির খাঁও এই পরিস্থিতিতে মারাঠা সৈন্যদের ন্যায় অসন্তুষ্ট হন। তিনি নব উদ্যমে মারাঠাদের সম্পূর্ণরূপে জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি মনে করিলেন যে আপোষ মিমাংসার ব্যবস্থা দ্বারা তিনি এই গৌরব অর্জনে বঞ্চিত হইলেন। ক্রোধে অধীর হইয়া তিনি পাগড়ি মাটিতে ফেলিয়া দেন, দাঁতে দাঁত কামড়াইতে থাকেন এবং এমনকি নিজের কব্জি হইতে খানিকটা মাংস কামড়াইয়া ছিড়িয়া ফেলেন। পরের দিন জয়সিংহ দূত পাঠাইয়া শিবাজীকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দিলির খাঁকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। এ প্রস্তাবে দিলির খাঁ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু জয়সিংহ এ বিষয়ে জিদ করায় দিলির খাঁ খুব অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হন এবং শেষ পর্য্যন্ত শিবাজীর সহিত সাক্ষাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু শিবাজীকে দেখিবা মাত্র দিলির খাঁ তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মাধুর্য্যে অভিভূত হন। যাঁহারা শিবাজীকে দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দিলির খাঁ তাঁহার তরবারি ও দুইটি প্রিয় অশ্ব শিবাজীকে উপহার দেন। এই দুই বীর পুরুষের সাক্ষাৎ যে ফলপ্রসূ হইবে তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারা যায় নাই। কিন্তু ইহা এমন সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন

হওয়ায় জয়সিংহ হৃষ্টচিত্তে শিবাজীকে এক বিশেষ সম্মানজনক পোষাকে ভূষিত করেন এবং তাঁহাকে একটি রাজ হস্তী এবং মণিমুক্তা খচিত পাগড়ির জরি আভরণ উপহার দেন।

ঐদিন রাত্রিকালে শিবাজী জয়সিংহের সহিত দেখা করিতে তাঁহার তাবুতে যান এবং দেখিতে পান যে জয়সিংহ তাঁহার ইতালিয় গোলন্দাজ সেনাপতি মানুচিচর সহ তাস খেলিতেছেন। জয়সিংহ মানুচিচর সহিত শিবাজীর পরিচয় করাইয়া দেন। মানুচিচ লিখিয়াছেন যে শিবাজী তাঁহার সুন্দর চেহারা দেখিয়া অতিশয় সৌজন্য প্রকাশ করেন এবং বলেন যে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার দেশের একজন রাজা। এই কথা শুনিয়া মানুচিচ খুবই আহ্লাদিত হন। নিজের দৈহিক সৌন্দর্য্য ও গুণাবলি সম্বন্ধে মানুচিচর দুর্ব্বলতা জয়সিংহ বেশ উপভোগ করিতেন। তিনি মানুচিচর প্রতি শিবাজীর ঐ উক্তি সমর্থন করিয়া বলেন যে প্রকৃতি মানুচিচর মন ও দেহ অন্যান্য মানুষ হইতে একেবারে ভিন্নরূপে তৈয়ার করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া মানুচিচ ইউরোপীয়ানদের উচ্চতর গুণাবলি সম্বন্ধে সগর্ব্বে নানারূপ কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলেন যে ইউরোপ্ মহাদেশের রাজারা ভারতীয় রাজগণ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। দুঃখের বিষয় যে শিবাজী ইউরোপীয় রাজাদের ক্ষমতা ও প্রতাপ সম্বন্ধে শোচনীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে তিনি একমাত্র পর্ত্তুগালের রাজার নাম শুনিয়াছেন এবং আরও রাজা আছে কিনা এই সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেন। তবে তিনি মানুচিচকে উত্ত্যক্ত করিবার জন্যই এই প্রকার মন্তব্য করিতেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কারণ সুরাটের ঘটনায় ইংরাজ এবং ওলন্দাজদিগের সহিত ঝগড়া ঝাঁটির পরে তিনি উহাদের সম্বন্ধে অবশ্যই অবগত ছিলেন। যাহা হউক অন্যান্য প্রতাপশালী ইউরোপীয় নৃপতি দিগের তালিকা ও বর্ণনা প্রকাশ করিতে পারিয়া মানুচিচ বেশ সন্তোষ ও গর্ব্ব অনুভব করেন।

পরের দিন সকালে পুরন্দর দুর্গ মুঘলদিগের নিকট আত্ম সমর্পন করে এবং তাহারা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসে। বিজিত হইলেও মারাঠা সৈন্যদেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়। ইহার পর শিবাজী তাঁহার তেইশটি

দুর্গ মুঘলদিগের নিকট সমর্পণ করিতে ও বাদশাহের আনুকুল্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট চিঠি লিখিতে সম্মত হন। ঐ ডাক বাহকের মারফত শিবাজীর চিঠির সৌহার্দ্দপূর্ণ উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া জয়সিংহও আওরঙ্গজেবের নিকট এক গোপনীয় চিঠি লেখেন। তিনি উহাতে বিশষ ভাবে উল্লেখ করেন যে এইরূপ সময়ে ঔদার্য্য প্রকাশ করিলে শিবাজীর স্বাভাবিক বিনীত ও নম্র স্বভাব বাদশাহের প্রতি সকৃতজ্ঞ রাজভক্তিতে পরিণত হইবে। কিন্তু দুর্ব্বল শত্রুর প্রতি এইরূপ উদার ব্যবহার করা আওরঙ্গজেবের স্বভাব বিরুদ্ধ। নীরস ভাষায় তিনি শিবাজীর চিঠির এইরূপ উত্তর দেন, "বিনীত ভাষায় লিখিত আপনার চিঠি পাইলাম। আপনি আপনার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাহিয়াছেন ও আপনার পূর্ব্বের কার্য্যাদির জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন জানিয়া খুশি হইলাম। আপনার চিঠির উত্তরে আমাদের জবাব এই যে আপনার ব্যবহার এতই হীন যে উহা ক্ষমার অযোগ্য। তথাপি রাজা জয়সিংহের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমরা আপনাকে সাধারণ ভাবে ক্ষমা করিলাম।...." বিজিত শত্রুকে উৎসাহী সমর্থকরূপে পাইতে হইলে যে ধরণের ভাষা ও সুর ব্যবহার করা প্রয়োজন এই চিঠিতে তাহার বিশেষ অভাব ছিল। যাহা হউক শিবাজী সন্ধির সর্ত্ত সমূহ পালন করেন। তিনি মুঘল সেনাপতিদিগকে চুক্তি অনুযায়ী দুর্গ মধ্যে প্রবেশের অধিকার দেন এবং জয়সিংহের অধীনে মুঘল সমর বাহিনীতে সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন।

জয়সিংহ যদি মধ্যভারতর রাজপ্রতিনিধিরূপে শিবাজীর উর্দ্ধতন পদে দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকিতেন তবে সম্ভবতঃ মুঘল বাদশাহের প্রতি শিবাজীর আনুগত্য অক্ষুন্ন থাকিত। দুঃখের বিষয় যে সাম্রাজ্যের সেনাপতিদিগের কার্য্যকলাপের প্রতি সর্ব্বদা সন্দিগ্ধচিত্ত আওরঙ্গজেব একজন প্রাক্তন বিদ্রোহীর প্রতি জয়সিংহের শ্রদ্ধাপন্ন মনোভাব সুনজরে দেখিতে পারিলেন না ; তিনি বরং এই পরিস্থিতিতে আরও দুশ্চিন্তান্বিত হইলেন। দুই হিন্দুনেতা একত্র মিলিত হইয়াছে। একজন রাজপুত সেনাপতি বাদশাহের প্রতি যতই অনুগত হন না কেন তিনি স্বভাবতঃই তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বীর সহিত ব্যবহারে অতিশয় উদারনীতি অবলম্বন করিবেন- এই চিন্তা সর্ব্বদাই আওরঙ্গজেবকে পীড়া দিতে লাগিল। বাস্তবিক

শিবাজীকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া মারাঠা স্বাধীনতার বাহ্যিক রূপ উচ্ছেদ করিবার জন্য তিনি জয়সিংহকে দক্ষিণ ভারতে পাঠাইয়া ছিলেন। কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে জয়সিংহ শিবাজীর সহিত অত্যন্ত অনুকূল সর্ত্তে সন্ধি করিলেন। কিন্তু শিবাজী যে এই সর্ত্তগুলি পালন করিবেন তাহারই কি প্রমাণ আছে? তিনি তো জয়সিংহকে ও তাঁহার দলে যোগদান করিতে রাজী করাইতে পারেন। রাজপ্রাসাদে শায়স্তা খাঁয়ের বেগমের প্ররোচনায় তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও সমর্থকগণ আওরঙ্গজেবের দুশ্চিন্তার অগ্নি-শিখায় ক্রমশঃ ইন্ধন জোগাইতে লাগিল।

বাদশাহের ক্ষমা বাহনকারী নীরস চিঠি পাওয়ার অল্পদিন পরেই শিবাজী তাঁহার নিকট হইতে এক দ্বিতীয় চিঠি পাইলেন। এই চিঠির ভাষা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। সম্রাট লিখিয়াছিলেন, "আপনি বর্ত্তমানে আমাদের সাম্রাজ্যের এক শিবিরে সেনাপতিরূপে কাজ করিতেছেন।.... আপনার কাজের পুরস্কার স্বরূপ আপনাকে এই সঙ্গে একটি সুন্দর পরিচ্ছদ ও মণিমুক্তা খচিত একখানা ছোট তরবারি পাঠাইলাম।" কাহাকেও খুশি করিবার জন্য তাহার প্রতি প্রশংসামূলক ভাষা প্রয়োগ করা ছিল আওরঙ্গজেবের স্বভাব বিরুদ্ধ। তাঁহার ন্যায় কটুভাষী স্বৈরাচারী শাসক যে শিবাজীকে একটি "সুন্দর মণিমুক্তা জরিত তরবারি" উপহার দিতে চাহিলেন ইহা সাধারণতঃ বাঘিনী বা ডাইনীর কৃত্রিম মমতা প্রকাশের অনুরূপ। ইহার পর আর একখানা চিঠি আরও অধিকতর বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন ভাষায় লিখিত। ইহাতে প্রথমতঃ লিখিত ছিল, "আপনার সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা।" কিন্তু পরক্ষণেই আওরঙ্গজেবের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়।...... "সুতরাং আমরা ইচ্ছা করি যে আপনি যত সত্বর সম্ভব এবং কালবিলম্ব না করিয়া আমাদের দরবারে আসুন। আপনার সহিত সাক্ষাৎকারের সময় আমরা আপনার প্রতি সম্মানীয় অতিথির ন্যায় ব্যবহার করিব এবং শীঘ্রই আপনাকে নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দিব।"

আওরঙ্গজেব দরবারে শিবাজীর উপস্থিতির জন্য যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন উহা আপাতঃ দৃষ্টিতে অন্যায় বলিয়া মনে হয় না। ফরাসী দেশের রাজা চতুর্দ্দশ লুইয়ের মত মুঘল সম্রাটেরাও তাঁহাদের অধিকতর

ক্ষমতাশালী সামন্তজায়গীরদার ও করদ রাজগণের স্ব স্ব এলাকায় বাস অপেক্ষা দরবারে উহাদের উপস্থিতি বেশী পছন্দ করিতেন। কারণ নিজ এলাকায় উহারা যথেষ্ট অবসর ও সুযোগ পাওয়ায় কল্পিত অন্যায়ের অজুহাতে বা উচ্চাকাঙ্খার বশবর্ত্তী হইয়া সম্রাটের প্রতি বিরুদ্ধাচরণে প্রলুব্ধ হইত। এমন কি রাজপুতনায় মহামহিমন্বিত রাজাদিগকেও সম্রাটের দরবারে হাজির থাকিতে হইত। অতীতে ও বর্ত্তমানে হিন্দু রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সূর্য্যবংশ সম্ভুত দেবোপম উধয়পুরের মহারাণা একমাত্র দরবারে উপস্থিতিরি সর্ত্ত হইতে অব্যাহতি পাইতেন। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত শিবাজী অনুরূপ ব্যবহার আশা করিতে পারিতেন না। ইহা সত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের পক্ষে এইরূপ আকস্মিক ও সমাদর এবং আতিথ্যপূর্ণ প্রস্তাব একটু অদ্‌ভুত বলিয়া মনে হইল।

শিবাজীর এখন উভয় সঙ্কট। বাদশাহের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলে শিবাজীকে নূতন করিয়া শত্রুতার অপরাধে গ্রেপ্তার এবং সম্ভবতঃ হত্যা করিবার একটা অজুহাত পাওয়া যাইত। এদিকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে নিজের দেশ ও আত্মীয় স্বজন হইতে শত শত মাইল ব্যবধানে তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে দরবারে বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে। আওরঙ্গজেবের চরিত্র সম্বন্ধে যাহারা বিন্দুমাত্রও অবগত ছিলেন তাঁহারা তাঁহার হঠাৎ মত পরিবর্ত্তনের আন্তরিকতা বা তাঁহার প্রদত্ত শিবাজীর গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি—ইহার কোনটার উপরেই আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেন না।

পূর্ব্বের ন্যায় এখনও শিবাজী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেই মাতার উপদেশ চাহিতেন। এইবারও শিবাজী মাতার মত জানিতে চাহেন। জীজাবাই গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন এবং অবশেষে অনিচ্ছা সহকারে শিবাজীকে বাদশাহের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। অতঃপর শিবাজী জয়সিংহের পরামর্শ চাহিলেন। জয়সিংহ স্বভাবতঃই শিবাজীর দরবারে উপস্থিত হওয়া সমর্থন করেন। শিবাজীর ব্যক্তিত্বে তিনি নিজে এতদূর বিমোহিত হইয়াছিলেন যে রাজধানীতে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহে ছিলেন। তিনি মনে করিলেন যে মারাঠা নেতার ঈষৎ নত মুখে সরল হাসির রেখার অদ্ভুত সৌন্দর্য্য দেখিলে আওরঙ্গজেবের

সন্দেহ প্রশমিত হইবে ; এবং শিবাজীও আওরঙ্গজেবের সৌজন্যে এবং দরবারে ওমরাহদের সুমিষ্ট ব্যবহারে তাঁহার স্থানীয় আশা আকাঙ্খার কথা ভুলিয়া সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে রাজকার্য্যে জড়িত হইয়া পড়িবেন। সংশয় চিত্তে শিবাজী একবার উল্লেখ করেন যে এই নিমন্ত্রণ তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার ষড়যন্ত্রের একটা উপলক্ষ্যও হইতে পারে। ইহা শুনিবামাত্র জয়সিংহ প্রস্তাব করেন যে বাদশাহের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা প্রদর্শনের জন্য তিনি তাঁহার পুত্র রামসিংহকে শিবাজীর নিকট জামিন রাখিতে প্রস্তুত। "সেই আপনার সঙ্গে দরবারে যাইবে ও সর্ব্বদা আপনার পাশে থাকিবে।" বাদশাহী শিবিরে শিবাজীর আগমনের পর হইতেই রামসিংহ মনে মনে শিবাজীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্নিকটে থাকিতে পারিবেন ভাবিয়া রামসিংহও হৃষ্টচিত্তে পিতার প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অবশেষে শিবাজী সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনে সন্দেহ ও অশুভ লক্ষণের পূর্ব্বাভাস উদিত হইতে লাগিল। তিনি যদি আর ফিরিয়া আসিতে না পারেন এই আশঙ্কায় তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার মাতাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া জীজাবাইয়ের নিকট তিনি রাজ্যভার অর্পণ করেন। মেসিডন দেশের রাণীদিগের মত জীজাবাইও তাঁহার পূজা পার্ব্বণ ও গৃহস্থালীর কাজ স্থগিত রাখিয়া রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং শান্তসমীহভাবে শিবাজীর মন্ত্রণা সভার নেত্রীরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহার পর শিবাজী মন্ত্রীদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। শিবাজীকে আলিঙ্গন করার সময় তাঁহারা অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মারাঠা রাজ্যের পীতবর্ণ শষ্যক্ষেত্রে ও বেগুনি রঙের পাহাড়গুলির দিকে শিবাজী একবার দৃষ্টিপাত করেন। তখন হয়তো তিনি মনে করিয়াছিলেন যে স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি এই তাহার শেষ দৃষ্টি। তাহার পর অশ্বারোহণ করিয়া শিবাজী উত্তর দিকে সুদীর্ঘ যাত্রা আরম্ভ করেন। তাঁহার এক পার্শ্বে তাঁহার তরুণ পুত্র শম্ভুজী এবং অপর পার্শ্বে জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ, আর পিছনে মারাঠা অশ্বারোহী সঙ্গীদল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মুঘল বাদশাহের দরবার এখন আগ্রায় অবস্থিত। এই নগরীর "চারিপাশের প্রদেশগুলি কৃষিসম্পদে খুব সমৃদ্ধ ও উন্নত। ভারতবর্ষের মধ্যে এই অঞ্চলেই সব রকম সামগ্রীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচুর্য্য। এখানে প্রচুর চিনি প্রস্তুত হয়। পথের দুই দিকে বৃক্ষশ্রেনী বিরাজিত। ইহাদের অধিকাংশই মালবেরী বা তুঁতে জাতীয় গাছ। প্রতি দশ বার মাইল অন্তর বাদশাহের আদেশে নির্ম্মিত সরাইখানা ও পান্থশালা অবস্থিত। এই বাড়ীগুলি রাস্তার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। ইহারা বাদশাহের কীর্ত্তির স্মারক এবং পথিকের চিত্তবিনোদনকারী। এখানে বিশ্রামের জন্য ঘর এবং ঘোড়া বাধিবার স্থান পাওয়া যায়। যথেষ্ট পরিমানে ঘোড়ার মাংসও এখানে মজুত থাকে।" (১) সরাকর পরিচালিত অতিথিশালা পূর্ণ এই ছায়া সুনিবিড় রাস্তায় শিবাজী ও তাহার সঙ্গীগণ আগ্রায় পৌঁছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক অতিথিশালা গুলিতে কিন্তু গ্রীষ্মকালেও সকলকে ঘরের ভিতর শয়ন করিতে হইত। কারণ "চোরের ভয়ে" সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সমস্ত দরজা বন্ধ রাখিতে হইত। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীনগরী অপেক্ষা আগ্রা শহর আরও জমকালো। ইহার আয়তন দিল্লী অপেক্ষা বেশী এবং এখানে বেসরকারী অট্টালিকাগুলি অনেক বেশী জাঁকজমক পূর্ণ। নবনির্ম্মিত দিল্লী শহরের ন্যায় ইহা কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুত হয় নাই। ইহার চতুর্দ্দিকে কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রাচীরও ছিল না। সুতরাং ইহার বৃহৎ আয়তন সত্ত্বেও এই নগরী যে এক বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী এরূপ মনে হইত না। ইহাকে অনেকটা প্রাদেশিক শহর বলিয়া মনে হইত। শেঠদিগের প্রস্তর নির্ম্মিত সুদীর্ঘ অট্টালিকা এবং তোরণ ও আম্রবৃক্ষের উদ্যান শোভিত ওমরাহদের সৌধশ্রেণীর মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ আঁকা বাঁকা পথ চলিয়া গিয়াছে। শহরের সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও কুঞ্জযুক্ত বাগান। উহাতে নানা রকমের গাছ ছিল।

---

(১) রিচার্ড ষ্টীল প্রণীত "রিলেশন" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

আপেলের গাছও দেখা যাইত যদিও উহা সংখ্যায় খুব বেশী ছিল না।(১) অন্যান্য ফল বৃক্ষের মধ্যে ছিল, কমলালেবু, মালবেরী, আম, নারিকেল, ডুমুর, কদলী, ইত্যাদি। সারি সারি কদলিবৃক্ষ বাগানের চারিপাশে শোভা পাইত। অন্যান্য উদ্যানে নানা রকমের ফুল এবং ওষধি। ফুলের মধ্যে গোলাপ অপর্য্যাপ্ত, দেশী ও বিদেশী গাঁদা, লাল, গোলাপী ও শ্বেত বর্ণের নাম-না-জানা অজস্র ফুল নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর গাছে ফুটিয়া আছে। বাগানে জলসরবরাহের জন্য কৃত্রিম ফোয়ারা। ইংরাজ পর্য্যটক ফিঞ্চ আগ্রার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই শহর এত বিস্তৃত, ও বিশাল এবং এত অগণিত লোকে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ যে রাস্তা দিয়া চলিতে কষ্ট হয়। শহরটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি; ভিতরের দিকে ৫ সেণ্টিগ্রেড চলিয়া গিয়াছে। নদীর ধারের পরিমাপও ঐরূপ। নদীর ধারে সারিসারি ওমরাহদের সৌধ বিরাজ করিতেছে।" সঙ্কীর্ণ পথে কোনরূপে চলিতে চলিতে হঠাৎ পথিক রাজপ্রাসাদের সম্মুখীন হইত। নদীর ধারে অবস্থিত এই প্রাসাদ লাল পাথরে নির্ম্মিত। প্রায় এক চতুর্থাংশ মাইলব্যাপী নদীর ধার দিয়া বহিয়া প্রাসাদের অট্টালিকা নগরের অভ্যন্তরে বাঁকিয়া গিয়াছে। প্রাসাদের এই দিকের দৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা জমকালো। সুউচ্চ ও সচ্ছিদ্র বিশাল প্রাচীর। উহার উপর দিয়া বাদশাহের ও অন্যান্য রাজপুরুষ-দিগের সৌধশ্রেণী মাথা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন সৌধের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া। "তিন চারমাইল পরিধিযুক্ত বিশাল প্রাচীর বেষ্টিত এই প্রাসাদের চারিদিকে প্রকাণ্ড পরিখা; তাহার উপর মাঝে মাঝে অপসরনীয় সেতু।" ফিঞ্চ মনে করেন "এই প্রাসাদ প্রাচ্যের সর্ব্বোত্তম ও অতুলনীয় অট্টালিকা।"

দরবারে ওমরাহ বা সভাসদদিগের মধ্যে অনেকের আগ্রা নগরীতে নিজ নিজ প্রাসাদ ছিল। কেহ কেহ আগ্রার দরবারে অধিবেশনের সময় বন্ধুবান্ধবের সহিত একত্র বাস করিতেন, কেহ বা সমৃদ্ধপন্ন শ্রেষ্ঠিদের

(১) সমরখন্দের বাগিচা হইতে আকবর বাদশাহ আপেল গাছ সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষে আমদানি করেন।

গৃহেও অতিথি হইতেন। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এখানে বংশানুক্রমিক কোন অভিজাত সম্প্রদায় ছিল না। কেবল করদ রাজারা নিজেদের রাজ্য উপভোগ করার জন্য বাদশাহের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতেন অথবা তাঁহার অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত থাকিতেন। অন্যান্য সভাসদেরা ছিলেন উচ্চ পদস্থ বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী। তাহাদের সম্মান ও পদমর্য্যাদা বাদশাহের সাময়িক অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত, এবং উহা প্রায়ই পরবর্ত্তী বাদশাহের আমলে আর উপভোগ করা চলিত না। কয়েকটি পরিবার অবশ্য বিবাহসূত্রে বাদশাহী পরিবারের সহিত কুটুম্বিতায় আবদ্ধ ছিল এবং তাহারা খুব প্রতিপত্তির সহিত দরবারে বিরাজ করিত। কিন্তু এইরূপ অধিক ঘনিষ্ঠতার খানিকটা বিপদ'ও ছিল। কখনও কখনও নিরাপত্তার অজুহাতে কোন কোন 'ওমরাহকে দূরবর্ত্তী প্রদেশে, এবং এমনকি কারাবাসেও প্রেরণ করা হইত। দরবারের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেকটা নিয়তি এবং সন্দেহবাদের উপর নির্ভর করিত। পূর্ব্ববর্ত্তী ঐশ্বরিক অস্তিত্বে সন্দেহবাদী বাদশাহদিগের রাজত্বকালে দরবার ছিল গোঁড়ামির কেন্দ্র। কিন্তু ক্রমশঃ অতিবিক্ত গোঁড়ামির পরিবর্ত্তে দরবারেও সন্দেহবাদ প্রকট হইতেছিল। অধিকাংশ 'ওমরাহগণ আকবরের স্বয়ংসম্ভূত ঐশ্বরিক প্রেরণা এবং জাহাঙ্গীরের আলস্যজনিত সহিষ্ণুতার নিন্দা করিতেন বটে, কিন্তু আওরঙ্গজেবের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অতিপ্রাচীন ও সেকেলে রীতিনীতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টাও তাহারা অবজ্ঞার চোখে দেখিতেন। অন্যান্য অজ্ঞতাবাদী সমাজের মত এখানেও প্রচুর পরিমাণে কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। জ্যোতিষী এবং জাদুবিদ্যা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক ব্যবসা। ঐ সময়ে কৃতবিদ্য জাদুকর ছিলেন একজন পর্ত্তুগীজ। তিনি ইউরোপীয় দুইখানি পুরাতন পুস্তক এবং কতকগুলি অস্পষ্ট কথার সাহায্যে ও অপরিমেয় আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া পাশ্চাত্য জাদুবিদ্যায় তাঁহার অদ্ভুত পারদর্শিতার সম্বন্ধে সকলের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইয়াছিলেন। (১)

(১) বার্ণিয়ার। যদ্যাপিও ভারতীয় জাদুকরেরা প্রায়ই তাহাদের ইউরোপে শিক্ষালাভের কথা সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়া থাকে।

শাহজাহানের রাজত্বকালে প্রধানতঃ ওলন্দাজ এবং আর্ম্মানী বণিকদের বিরাট কুঠি স্থাপনের ফলে আগ্রা নগরীর সমৃদ্ধি অনেক পরিমানে বৰ্দ্ধিত হয়। ইহাদের ব্যবসার সামগ্রী ছিল: বনাত-কাপড়, দর্পণ, সোনারূপা, কারুকার্য্যময় লেপ এবং লোহার বাসন-পত্র," ইত্যাদি। মুঘলদরবারের সহিত কার্য্য পরিচালনায় সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ ছিলেন ওলন্দাজগণ। সংবাদ সরবরাহ করার জন্য দরবারে নিজস্ব গোয়েন্দা দূত নিযুক্ত করিয়া তাঁহারা বেশ লাভবান হন। "মুঘল গভর্ণর বা রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত কুঠিগুলির কোন ক্ষতি করিলে দরবারে নিযুক্ত তাহাদের গুপ্ত-প্রতিনিধির সাহায্যে ক্ষতিপূরণের জন্য তাঁহারা দরবারে আরজি পেশ করিয়া অনেক কাজ হাসিল করিতে সমর্থ হন।"(১) তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দী ইংরাজ বণিকেরা শাহজাহনের রাজত্বকালে আইনের শাসন ক্রমশঃ শিথিল হওয়ায় তাঁহাদের কুঠির কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এমনকি সুরাট হইতে আগ্রা যাতায়াতের রাজপথে পর্য্যন্ত প্রায়ই ডাকাতের অত্যাচার ও লুঠতরাজ হইত।

আকবরের রাজত্বকালে আগ্রায় 'যেসুইটি' (Jesuit) মিশনারিদিগের একটি গির্জ্জা স্থাপিত হয়। ইহার ঘন্টাঘর ছিল খুব বড় এবং ঘন্টাধ্বনি সহরের সর্ব্বত্র শোনা যাইত। কিন্তু ইহাতে গোঁড়া মসলমানেরা ক্ষেপিয়া উঠে। রাজধানীতে বিদেশী ধর্ম্মের পূজাপদ্ধতির প্রচলন তাহারা পছন্দ করিত না। শাহজাহানের নিকট নালিশ করিয়া তাহারা এই ঘন্টাঘরটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কৃতকার্য্য হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে খৃষ্টানগনের রাজপথে শোভাযাত্রা প্রভৃতি প্রকাশ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছিল। উহা এখন আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। জাহাঙ্গীরের সময় খৃষ্টানদের প্রতি উদার ব্যবহার একটা খেয়ালে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু শাসক কর্ত্তৃপক্ষের সক্রিয় বিরোধিতার ফলে ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায় ক্রমশঃ উহার প্রতি অবহেলা প্রকাশ করিতে লাগিল। খুব কম লোকই ইদানীং গির্জ্জায় যাইত।

সহরের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল আকবরের সমাধিসৌধ। উহার

(১) বার্ণিয়ার

কারুকার্য্য বৌদ্ধযুগের শিল্পের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। "প্রায় দুই মাইল পরিধি ব্যাপ্ত ও ইটের প্রাচীর বেষ্টিত এক বৃহৎ ও সুন্দর উদ্যানের মধ্যে এই স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল।" ইহার সন্নিকটে ছিল আকবরের আশ্রিত রমণীদিগের বাসের জন্য একটি অট্টালিকা। প্রত্যেক রমণীকে আকবর উইল করিয়া বিস্তর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন। "চিরকাল ঐখানেই একরূপ মাঠের মধ্যে জীবনযাপন করিতে করিতে হইবে এই মনে করিয়া সম্রাটের শোকে বিলাপ করিতে করিতে রমণীরা দিন কাটাইতেন।" পূর্ব্বদিকে যমুনার সম্মুখে অবস্থিত ছিল তাজমহল। স্বীয় মহিষীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে শাহজাহানের নির্ম্মিত এই সমাধি সৌধে আজিকার ন্যায় তখনও নিত্য বহু দর্শনার্থীর সমাগম হইত। কিন্তু আজ যেমন তাজমহল সরকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পদরূপে রক্ষিত একটি অমূল্য স্মৃতি সৌধ, তখনকার দিনে ইহা ঠিক তাহা ছিল না। তখন ইহা ছিল একটি সমাধি মন্দির। ইহার অভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠ বৎসরে মাত্র একবার খোলা হইত এবং উহাতে কোন অমুসলমান এবং নাস্তিক ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। উদ্যানের তোরণ শোভিত পথে এবং সোপান-শ্রেণীতে সপ্তাহে তিনবার শাহজাহানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী দরিদ্রগণকে ভিক্ষা দেওয়া হইত। কারণ আওরঙ্গজেব পিতার ধর্ম্ম-বিষয়ক নির্দ্দেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। কিন্তু পিতাকে দীর্ঘকাল বন্দী করিয়া রাখায় অনেকের নিকট আওরঙ্গজেবের পিতৃভক্তি কপট বলিয়া মনে হয়। তবে এই সময় লোকে সিংহাসন চ্যুত সম্রাটের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। দীর্ঘ সাতবৎসর প্রাসাদের যেস্‌মিন টাওয়ারে (Jesmine Tower) বৃদ্ধ সম্রাট অতি শোচনীয় অবস্থায় দিন কাটাইয়াছিলেন। তখন কেবলমাত্র শাহজাদী জাহানারা সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাঁহার দুঃখ লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন। সম্রাটের শেষ বয়সে দুঃখের দিনে তাঁহার অনুরক্ত কন্যার সেবা শুশ্রূষার কাহিনী ভারতীয় জনগণের মনে গভীর রেখাপাত করে। একদিন যিনি দরবারে প্রথমা মহিলা হিসাবে বিরাজ করিতেন এবং আওরঙ্গজেবের অগ্রগতির যিনি বিরোধিতা করিয়াছিলেন অদৃষ্টের পরিহাসে তিনি আজ আওরঙ্গজেবের প্রিয় ভগিনী বিজয়িনী রোশানারার কৃপা প্রার্থী! জনপ্রিয়

শিল্পীরা চিত্রে দুই ভগিনীর একত্র ছবি আঁকিয়াছেন। পরস্পরের প্রতি স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া দুইজনে যেস্‌মিন টাওয়ারের ঝুলান বারান্দায় পাশাপাশি বসিয়া মন্থরগতিতে প্রবাহিনী পিঙ্গলবর্ণা যমুনার উপর দিয়া তাকাইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাজমহলের শ্বেতমর্ম্মরের মনোরম দৃশ্য দেখিতেছেন যে মর্ম্মরসৌধ বিশ হাজার শ্রমিক বাইশ বৎসর ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে।

এই গদিচ্যুত সম্রাটের বন্দী অবস্থার কোন কোন ঘটনা তাঁহার প্রতি লোকের মনে গভীর সহানুভূতি সৃষ্টি না করিয়া বরং কৌতুহল জন্মায়। আওরঙ্গজেব সর্ব্বদাই পিতার মৃত্যু আকাঙ্খা করিতেন বটে, কিন্তু তিনি সরাসরি এইরূপ একটা হিংস্র আদেশ দিতে নিজের মনকে রাজী করাইতে পারেন নাই। ইহার পরিবর্ত্তে তিনি অন্যভাবে পিতার মৃত্যু ত্বরান্বিত করিতে চেষ্টা করেন। শাহজাহানের জীবন অতিষ্ঠ করিবার জন্য তাঁহার বাসগৃহের জানালার ঠিক নীচে আওরঙ্গজেব খুব জোরে ঢাক, দুন্দুভি, ঘন্টা প্রভৃতি বাজাইতে এবং বাজীর বোমা ফাটাইতে, যুদ্ধের তাণ্ডব চীৎকার করিতে ও প্রাচীরের গায়ে জলভর্ত্তি মাটির কলসী ইত্যাদি ফেলিয়া তীব্র আওয়াজ ও গণ্ডগোল করিতে লোক নিযুক্ত করিয়া এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিতে আদেশ দেন। কিন্তু দরবারের জনশ্রুতি (১) অনুযায়ী এইসব গোলমাল শাহজাহানকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি বরং অতিরিক্ত মদ্যপানে বিভোর হইয়া কলরব করিতে করিতে, নাচিয়া কুঁদিয়া, অশ্লীল গান গাহিয়া এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ক্রীতদাসীদিগকে পাইবার জন্য সশব্দে হাঁক দিয়া জানালার বাহিরে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত বাদ্যকরদিগকে হতাশ করিতেন। তাঁহাকে বিষপানে হত্যা করার কয়েকটি অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সমসাময়িক গুজব অনুযায়ী শেষপর্য্যন্ত পুত্রের দীর্ঘকালব্যাপী অপকার্য্য বিফল করিয়া আত্ম অহঙ্কার দ্বারাই তিনি নিজের মৃত্যু ডাকিয়া আনেন। একদিন সকালে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া গোঁফে তা দিতে দিতে তিনি আয়নার প্রতিবিম্বে দেখিতে পান যে দুইটি ক্রীতদাসী যুবতী বৃদ্ধ সম্রাটের ক্ষীয়মান

(১) মানুচিচ।

পুরুষত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিতেছে। এই বিষয়ে কোনরূপ শ্লেষ সম্রাট সহ্য করিতে পারিতেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি কামোদ্দীপক ঔষধ আনিতে আদেশ দেন। ঐ ঔষধ অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করায় তাঁহার এমন অসাড় অবস্থা হয় যে মানুচিচ লিখিয়াছেন যে ইহার পরে তিনি আপেলের ঘ্রাণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন। তাঁহার চেতনা আর ফিরিয়া আসে নাই।

নদীর ধারে তাজমহলের মুখামুখি বড় বড় ওমারাহদের বিশাল অট্টালিকা শ্রেণী অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে একটি ছিল, "জয়পুর প্রাসাদ" নামক রাজা জয়সিংহের আবাস বাটি। ১৬৬৬ সালের মে মাসের এক সন্ধ্যায় এই প্রাসাদে অতিথি শিবাজীকে সঙ্গে লইয়া রামসিংহ আসিয়া পৌছিলেন। অট্টালিকাটি অতি মনোরম। ইহার দেওয়াল এবং ছাদ সোনার পাতে মোড়া অথবা নানা রকমের ফুল ও ফলের নক্সার চিত্রনে শোভিত। কারুকার্য্য মণ্ডিত কুলুঙ্গীতে চীনামাটির বাসন ও ফুলদানি। মেজেতে সিল্কের কার্পেট বিছান। আরামে পদক্ষেপ করিয়া চলাফেরা করার সুবিধার জন্য উহার নীচে কয়েকখানা পুরু গদি পাতা। কারণ বর্ত্তমান কালের ন্যায় তখনও দরজার বাহিরে পাদুকা রাখা হইত। সামনের ঘরগুলির আসবাবের মধ্যে ছিল মাত্র এক একটি প্রকাণ্ড তাকিয়া। উহা সোনালী রঙ্গের কাপড়ে বা ভেলভেটে বা সাটিনে আবৃত। হেলান দিয়া বসবার জন্য দেওয়ালের এক পাশ হইতে অপর পাশ পর্য্যন্ত তাকিয়া বালিশ সজ্জিত ছিল।

শিবাজী আগ্রায় আসিবার তিন দিন পরে বাদশাহের দরবার অধিবেশনের দিন ধার্য্য হইয়াছিল। ঐ দিন আওরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য শিবাজী আহূত হইলেন।

রামসিংহ ও শিবাজী তাহাদের অনুচরবৃন্দসহ প্রাসাদের সিংহদ্বারে উপনীত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করেন। কারণ, সম্রাটের নিজ-বংশের রাজপুত্র ব্যতীত অন্যকেহ প্রাসাদের প্রাঙ্গনে ঘোড়ায় চড়িয়া অগ্রসর হইতে পারিতেন না। অন্যান্য উচ্চপদস্থ ওমরাহগণের ন্যায় তাহাদের আগমনও সিংহদ্বারের উপরিস্থ নহবৎখানা হইতে বাদ্য বাজাইয়া ঘোষণা করা হইল। প্রথামত সামরিক কায়দায় বারটি বংশী, বারটি

ঝাঁঝ করতাল ও বিশ জোড়া ঢাকের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া তাহারা চলিতে লাগিলেন।(১) লাল তোরণ শোভিত খিলানে ঢাকা পথে ধীর পদক্ষেপে তাঁহারা দেওয়ানী-আমের স্তম্ভশ্রেণীর নিকটে আসিলেন। উহার দুইদিকে মুঘলদিগের বহুবিখ্যাত রোমাঞ্চকর ও মনোরম উদ্যান। পৃষ্ঠে মণিমুক্তা বিজড়িত সিল্কের ফিতায় বাঁধা দোলায়মান জিন ও রূপার ঘন্টা সহ উদ্যানে ইতস্ততঃ বিচরণশীল গৃহপালিত হরিণের এবং লাল ও সোনালী রঙের পোশাকে সজ্জিত উজবেক শিকারী কুকুরদিগের বেশ-ভূষার জাঁকজমক স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভশ্রেণীর পাশে দণ্ডায়মান ওমরাহগণের পুষ্পখচিত সাটিন বস্ত্রের পোশাকের অপেক্ষা নেহাত কম ছিল না।

দরবারে তত্ত্বাবধানকারী রাজকর্ম্মচারীরা শিবাজী ও রামসিংহকে দেওয়ানী-আম ভবনে লইয়া আসিলেন। প্রধান প্রাসাদের সংলগ্ন কারু-কার্য্যময় বস্ত্রাদি ও কার্পেটে আবৃত এই বিরাট কক্ষের তিন দিকেই উন্মুক্ত উদ্যান। ইহার দেওয়াল, ছাদ, ও স্তম্ভশ্রেনী সবই স্বর্ণমণ্ডিত ও নীলকান্তমণি শোভিত। ভিতরে প্রবেশ করিয়া শিবাজী সম্রাটের পারিবারিক আবাস প্রাসাদের ও এই কক্ষের বিভাজক বিরাট লালরঙের প্রাচীর দেখিতে পাইলেন। দেওয়ালের মাঝখানে সিংহাসনের নিমিত্ত ঝুলান বারান্দা। 'ভগবানের প্রতিকৃতির আসন' রূপে উহা খ্যাত ছিল। সম্রাট নিজ আবাসগৃহ হইতে ঐ স্থানে উপনীত হইতেন। দ্বিপ্রহরে মৃদঙ্গ ও ভেরীবাদ্যের সঙ্গে তাল রাখিয়া বারান্দার পিছনের পুষ্পখচিত পরদা ধীরে ধীরে অপসরণ করা হইলে সম্রাট দরবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। তাঁহার পশ্চাতে নীল মণিমুক্তা নির্ম্মিত বিরাট ময়ূর এবং মস্তকোপরি লাল ভেলভেট কাপড়ের পদ্মরাগ-মণি ভূষিত দুইটি রাজছত্র। সম্রাটের পরিধানে শ্বেত সিল্কের বস্ত্র, মস্তকে সোনালী কাপড়ে নির্ম্মিত মণি-মুক্তা-হীরক খচিত পাগড়ি ও ললাটের মধ্যখানে অতি উজ্জ্বল ও বৃহৎ পুষ্পরাগমণি শোভিত। সম্রাটের পশ্চাতে ও উভয়পার্শ্বে একদল খোজা চামর ও ময়ূরের পালকের পাখা

(১) দরবারে অনুষ্ঠিত কাহিনী বার্ণিয়ার ও থেবেনোর লিখিত গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

লইয়া ব্যজনে রত। বারান্দার নীচে রেলিং বেষ্টিত খানিকটা জায়গা বাদশাহের পরিবারের রাজপুরুষদিগের এবং করদ রাজা ও বিদেশী রাজদূতগণের জন্য রক্ষিত। এখানেও পাখা, মাছি তাড়াইবার চামর ও রূপার পিকদানি হাতে ভৃত্যগণ দণ্ডায়মান।

রেলিং বেষ্টিত স্থানে প্রবেশাধিকার লইয়া অনেক সময়ই দুরূহ সমস্যার উদ্ভব হইত। হকিন্স (Hawkins) লিখিয়াছেন "এই লাল রেলিং-এ বেষ্টিত স্থান অন্যান্য ওমরাহদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান অপেক্ষা তিন ধাপ উচু। এই রেলিংএর ভিতরে প্রবেশদ্বারে রক্ষীদল পাহারা দেয়। শ্বেতদণ্ড হস্তে তাহারা দরবারীদিগের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করে। মধ্যখানে ঠিক বাদশাহের সম্মুখে একজন কাজী দণ্ডায়মান থাকেন। তাঁহার পাশে থাকে প্রধান জহ্লাদ ও আরও চল্লিশজন জহ্লাদ। তাহাদের মাথায় একপ্রকারের তুলার টুপি। উহা অন্যান্য সকলের টুপি অপেক্ষা পৃথক ধরনের। তাহাদের স্কন্ধে ঝুলান এক একটি ক্ষুদ্র কুঠার এবং হাতে নানা প্রকারের চাবুক।" এই বেষ্টনী হইতে বহিষ্কারের আদেশ হইলে বুঝিতে পারা যায় যে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বাদশাহের অসন্তোষ ভাজন হইয়াছেন। হকিন্স ও কিছুকাল বাদশাহের প্রীতি লাভ করিয়া পরে যেসুইটদিগের "রক্তাক্ত খুনের ষড়যন্ত্রে" জড়িত থাকার অভিযোগে বাদশাহের অসন্তোষ ভাজন হন। পরে "বাদশাহের নিকট আর্জ্জিপেশ করিলে তিনি আবার (হকিন্সের) দরখাস্ত শুধু যে না-না-মঞ্জুর করেন তাহাই নহে, অধিকন্তু আদেশ দেন যে আমাকে (হকিন্সকে) যেন কখনও এই রেলিং বেষ্টিত সম্মানীত স্থানে প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়।"

বাদশাহ দরবার কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র সমুদয় ওমরাহবৃন্দ রঙ্গালয়ের নৃত্যকরদিগের মত অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত মস্তক নত করিয়া বক্ষের উপর আড়াআড়ি ভাবে হাত রাখিয়া এমনভাব দেখাইতেন যে সম্রাটের আবির্ভাবের জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে তাহারা যেন বিস্ময়ে অভিভূত।

তারপর ধীরে ধীরে দরবারের আনুষ্ঠানিক কাজ আরম্ভ হইত। প্রথম অনুচচ সঙ্গীতের সহিত তাল রাখিয়া রাষ্ট্রীয় হাতীগুলিকে সম্রাটের বারান্দার সম্মুখে আনা হইত। ঐ হাতীগুলির সমস্ত শরীর কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আবৃত। কেবল মস্তকভাগ লালবর্ণের কাপড়ে সজ্জিত। তাহাদের

পৃষ্ঠদেশের গদি কারুকার্য্যময় কার্পেটে জড়িত এবং দুইদিকে প্রকাণ্ড রৌপ্য নির্ম্মিত ঘন্টা দোলায়মান। সঙ্গে তিব্বতীয় ষাঁড়ের পুচ্ছ-নির্ম্মিত ব্যজন। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রীয় হাতীর পাশে অনুচর হিসাবে দুইটি ছোট হস্তী সঙ্গে আসিত। তাহাদের পোষাক অনেকটা সাদাসিধা ধরনের। প্রত্যেকটি হাতী নিকটস্থ হইয়া এক পা বাঁকাইয়া শুঁড় তুলিয়া বাজনার সাথে তাল রাখিয়া সেলাম করিত। এইরূপ রাষ্ট্রীয় হাতীর সংখ্যা ছিল তিন শত। হকিন্স ইহাদিগকে 'রাজকীয় হাতী' নামে অভিহিত করেন। "স্বয়ং বাদশাহ এই সকল হাতীতে আরোহণ করেন। বাদশাহের নিকট উহারা খুব আনন্দের সহিত আসিয়া থাকে, সম্মুখে থাকে পতাকাহস্তে বিশ ত্রিশ জন লোক। চিনি, মাখন, শস্যাদি ও ইক্ষুদণ্ড প্রভৃতি দশটাকা মূল্যের জিনিষ ইহারা প্রতিদিন আহার করিয়া থাকে। পরে নানা রংএ ভূষিত হরিণ, মহিষ প্রভৃতির শোভাযাত্রা বাদশাহের সম্মুখে আনীত হয়। ইহাদের গাত্রে পীত এবং লালরঙের দাগ কাটা এবং শিং সোনার পাতে মোড়া ও সঙ্গে রঙীন পতাকা। সোনার শিকলে বাঁধা বৃহদাকার চিতাবাঘও শোভাযাত্রায় আনীত হয়। টমাস করিয়াটের (Thomas Coryat) বিবরণ অনুযায়ী এক শিং যুক্ত ঘোড়াও পশুদিগের এই শোভাযাত্রায় থাকিত।(১) করিয়াট তাঁহার "প্রিয়তম বন্ধু মাষ্টার এল হুইটাকারের (Master L. Whitekar) নিকট হলপ করিয়া লিখিয়াছেন যে এই শ্রেণীর দুইটি জন্তুকে তিনি বাদশাহের নিকট শোভাযাত্রায় আনয়ন করিতে দেখিয়াছেন। তিনি অবশ্য সবিনয়ে এ কথাও লিখিয়াছেন যে উহারা "পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও আজব জন্তু" এবং উহা একমাত্র বঙ্গদেশেই দেখা যাইত। ঐ দেশে অন্যান্য অনেক রকমের অসাধারণ জিনিষও পাওয়া যাইত। "উহার উর্ব্বরতাও চমকপ্রদ।" তবে করিয়াট সম্ভবতঃ এই সব বিবরণ লিখিবার সময় সত্যের অপলাপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আগ্রা নগরীর প্রতি দুইটি কারণে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার খুব আকাঙ্খা ছিল "হাতীর উপরে উপবিষ্টরূপে তাঁহার ছবি আঁকাইয়া

---

(১) করিয়াটের "চিঠিপত্র"

লওয়া," এবং প্রাচ্যে অতি কম খরচে জীবনধারণ করার সুবিধা। তিনি লিখিয়াছেন "আমি অনেক সময় দৈনিক মাত্র এক পেনি খচ করিয়া বেশ আরামে থাকিতাম।" "নীচ এবং ইতর আর্ম্মানী জাতীয় খৃষ্টান-দিগের সহিত কোন কারবার না থাকিলে" এখানে জীবনযাত্রা অনেক সহজ ছিল।

কখনও কখনও বাদশাহ এক আধটা মন্তব্য করিতেন। আর সঙ্গে সঙ্গে খোজারা সম্মুখে ঝুঁকিয়া তাঁহার প্রত্যেকটি মন্তব্য ভাল করিয়া শুনিয়া লইত এবং পরে রেলিং এর বেষ্টনীর দিকে মুখ করিয়া মহা মহিমান্বিত সম্রাটের বাণী রাজ পরিবারস্থ ওমারাহগণের নিকট আবৃত্তি করিত। তাঁহারা পায়ের নখাগ্রে দাঁড়াইয়া উত্তেজিত ভাবে উহা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকিতেন। বাদশাহের শ্রীমুখের বানী শোনামাত্র তাঁহারা উল্লাসে সম্রাটের দিকে হাত তুলিয়া উচ্চরোল করিয়া বলিতেন, "কেরামত, কেরামত।"

জন্তুগুলিকে আস্তাবলের দিকে লইয়া যাওয়ার পরে বাদশাহ তাঁহার রক্ষীদল নিরীক্ষণ করিতেন। অদ্ভূত পোশাকে প্রথমত অশ্বারোহী সৈন্যদের শোভাযাত্রা হইত। "তাহাদের ঘোড়াগুলি লৌহ বর্ম্ম পরিহিত।" তরবারী খেলোয়াড়গণ এক একটি মেষ কাটিয়া তাহাদের অস্ত্রের ধারালত্ব প্রমাণ করিত।

অবশেষে গম্ভীরভাবে দরবারের আসল কাজ আরম্ভ হইত। সরকারী ঘোষণাকারীর আহ্বানে প্রধান অমাত্য উমজাত-উল মুল্ক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক ওমরাহ ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে বাদশাহের সমীপে আসিতে হইত। নত নেত্রে ও ধীর পদক্ষেপে তাহারা সম্রাটকে কুর্নিশ (তস্লিম) করিয়া সেলাম করিতেন। ইহার রীতি ছিল প্রথমে দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ মাটিতে রাখিয়া উহা অতি ধীরে উত্তোলন করিয়া ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাতের তালু কপালে স্থাপন করা। প্রত্যেককে এইভাবে তিন বার করিয়া তসলিম করিতে হইত। তারপর উক্ত ওমরাহ বা রাজকর্ম্মচারী মণিমুক্তা, জহরৎ প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্য এবং অলঙ্কারাদি একটি থালায় সাজাইয়া উহা সম্রাটের সম্মুখে রাখিতেন। ঐ সব জিনিষের মূল্য এবং সৌষ্ঠবে খুশী হইলে সম্রাট উহার উপর হাত রাখিয়া তাঁহার

সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। ইহার পর একজন খোজা সিংহাসনের পিছনের দরজা দিয়া ঐ থালা লইয়া চলিয়া যাইত।

১২ই মে তারিখে দরবারের নিত্য নৈমিত্তিক যন্ত্রবৎ সুসংগঠিত নিয়মানুগ কার্য্যপদ্ধতি এক অপ্রিয় ঘটনায় বাধা প্রাপ্ত হইল। মন্ত্রীগণ যথারীতি বাদশাহের নিকট তাহাদের উপঢৌকন প্রদান করিবার পর ঘোষণাকার "শিবাজী রাজা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পুত্র শম্ভুজী ও দশজন মারাঠা সেনাপতি সহ একটি থালায় দুই সহস্র সোনার মোহর লইয়া শিবাজী বারান্দার নীচে রৌপ্য নির্ম্মিত রেলিংএর ধারে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পারস্য দেশীয় জটিল পদ্ধতি অনুসারে "তসলিম" না করিয়া তিনি নত হইয়া দুই হস্ত করজোড়ে ললাটে স্পর্শ করিয়া বাদশাহকে অভিবাদন করেন। নিজের অনুচরদিগের নিকট হইতেও তিনি এইরূপ অভিবাদন পাইতে অভ্যস্ত ছিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য দেওয়ানী-আমের বৃহৎ হল গৃহে সকলে স্তব্ধ। ওমরাহগণ সম্রাটের হাবভাব কটাক্ষে দেখিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেবের মুখ মণ্ডল অপরিবর্ত্তিত। তিনি ঈষৎ মাথা দোলাইয়া শিবাজীর উপহার গ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীকে ফিস্ ফিস্ করিয়া কিছু বলেন। এই কর্ম্মচারী সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা হইতে অবতরণ করিয়া শিবাজীকে নিম্নস্তরের মনসবদার দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনের দিকে লইয়া চলিলেন "দরবারের ওমরাহদের পদমর্য্যাদা অনুযায়ী ইহাই আপনার উপযুক্তস্থান" —এই বলিয়া রাজকর্ম্মচারী শিবাজীকে ওখানে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে শিবাজীর তসলিম প্রথায় সেলাম না করাই উল্লিখিত অপ্রীতিকর ঘটনার একমাত্র কারণ নহে। বাস্তবিক বাদশাহের আসল উদ্দেশ্য ছিল শিবাজীকে এমন সুচিন্তিত ভাবে অপমান করা যাহার ফলে তিনি উত্যক্ত হইয়া এমন কাজ করিয়া বসিবেন যে তাঁহাকে যে নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল উহা রাজদ্রোহিতার অভিযোগে বাতিল করা যায়। দরবারের ঘোষণাকারী যাঁহাকে স্পষ্টভাবে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাহাকে অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সামান্য জমিদার ও মনসবদার দিগের মধ্যে স্থানান্তরিত করা যে

উত্তেজনার কারণ ঘটাইবে ইহা নিঃসন্দেহ। শিবাজীর অনুতাপের আরও কারণ ছিল। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার দ্বারা মারাঠাদিগের বিরূদ্ধে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত একজন রাঠোর সেনাপতির পশ্চাতে তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইল। ডিউক অব ওয়েলিংটন প্যারি নগরীর এক অপেরা-গৃহের আরামকক্ষে বসিয়া বহুদিনপরে মারমন্টের (Marmont) প্রতি বিদ্রূপ করিয়া যে উক্তি করিয়াছিলেন উহারই পূর্ব্বাভাষ যেন শিবাজীর মুখে উচ্চারিত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী মনসবদারের প্রতি ফিরিয়া তিনি বলেন, "এই রাঠোর সেনাপতির পৃষ্ঠদেশ আমাকে দেখানই যেন কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য। বাস্তবিক আমার সৈন্যগণতো তহার পলায়মান পৃষ্ঠদেশ পূর্ব্বেই দেখিয়াছে।"

শিবাজীর মন্তব্যে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় উহা দেখিয়া রামসিংহ ভীতত্রস্তভাবে সত্বর তাঁহার পাশে আসিলেন এবং শিবাজী যাহাতে তাঁহার ন্যায্য সম্মান লাভ করিতে পারেন এই জন্য সম্রাটের নিকট সুপারিশ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করেন। শিবাজীর ক্রোধ কিন্তু কিছুতেই প্রশমিত হইলনা; বরং তিনি আরও উচ্চে স্বরে রূঢ় ভাষায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইহাতে রাজকর্ম্মচারীরা খুব আতঙ্কিত হন। কিন্তু এই প্রকার গণ্ডগোলের প্রতি আওরঙ্গজেব কর্ণপাত করিলেন না। রামসিংহ বাদশাহের প্রকৃত চরিত্র ও স্বভাব অবগত ছিলেন। আওরঙ্গজেবের নীরবতা সম্মতিসূচক নহে এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি শিবাজীর মেজাজ বিস্ফোরণে আমতা আমতা করিয়া বলেন, "ইনি পাহাড়িয়া দিগের সর্দ্দার মাত্র; দরবারের শিষ্টাচার কিছুই জানেন না।" বাদশাহ এ কথার কোন উত্তর না দিয়া তুলাদণ্ডে সোনার সহিত দেহ ওজন করিবার নিয়মিত অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতে আদেশ দেন। এই উৎসব সম্বন্ধে থেবেনো (Thevenot) লিখিয়াছেন, (১) "ওজন করিবার মানদণ্ড বহুমূল্য। লোকের ধারণা যে ইহার শিকল এবং দণ্ড সোনার তৈয়ারী; যদিও কেহ কেহ বলে যে সমস্তই গিল্টি করা। বহুমূল্যে পরিচ্ছদে ও উজ্বল রত্নরাজিতে ভূষিত

(১) লোভেল (Lovell) কৃত অনুবাদ, ১৬৮৬

হইয়া বাদশাহ একটি পাল্লায় হাঁটু গাড়িয়া উপবেশন করেন, আর অন্য পাল্লাটির উপর সোনা, রূপা, জহরত ও অন্যান্য বহুমূল্য রত্নে ভরা ছোট ছোট থলি রাখা হয় .... বাদশাহের ওজন সরকারি নথিপত্র অনুযায়ী পূর্ব্ব বৎসর হইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা প্রমাণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে উল্লাসের সহিত জয়ধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু সাম্রাজ্যের বড় বড় ওমরাহগণ ও অন্তঃপুরের মহিলারা সম্রাট সিংহাসনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বহুমূল্য উপহার দিয়া তাঁহাদের আনন্দ আরও গভীরভাবে জ্ঞাপন করেন; সাধারণতঃ এই সব উপহারের মূল্য লক্ষ লক্ষ টাকা। এই উপলক্ষ্যে বাদশাহ সোনার গামলা ভর্ত্তি স্বর্ণ নির্ম্মিত কৃত্রিম ফল ও অন্যান্য খেলনা প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করেন।"

এই উৎসবের পরে দরবারের অধিবেশন শেষ হইল এবং সভাসদেরা শেষ অভিবাদন করিয়া সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। শিবাজী ও রামসিংহ একত্র জয়পুর ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মারাঠা নেতা প্রকাশ্য সভাগৃহে অপমানিত হওয়ার জন্য অভিযোগ করিতে থাকেন। অনতিবিলম্বেই তাঁহার আরও অভিযোগের কারণ উপস্থিত হয়। তিনি জয়পুর ভবনে প্রবেশ করিবার পরেই একদল অশ্বারোহী সৈন্য ঐ প্রাসাদের চারিদিক ঘিরিয়া ফেলে। তাহাদের পশ্চাতে আসিল প্রহরারত পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য। প্রাসাদের প্রত্যেক দরজার সম্মুখে কামান বসান হইল।

এইবার জীবনে সর্ব্বপ্রথম শিবাজী সমস্ত আশা হারাইলেন। হতাশ হইয়া তিনি পালঙ্কের উপর শুইয়া পড়েন এবং তাহার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। পুত্র শম্ভুজী আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। শিবাজী যেন জীবনের মত তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতেছেন এই ভাবে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। এদিকে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু সৈন্যেরা নীরবে পাহারায় রত। ইহাতে মনে হইল যে শিবাজীকে তৎক্ষণাৎ বধ করার অভিপ্রায় বাদশাহের ছিল না। তিনি বরং তাঁহাকে অনিশ্চিত ভাগ্য পরীক্ষার মধ্যে রাখিয়া মানসিক যন্ত্রণা দিতেই অধিকতর ইচ্ছুক ছিলেন।

শিবাজীর ঐ গৃহের বাহিরে যাওয়া নিষেধ ছিল এবং প্রধান কোতোয়াল ফুলাদ খাঁয়ের নেতৃত্বে সৈন্যরা সর্ব্বদা তাঁহাকে নজর বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব তাঁহার নিকট ভদ্রভাষায় চিঠি লিখিয়া তাঁহার সংবাদাদি লইতে লাগিলেন; এমনকি তাঁহার জন্য নানাবিধ ফলও পাঠাইলেন। প্রধানমন্ত্রী উমদাত-উল-মুলকের নিকট চিঠি লিখিয়া সম্রাট যে তাঁহাকে নিরাপদে ফিরিয়া যাইবার আশ্বাস দিয়াছিলেন শিবাজী ইহা স্মরণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য যে এই মন্ত্রী ছিলেন শায়েস্তাখাঁর শ্যালক। শায়েস্তা সুদূর বঙ্গদেশ হইতে শিবাজীকে যাহাতে খুন করা এই বিষয়ে ষড়যন্ত্র চালাইতেছিলেন। শিবাজী তাঁহার চিঠির কোন উত্তর পাইলেন না।

মুঘল রাজপ্রাসাদে শিবাজীর প্রতি একমাত্র দরদী ছিলেন জিনাত-উন্-নিসা নামক আওরঙ্গজেবের এক কন্যা (১) যদিও শিবাজী এ বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। জাফরির মধ্য দিয়া দরবারের কার্য্যকলাপ দেখিতে দেখিতে তিনি শিবাজীর প্রতি আকৃষ্ট হন।" "শিবাজীর দেহের সৌন্দর্য্য তিনি মুগ্ধ হন এবং শিবাজীর আত্মসম্মান ও তেজস্বী আচরণের পরিচয় পাইয়া তিনি প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকেন।" ইহাও সত্য যে শিবাজীর স্বাধীন মনোভাব ও সাহস প্রদর্শন দরবারের গতানুগতিক নিয়ম ব্যতিক্রম করায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিবাজীর পক্ষ লইয়া তিনি পিতার পায়ে ধরিয়া মিনতি করেন, কিন্তু পিতা এবিষয়ে কি উত্তর দিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ পায় নাই। জিনাত-উন্-নিসা অবিবাহিতা ছিলেন। কিন্তু শাহজাদী বেগম সাহেবা রূপে প্রাসাদের অভ্যন্তরে তাঁহার অপরিমেয় প্রভাব ছিল। অনেক বৎসর পরে মুঘলেরা যখন শিবাজীর পুত্রকে আবদ্ধ করিয়া ও অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া তাহার প্রাণনাশ করেন, তখন শিবাজীর পৌত্র দ্বিতীয় শিবাজীকে মুঘল ওমরাহ হিসাবে লালন পালন করিবার ভার এই শাহজাদীর উপরে ন্যস্ত হয়। বাদশাহের ইচ্ছা ছিল যে এই শিশুকে

(১) ডাউ (Dow) এর গ্রন্থ হইতে উল্লেখ করিয়া ওর্ম্ম (Orme) এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন; কিন্তু জিনাত-উন-নিসা সম্রাটের পায়ে পড়িয়া শিশুর ধর্ম্মবিশ্বাসে কোনরূপ বাধা না দিতে পিতাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। অনিচ্ছাসত্ত্বে আওরঙ্গজেব এই প্রস্তাবে রাজী হন। বালক শিবাজীর প্রতি জিনাত-উন-নিসা যেরূপ মমতা দেখান তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে শিবাজীর প্রতি তিনি যে অসাধারণ মনোভাব পোষণ করিতেন কালক্রমে তাহা বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় নাই।

রামসিংহও শিবাজীকে বাঁচাইবার জন্য ও তাঁহার নিরাপত্তার জন্য সম্রাটকে বারংবার অনুরোধ করিতে থাকেন। প্রথমতঃ আওরঙ্গজেব তাহার কথায় কোন কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু তিনি উদাসীনতার ভাব দেখাইয়া একদিন রামসিংহকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি এই ব্যাপারে এত উৎসাহ দেখাও কেন?" তাহার পরেই রামসিংহ যে দরবারে শিবাজীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন ইহা স্মরণ করিয়া আওরঙ্গজেব তামাসা ছলে কঠোরক্তি করিয়া বলেন যে তিনি রামসিংহকে কারাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া শিবাজীকে তাহার হেফাজতে রাখিবেন এবং শিবাজীকে সঠিকভাবে কারাগারে রাখিবার দায়িত্ব রামসিংহের উপর ন্যস্ত হইবে। রামসিংহ প্রতিবাদ করায় আওরঙ্গজেব তাঁহাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিয়া বলেন যে মোটের উপর সকল হিন্দুকেই তিনি সন্দেহের চোখে দেখেন। রামসিংহকে বাদশাহ এই বলিয়া শাসান যে ভবিষ্যতে যদি তিনি রামসিংহের নিকট হইতে পুনরায় এইরূপ অভিযোগ পান তবে তিনি রামসিংহ ও শিবাজী এই দুই জনকেই আফগানিস্তানে কোনও দুর্গে নির্ব্বাসিত করিবেন।

শিবাজী বেশ উপলব্ধি করেন যে বাদশাহ তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া এমন একটা বেপরোয়া কাজ করাইতে বাধ্য করিতে চাহেন যাহাতে ঐ অজুহাতে তিনি শিবাজীকে বধ করিতে পারেন। তাহার পর সরকারী ইস্তাহার ঘোষিত হইবে যে "পলায়মান শিবাজীকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে।" কিন্তু এই বিপদে মাথা না হারাইয়া শিবাজী স্থির করিলেন শঠের প্রতি শঠতামূলক ব্যবহার করাই সমীচীন হইবে। কাজেই তিনি চতুরতাদ্বারা আওরঙ্গজেবের চতুর ব্যবস্থার প্রতিশোধ লইবেন স্থির করিলেন।

দিন কয়েকের মধ্যেই প্রহরীরা শিবাজীর প্রফুল্লতা ও বেশ একটা

খুশির ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। পাহারারত সৈন্যদের সহিত তিনি রসিকতা করিয়া কাথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন এবং উচ্চ রাজকর্ম্মচারী-দিগকে নানা রকম উপহার পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এখন প্রায়ই আগ্রা নগরীর সুন্দর স্বাস্থ্য ও জল-বায়ুর প্রশংসা করিতেন। নিজ দেশের পাহাড়ের সেঁতসেঁতে বিষন্ন আবহাওয়ার তুলনায় আগ্রা যে কত শুষ্ক ও আরামের জায়গা এ বিষয়ে তিনি প্রায়ই মন্তব্য করেন। বাদশাহ যে তাঁহাকে ফল, মিষ্টি প্রভৃতি পাঠাইতেন তাহার জন্য তিনি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এক ঘেঁয়ে শাসনকার্য্য ও কূটনীতি পরিচালনা হইতে কর্ম্মমুক্ত হইয়া কয়েকটা দিন সুসভ্য উত্তর ভারতীয় এই মনোরম নগরীতে প্রচুর অবসরের মধ্যে যাপন করা যে কত আরামের তিনি প্রায়ই প্রফুল্লচিত্তে এই সব বিষয়ে গল্প করিতেন।

ইহা মনে করা ঠিক হইবে না যে শিবাজীর হতাশার ভাব হইতে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করার কথা বার্ত্তায় এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনে আওরঙ্গজেব তখনই প্রতারিত হন। দীর্ঘ তিন মাস তাঁহরা পরস্পরের হাব ভাব ল য করিতে লাগিলেন। মনোভাব গোপন রাখিতে দক্ষ সাম্রাজ্যবাদী আওরঙ্গজেব শিবাজীর অভিনয়ের প্রতিটি প্রচেষ্টা পুংক্ষানুপুংক্ষরূপে বিশ্লেষণ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে গ্রীষ্ম অতিবাহিত হইয়া গেল। জুনমাসের ধূলার ঝড়ের পরে জুলাইয়ের বজ্রধ্বনিসহ ঝটিকা বহিয়া গেল। উহার সঙ্গে আসিল মশা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানা প্রকারের উপদ্রব। কিন্তু শিবাজী বিন্দুমাত্র কষ্ট কিংবা অসহিষ্ণুতার ভাব দেখাইলেন না। গোয়েন্দারা তাঁহাকে রাত্রিদিন নজরবন্দী করিয়া রাখে এবং শিবাজী বেশ প্রফুল্লচিত্তে কাল-যাপন করিতেছেন এই মর্ম্মে তাহারা বাদশাহের কেল্লায় সংবাদ পাঠাইতে থাকে। এমনকি অবশেষে আওরঙ্গজেবের সন্দেহও উপশমিত হইল।

এই সময় তাঁহার পত্নী ও মাতা আগ্রায় আসিয়া তাঁহার সহিত অবস্থান করিতে পারিবেন কিনা এ বিষয়ে তিনি সম্রাটের নিকট অনু-সন্ধান করেন। বাদশাহ স্বভাবতঃই এই প্রস্তাবে রাজী হন। আওরঙ্গ-জেব মনে করিলেন যে শিবাজীর যদি সত্যই পলায়ন করার ইচ্ছা থাকিত তবে তিনি নিজ পরিবারের মহিলাদিগকে এখানে আনিয়া রাখিতে

চাহিতেন না। আর, শিবাজীতো তাঁহার মাতাকে তাঁহার রাজত্ব শাসনের ভার দিয়া আসিয়াছিলেন। মাতার স্থলে অন্য কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ ক্ষমতা না দিয়া মাতাকে আগ্রায় লইয়া আসিবার প্রস্তাবে মনে হইল যে তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্য সম্বন্ধে শিবাজীর আর বেশী উৎসাহ নাই। সত্য বটে মেয়েদের আগ্রায় আগমন ক্রমেই পিছাইয়া যাইতে লাগিল। তবে মারাঠা দেশের প্রবল বারিপাতে আগষ্ট মাসে যাতায়াত কষ্টকর হওয়ায় সম্ভবত তাহাদের আসিতে বিলম্ব হইতেছে মুঘলদের এইরূপ একটা ধারণা হইল। আওরঙ্গজেবও মনে করিলেন যে শিবাজীর বিপুল সাহস ও অসাধারণ ধূর্ত্ততার সম্বন্ধে তিনি যে সব কাহিনী শুনিয়াছিলেন উহা হয়তো তাঁহার সেনাপতিদিগের অক্ষমতা ও অকৃতকার্য্যতা সম্রাটের নিকট হইতে গোপন করিবার জন্য একটা অজুহাতরূপে ব্যবহৃত হইত। ফলে যে বন্দীকে তিনি এতদিন অতি ভয়ঙ্কর ও সাঙ্ঘাতিক। লোক বলিয়া মনে করিতেন, এখন তিনি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। শিবাজীর পরবর্ত্তী অনুরোধে সম্রাটের মারাঠাদিগের তেজ ও বীরত্ব সম্বন্ধে নীচুমনোভাব দৃঢ়তর হইল। শিবাজী প্রস্তাব করেন যে তাঁহার সমুদয় মারাঠা অশ্বারোহী সঙ্গীগণকে তাহাদের দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তিনি বুঝাইয়া বলেন, "এখানে আমার কোন সৈনিকের প্রয়োজন নাই।" বাদশাহ ঈষৎ ঔদাসীন্যের ভান করিয়া স্বীয় স্কন্ধে একটু ঝাঁকানি দেন। শিবাজীর অনুচরদিগকে সরাইয়া দিতে তিনি বরাবরই খুব ইচ্ছুক ছিলেন। এখন শিবাজী নিজে এই প্রস্তাব করায় তিনি বেশ খুশি হইলেন।

ইহার পর শিবাজী একাকী বাস করিতে থাকেন। দুই একজন ভৃত্য মাত্র মাঝে মাঝে তাঁহার তদারক করিত। মুঘল রাজধানীতে শিবাজী একা; বাছাই করা সৈনিকেরা তাঁহাকে রাত্রিদিন পাহারা দিতেছে.... তাঁহাকে আর ভয় করিবার কারণ রহিল না। তাঁহার হাবভাব দেখিয়া মনে হইল যে তিনি সত্যই সন্তুষ্টচিত্তে উত্তর ভারতীয় জীবনযাত্রার প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন। তিনি পারস্য দেশীয় শিষ্টাচার পদ্ধতি শিখিতেছিলেন। দরবারী ওমরাহদের সহিত প্রশংসমান ভুরি ভুরি অভিনন্দন লিপি সহ উপহার স্বরূপ মিষ্টান্ন, ফল ইত্যাদি বিনিময় করিতে লাগিলেন। মারাঠা পদ্ধতিতে প্রস্তুত থালা ভর্ত্তি আহার্য্য সামগ্রী মুঘল

ওমরাহদিগের ভবনে প্রেরিত হইতে লাগিল। নানা প্রকার মশলাযুক্ত সুগন্ধি পোলাউ প্রভৃতি গুরুপাক খাদ্যাদিতে অভ্যস্ত ওমারাহদিগের নিকট দক্ষিণী মারাঠার প্রেরিত অতি সাধারণ খাদ্য স্বাদহীন মনে হইলেও শিবাজী যে ভদ্রতার খাতিরে তাঁহাদিগকে এই সব দ্রব্য পাঠাই-তেছেন ইহাতে তাঁহারা আপ্যায়িত বোধ করেন এবং উহার পরিবর্ত্তে তাঁহারাও নিজেদের রন্ধনশালায় প্রস্তুত খালাভর্ত্তি নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য শিবাজীর নিকট পাঠাইতেন।

প্রথমদিকে জয়পুরভবন হইতে প্রেরিত খাদ্য সমন্বিত ঝুড়ি, থালা, ডেকচি, গামলা প্রহরীরা খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিত। এই অনুসন্ধানের কাজ প্রধান কোতোয়ল স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা মণের পর মণ ভর্ত্তি ভাতের অথবা রাশিকৃত আমের ঝুড়ির বা ফুটন্ত সুপের গামলার অভ্যন্তরে কি আছে না আছে ইহা পরীক্ষা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মুটেদের স্কন্ধে বাঁশে ঝুলান ঝুড়ি, ডেকচি প্রভৃতি তাঁহারা ক্রমশঃ ভৃত্যদিগকে নাম মাত্র প্রশ্ন করিয়া বা ঝুড়ির দিকে সামান্য তাকাইয়া বাহিরে লইয়া যাইতে দিতে লাগিলেন।

শিবাজীর প্রেরিত সাদাসিধা মারাঠা আহার্য্য সামগ্রীর পরিবর্ত্তে মুঘল ওমরাহগণ পোলাও, বিরিয়ানী, কোপ্তা প্রভৃতি বহুমূল্য উপাদেয় খাদ্যাদি পাঠাইয়া তাহাদের ঔদার্য্যের পরিচয় দিতে লাগিলেন। কিন্তু শিবাজীর পাকস্থলী এইসব গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ করিতে খুব অভ্যস্ত ছিল না। আগষ্ট মাসের মাঝা মাঝি শিবাজী লিভারের গুরুতর পীড়া, জ্বর এবং খিঁচুনি প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হন। বিকার অবস্থায় তাঁহার গোঙানির শব্দ মুঘল প্রহরীরা বেশ শুনিতে পাইত। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া পুলটিসের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চিন্তান্বিত হন। তাঁহরা শিবাজীকে এক প্রকার চূর্ণ-ঔষধ সেবন করিতে দিয়া বিশ্রামের উপদেশ দেন এবং তাঁহর গা-হাত-পা মালিস করিতে বলেন। হঠাৎ একবার চমকাইয়া উঠিয়া শিবাজী বলেন যে রোগমুক্তির নিমিত্ত শুধু মানুষের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া তিনি আগ্রা এবং দিল্লীর মধ্যবর্ত্তী মথুরা নগরীতে শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে কয়েকটি

অশ্ব দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবং এই উদ্দেশে তিনি তাঁহার দুইটি ভৃত্যকে বাহিরে পাঠাইবার অনুমতি চাহেন। কোতায়াল ফুলাদ খাঁ মনে করিলেন যে শিবাজীর এই ইচ্ছা হিন্দুদিগের কুসংস্কারের পরিচায়ক। তবুও তিনি ইহার বিরোধিতা না করিয়া ভৃত্যদিগকে বাহিরে যাইবার অনুমতি দেন। ভৃত্য দুইটি হেলা ফেলায় সময় নষ্ট করিয়া এমনভাবে আস্তে আস্তে ঘোড়া লইয়া মথুরার রাস্তায় চলিতে লাগিল যে তাঁহাদের ভাব ও গতিবিধি দেখিলে মনে হইত যে পীড়িত ও শয্যাগত মনিব তাহাদের শিথিলতার জন্য শাস্তি দিতে বর্ত্তমানে অপারগ ইহা বুঝিয়া যেন তাহারা ঐ ভাবে চলিতেছিল।

১৯শে আগষ্ট শিবাজী অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার পক্ষে শয্যা ত্যাগ করা নিষিদ্ধ ছিল। তবে তাঁহার শরীরের খিঁচুনি প্রায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনে পড়িল যে মুঘলদিগের শিষ্টাচারের রীতি অনুযায়ী রোগমুক্তির পর সাধারণতঃ বন্ধুবান্ধবদিগকে নানা রকমের উপহার পাঠান হয়। তিনিও প্রকাশ করেন যে তিনি দরবারের একজন ওমরাহের নিকট দুই ঝুড়ি ফল পাঠাইবেন। কোতোয়াল এ বিষয়ে কোন আপত্তি করিলেন না। বাঁশের ডাণ্ডায় ঝুলান প্রকাণ্ড ঝুড়ি বাড়ীর বাহিরে আনা হইল প্রহরীরা উহার ভিতরে কি আছে তাহা অনুসন্ধান করিল না, এবং মুটেদিগকেও কোনরূপ খানাতল্লাস না করিয়াই ছাড়িয়া দিল।

মুটেরা প্রহরীদিগের দৃষ্টির বাহিরে আসিয়া ঝুড়ি মাটিতে নামাইল। একটি ঝুড়ি হইতে শিবাজী এবং অন্যটি হইতে তাঁহার পুত্র শম্ভূজি বাহির হইয়া আসিলেন। মুটেরাও তাহাদের পরিহিত মোটা কাপড়ের খোলস ফেলিয়া দিল। শিবাজী তাঁহার অনুচরদিগকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়ার পরে এই দুই মারাঠা সেনাপতি ছদ্মবেশে তাঁহার নিকট ভৃত্যের ন্যায় বাস করিতেন। আরও একজন সেনাপতি ঐভাবে ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল হীরা। শিবাজী ঝুড়ির মধ্যে বসিয়া জয়পুর ভবন পরিত্যাগ করার পর হীরা তাঁহার শয্যায় শায়িত ছিলেন। তাঁহার পরণে ছিল শিবাজীর গাত্রবস্ত্র এবং কণ্ঠে তাঁহার মুক্তার মালা। তিনি মস্তক অবধি কাপড় মুড়ি দিয়া পুনরায় জ্বরে পড়িয়াছেন এই ভাব

দেখাইয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিলেন। কিন্তু তাহার একখানা হাত কম্বলের বাহির ছিল। ইহাতে শিবাজীর পহিরিত কব্জির অলঙ্কার ও তাঁহার আঙ্গুলে শিবাজীর নামাঙ্কিত আঙটি পরিস্কার দেখা যাইত। শিবাজীর শরীরে খিঁচুনি ধরায় চিকিৎসকের একজন সহকারী প্রত্যহ তাঁহার শরীর টিপিতে আসিত। শিবাজী নিশ্চয়ই হয় ঘুষ দিয়া নতুবা তাঁহার চরিত্র বলে ও মাধুর্য্যে এই লোকটিকে বশীভূত করেন। এই গাত্র সংবাহক অন্যান্য দিনের ন্যায় ঐ দিনও শয্যার পার্শ্বে বসিয়া হীরার শরীর টিপিতে লাগিল।

দুপুরের দিকে বাড়ী নিস্তব্ধ দেখিয়া প্রহরীরা ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু শিবাজীকে অসহায় অবস্থায় জ্বর রোগে শায়িত দেখিয়া তাঁহাদের আগমন যে সমীচীন হয় নাই এইরূপ ত্রুটিপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করিয়া চলিয়া যায়। অপরাহ্নে হীরা শিবাজীর শয্যা হইতে উঠিয়া নিজের বস্ত্রাদি পরিধান করেন এবং তরুণ গাত্র-সংবাহককে সঙ্গে লইয়া গৃহের সম্মুখস্থ দ্বারে উপস্থিত হন। তিনি প্রহরীদিগকে বলেন যে শিবাজী তাঁহাকে বাজার হইতে কতকগুলি ঔষধ এবং যন্ত্রণার উপশমকারী মলম আনিতে আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে চিকিৎসকের সহকারীকে দেখিয়া প্রহরীরা মনে করে যে হয়ত ঔষধের ব্যবস্থা পত্র নির্দ্দেশ অনুযায়ী কতকগুলি উপাদান আনিবার জন্য তাঁহার বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহারা শিবাজীর শারীরিক অবস্থার সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করেন। হীরা মাথা নাড়িয়া বলেন "শিবাজীর রোগের পুনরায় আক্রমণ হইয়াছে। তাঁহাকে কোনরূপ বিরক্ত করা নিষেধ। যথাসম্ভব কম গোলযোগ বাঞ্ছনীয়।"

ইহার পর তিনি ধীরে ধীরে বাজারের দিকে অগ্রসর হইলেন। এদিকে মারাঠা বন্দী দিগের চিহ্নমাত্র রহিত জয়পুর ভবনের শূণ্য প্রকোষ্ঠগুলিতে ভারতের বৈশিষ্ট্যমূলক অপরাহ্নের নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। প্রবেশ পথে প্রহরীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন।

কোতয়াল ফুলাদ খাঁর ধারণা ছিল যে জয়পুর ভবনে এত দৃঢ় পাহারার ব্যবস্থার নিষ্প্রয়োজন। তিনি এখন আর সারাদিন ঐস্থানে পাহারার ব্যবস্থার তদারক করিতে আসিতেন না। ঘটনার এই সময়ে তিনি

নিজ গৃহে দিবানিদ্রা উপভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার উপস্থিতি প্রসূত প্রেরণার অভাবে প্রহরীদিগের কাজের শৃঙ্খলাও শিথিল হইয়া গিয়াছিল। অগষ্ট মাসের ভারতীয় সন্ধ্যা যেমনই ধূসর তেমনই চারিদিকে একটা প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধকারী চাপাভাবে আচ্ছন্ন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোনরূপ কর্ম্মতৎপরতা দেখা গেল না।

খানিকক্ষণ পরে প্রহরীদের মনে হইল যে যে গৃহে তাঁহারা পাহারা দিতে নিযুক্ত রহিয়াছে সেখানে একটা অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করিতেছে। কোনও পদশব্দ নাই। কাহারও গলার আওয়াজ শোনা যাইতেছে না। অপরাহ্নের সন্ধ্যার আবহাওয়া ক্রমে গোধূলির আঁধারে পরিণত হইল; কিন্তু গৃহে কোন দীপের আলো দেখা গেল না। শীঘ্রই ভয়ঙ্কর সন্দেহ আরও ঘোরতর বিভীষিকাময় নিশ্চয়তার রূপ ধরিয়া দেখা দিল। কারণ তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসের পরে দেখা গেল যে অসহায় রোগী অপার্থিব উপায়ে অন্তর্হিত হইয়াছে। সৈন্যগণ দ্রুত ফুলাদ খাঁকে সংবাদ দিতে ধাবিত হইল। ফুলাদ খাঁ তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন ও বাদশাহের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন "ভৌতিক ব্যাপার .... একেবারে ভৌতিক ব্যাপার .... সে উধাও হইয়াছে। হাওয়ায় উড়িয়া গেল কিম্বা মাটির নীচে অদৃশ্য হইয়া গেল কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

অন্য এক বিবরণীতে (১) প্রকাশ বাদ্‌শাহ সর্ব্বপ্রথম রামসিংহের নিকট হইতে এই সংবাদ পান। স্মরণ থাকিতে পারে যে শিবাজীকে আটক রাখিবার জন্য আওরঙ্গজেব রামসিংহকে দায়িত্ব দিয়াছিলেন। রামসিংহ গোপনে বাদশাহের সাক্ষাৎ পাইবার জন্য সানুনয় প্রার্থনা করেন। বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রগাঢ় অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। তারপর হাত জোড় করিয়া নতদৃষ্টিতে তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রামসিংহের অবস্থা দেখিয়া আওরঙ্গজেব প্রথমে একটু বিভ্রান্ত হইলেন, কারণ তাঁহার হাসিকৌতুক ও প্রফুল্লতার জন্য তিনি বাদশাহী দরবারে একজন প্রিয় পাত্র ছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে

(১) মানুচিচ

প্রশ্ন করায় রামসিংহ অত্যন্ত নীচু স্বরে শিবাজীর পলায়নের কাহিনীর কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। গৃহমধ্যে একটা ভয়ঙ্কর থমথমে নীরবতার ভাব। আওরঙ্গজেব মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। কপালে হাতের তালু রাখিয়া তিনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলের ভাব অবর্ণনীয়। আচ্ছন্নতা কাটিয়া গেলে তিনি রামসিংহকে তাঁহার পদবী এবং সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করার হুকুম দেন এবং তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। বাদশাহের উত্যগ্র ক্রোধের পরিমাণ যে কত গভীর ইহা তিনি এবং প্রধান সরকারী ঘাতক ভিন্ন অন্য কাহারও কল্পনার অসাধ্য। বলা বাহুল্য যে এতবড় একজন রাজদ্রোহী বন্দীর পলায়নের গ্লানি অত্যন্ত অসহনীয়। ইহা ছাড়াও আওরঙ্গজেবের পরিতাপের অন্য কারণ ছিল। মাত্র একঘন্টা পূর্ব্বে তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে শিবাজী রুগ্নই হউন আর সুস্থই হউন তাঁহাকে শেষ করিতে হইবে এবং বাদশাহ অতি গোপনে ঐ রাত্রিতেই তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য হুকুম জারি করিয়াছিলেন....

ইতিমধ্যে শিবাজী তাঁহার পুত্র ও সঙ্গীগণসহ আগ্রা শহরের পশ্চিম দ্বার (১) দিয়া বাহির হইয়া একটি ফেরী নৌকায় নদী পার হইলেন। কেহই তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করে নাই। নদীর অপর পারে উপস্থিত হইয়া শিবাজী নৌকার মাঝির হাতে এক মুঠি টাকা দিয়া তাহাকে বলেন যে সে যেন বাদশাহের নিকট বলে যে শিবাজী ও তাঁহার ছেলেকে সে অপর পারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে (২)। কেবল দুঃসাহস দেখাইয়া বাহাদুরি লওয়ার জন্যই শিবাজী এই কাজ করেন নাই। তিনি যে পশ্চিম দিকের অভিমুখে চলিয়াছেন ইহা প্রচার করাই ছিল তাঁহার আসল উদ্দেশ্য। ইহার তাৎপর্য্য শীঘ্রই বুঝিতে পারা যাইবে।

মথুরার পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া শিবাজী যে ভৃত্যদিগের সহিত মিলিত হইলেন। দলবল সহ সকলে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করেন।

---

(১) এই অধ্যায়ের শেষে মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

(২) ওর্ম্ম (Orme)

সারারাত্রি দ্রুততম বেগে চলিয়া তাঁহারা ভোরে মথুরায় পৌঁছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পূজায় উৎসর্গীকৃত মন্দিরেপূর্ণ মথুরা একটি প্রসিদ্ধ স্থান। একটি মন্দির প্রাঙ্গনে আগাগোড়া সোণায় প্রস্তুত এক বিশাল তালগাছ দণ্ডায়মান। বহু মন্দিরের চারিদিকে মঠ, শিক্ষালয় ও তীর্থ যাত্রীদের আবাসস্থান। খোয়া বাঁধান অঙ্গনের চারিদিকে সন্ন্যাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ; ভাসমান পদ্মের পাপড়ির নীচে ছোট পুকুরের নীল নিশ্চল জল; দেবতা, মানুষ ও নানা প্রকার প্রাণীর মূর্ত্তি খোদিত ও ভাস্কর্য্য-মণ্ডিত মন্দির সমূহের বৃহৎ সিংহদ্বার; তোরণ শোভিত মন্দিরের দ্বার পথে অসংখ্য পূজার্থী; মস্তকমুণ্ডিত ও পীত এবং রক্ত বর্ণের গরদ পরিহিত ব্রাহ্মণগণ; অনাড়ম্বর শ্বেতবস্ত্র পরিহিত ছাত্র এবং ব্রহ্মচারীর দল; অশরীরী জীবের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত বিধবা রমনীগণ, পরদা ঝুলান শিবিকায় রাজদুহিতাবৃন্দ এবং উচ্চৈস্বরে চীৎকাররত ভিখারীর দল—প্রভৃতি কত দৃশ্য সর্ব্বদাই এখানে চোখে পড়ে। প্রত্যুষে ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত জনতা নদীর দিকে ধাবিত হয়। নদীর জল শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের ঘাট উপ-ছাইয়া পড়ে। প্রভাত সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জনগন শাস্ত্রীয় আচার অনুযায়ী সূর্য্যপূজা করে। তাহাদের অঞ্জলিপূর্ণ জল ছড়াইয়া দেওয়ায় সূর্য্যালোকে জলবিন্দুগুলি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; আর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা প্রার্থনার মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া বলে, "হে জ্যোতিষ্মাণ সূর্য্যদেব, আমাকে জ্ঞানালোক দাও।" পূজারত জনগনের ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া যাওয়ায় আগ্রা হইতে আগত পলাতকেরা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। কাশী নামক সহানুভূতিপূর্ণ এক ব্রাহ্মণের ঘরে শিবাজী ও তাঁহার সঙ্গীরা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করেন। মস্তক মুণ্ডন করিয়া শিবাজী গোঁফদাড়ি কামাইয়া ফেলিলেন। তারপর মুখে ছাই মাখিয়া তিনি আচারনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর ন্যায় পীতবর্ণের আলখাল্লা পরিধান করেন। তাঁহার কোমরে ভিক্ষার ঝুলি এবং হস্তে সন্ন্যাসী পর্য্যটকের বংশদণ্ড। কিন্তু ঐ বাঁশটির ভিতরটা একেবারে ফাঁপা। রোমক সম্রাট জাষ্টিনিয়নের (Justinian) চীনদেশে প্রেরিত রাজদূতের ন্যায় শিবাজী লাঠির মধ্যে রত্নরাজি বহন করিতেন। তাঁহার সঙ্গীরাও পূজক এবং ভ্রাম্যমান ফকিরের মত বেশ ধারণ করেন। ভারতবর্ষে এই প্রকারের ছদ্মবেশ চিরকালই খুব জনপ্রিয়।

শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে উপহার স্বরূপ অশ্ব পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের সহিত পুত্রকে পশ্চাতে রাখিয়া যাইতে শিবাজী বাধ্য হইলেন, কারণ সারারাত্রি অশ্বারোহণে সে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই কিশোর বালককে কাশীঠাকুর নিজগৃহে লুকাইয়া রাখার প্রস্তাব করেন। তাহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় বস্ত্র পরাইয়া কাশী তাহাকে নিজপুত্র বলিয়া পরিচয় দেন এবং সাধারণ লোকের নিকট বলেন যে তাঁহার পুত্র তাঁহার নিকট বেড়াইতে আসিয়াছে।

ইহার পর শিবাজী ও তাঁহার সঙ্গীরা পুনরায় নিজেদের গন্তব্য পথে চলিলেন।

এখনও তাঁহারা মহারাষ্ট্র হইতে শত শত মাইল দূরে। আগ্রায় বিপদ-সঙ্কেত ঘোষিত হওয়ামাত্র মুঘল সাম্রাজ্যের দূতেরা পলাতকদিগের সন্ধান লইবার জন্য জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া সমস্ত বড় বড় রাজপথ দিয়া ধাবিত হইবে। কর্তৃপক্ষ জানেন যে শিবাজী কয়েকটি অশ্ব পশ্চিম-দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহারা ফেরি নৌকার মাঝির নিকট হইতেও শুনিয়া থাকিবেন যে তাঁহার গন্তব্যপথও ঐ দিকেই ছিল। ইহা হইতে তাঁহরা স্বভাবতঃই ধারনা করিবেন যে তিনি খান্দেশ ও গুজরাটের মধ্য দিয়া মহারাষ্ট্রের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন। এই সব বিবেচনা করিয়া শিবাজী পথ ঘুরিয়া পূর্বদিকে চলিতে লাগিলেন। ইহাতে অবশ্য শত্রুদিগের কবলে পড়িবারও সম্ভাবনা ছিল।

প্রতি শহরে ও গ্রামে বিপদসঙ্কেত ঘোষিত হইল। শিবাজীর গ্রেপ্তারকারীদিগকে পুরস্কৃত করিবার প্রতিশ্রুতিও সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল। এবং তাঁহাকে সাহায্য করা দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে বলিয়া প্রচারিত হইল। এক গ্রামে শিবাজী সন্দেহবশে গ্রেপ্তার হইলেন এবং তাঁহাকে গ্রামের পুলিশ ইনস্পেকটরের নিকট আনা হইল। ইনস্পেকটর তাঁহাকে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত কঠোর জেরা করিতে লাগিলেন। দুপুর রাতে আর সহ্য করিতে না পারিয়া শিবাজী নিজের পরিচয় স্বীকার করেন। কিন্তু লোকচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শিবাজী তাঁহার সূচ্যগ্রবুদ্ধিতে ইনস্পেকটরের প্রকৃত চরিত্র সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পুলিশের কবল হইতে মুক্তি পাওয়ার মূল্যস্বরূপ তিনি ঐ

ইনস্পেকটরকে কিছু ধনরত্ন প্রদান করার প্রস্তাব করেন। ইন্‌স্পেকটর উৎকোচ গহণ করিয়া শিবাজীকে স্বীয় গন্তব্যপথে যাইতে দেন। এই ঘটনায় শিবাজীর শিক্ষা হইল যে তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সতর্কতার সহিত চলাফেরা করিতে হইবে। ইহার পর হইতে তিনি একেলা কেবল মাত্র রাত্রি বেলায় পথ চলিতেন। তাঁহার সঙ্গীরা অন্যপথে চলিতে লাগিল।

এই সময় নাভা নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক বারাণসীর অন্যতম প্রধান পাণ্ডার নিকট অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি অধ্যাপকের ব্যবহারে খুব ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁহাকে দিয়া অত্যধিক কাজ করান হইতেছে ও তাঁহাকে যথোপযুক্ত আহার্য্য দেওয়া হইতেছে না----এই ছিল তাঁহার অভিযোগ। অন্য যে কোন উপজীবিকা গ্রহণের জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। অসংখ্য মন্দিরের চূড়াগুলি ধূসর আকাশের গায়ে কালো ছায়ার মত দেখাইতেছিল। কোথাও বা মন্দিরের মধ্যে বা বৃক্ষের নীম্নে কম্পমান প্রদীপ শিখার আলো দেখা যাইতেছিল। চিতা-বাঘের চর্ম্ম পরিহিত সাধু একান্তে বসিয়া মন্ত্র আবৃত্তি করিতেছিলেন। খরস্রোতা নদী পাতলা কুয়াসায় আবৃত। ব্রাহ্মণ চিন্তামগ্ন। এমন সময় অন্ধকারের মধ্য হইতে মস্তকাবৃত এক মানবমূর্ত্তি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলেন, "আপনি আমার জন্য আনুষ্ঠানিক গঙ্গাঞ্জলি ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া প্রাতঃকালীন পূজা ও উপাসনা করিবেন ?"

নাভা রাজী হইলেন। শীত ও কুয়াসার মধ্যে তিনি এই অপরিচিত ব্যক্তির শুভকামনায় ব্রাহ্মণের করণীয় শাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করেন।

সহসা ভেরী ও ঢক্কা নিনাদে সমস্ত নগরী জাগরিত হইল। প্রহরা-রত পুলিশ পথে পথে ঘুরিয়া পুরবাসীদের জাগ্রত করিতে লাগিল ও ঘোষণা করিল যে শিবাজী বারাণসীতে আছেন এইরূপ সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অজ্ঞাত ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণ পরস্পরের দিকে তাকাইলেন। "আপনার হাত উন্মুক্ত করুন" এই বলিয়া আগন্তুক নয়খানি বৃহৎ মণি ব্রাহ্মণের হস্তে রাখিলেন। নাভা ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে নাই এই ভাবে পূজোপসনায় রত

রহিলেন, আব এদিকে আগন্তুক অন্ধকাবেব মধ্যে তিরোহিত হইলেন। কিন্তু ঐদিন প্রধান পাণ্ডা বৃথাই তাঁহাব শিষ্যের প্রত্যাবর্ত্তনেব জন্য অপেক্ষা কবেন। যুবক শিষ্য বারাণসী পবিত্যাগ করিয়া সুবাট গমন করেন। সেখানে তিনি এক বৃহৎ বাটী ক্রয কবিয়া চিকিৎসকেব ব্যবসা আরম্ভ কবেন। বহু বৎসব পবে তিনি ঐতিহাসিক কাফি খাঁব নিকট তাঁহার পার্থিব ঐশ্বর্য্যেব প্রকৃত তথ্যেব কাহিনী গোপনে বর্ণনা কবেন।

কখনও পদব্রজে কখনও অশ্বারোহণে শিবাজী বঙ্গোপসাগবেব কূলে উপস্থিত হইলেন।

আশ্চর্য্যেব বিষয় যে জেলেদেব বসতি ছোট গ্রামেও শিবাজীর পলাযনেব সংবাদ পূর্ব্বেই পেঁ ৗছিযাছিল। তিনি একটি ঘোড়া ক্রয করিতে চাহিলে অশ্ব-বিক্রেতা সন্দিহান হইযা বলে, "আপনি ইহা দিযা কি কবিবেন ?"

শিবাজী মূল্যস্বরূপ তাহাকে কযেকটি মোহব দিতে চাহিলে তাহার সন্দেহ দৃঢ়তর হয এবং সে বলে, "আপনি অর্থ লইযা যে রূপ ছিনি-মিনি খেলিতে প্রস্তুত তাহাতে মনে হয আপনি নিশ্চযই সেই পলায়ত মারাঠা।"

হতাশ হইযা শিবাজী তাহাকে তাঁহার অবশিষ্ট সমস্ত অর্থ দিতে সম্মত হন। এই ব্যক্তিব অর্থলিপ্সায় পুনবায শিবাজী রক্ষা পাইলেন। তিনি যে প্রাণ লইযা পলাইতে পাবিলেন ইহাতে তিনি খুব নিস্কৃতি বোধ করেন কিন্তু এখন তিনি কপর্দ্দকহীন, এমন কি যে ঘোড়াটি তিনি কিনিতে চাহিয়াছিলেন তাহাও পাইলেন না।

ক্লান্ত দেহে শিবাজী মধ্যভারতেব অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ইন্দোবেব সন্নিকটে আসিয়া তিনি এক কৃষকের গৃহে আশ্রয় চাহিলেন। মনে ভাবিলেন যে এ দেশের লোকেরা সাধারণতঃ অতথি বৎসল; হয়তো তাঁহাকে অতিরিক্ত প্রশ্ন করিয়া জর্জরিত করিবে না। একজন পদব্রজে ভ্রমণকারী মনে করিয়া গৃহস্থ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। গৃহস্বামীর মাতা রাতের আহার্য্য প্রস্তুত করিতে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে প্রবেশ করেন। কিন্তু এই সময় একদল বেসরকারী মারাঠা সৈন্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত

ঐ অঞ্চল আক্রমণ করে। শিবাজী যে গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিলেন উহাও তাহারা বিধ্বস্ত করিয়াছিল। রন্ধনশালা হইতে বাহির হইয়া বৃদ্ধা মহিলা লুঠতরাজের জন্য মারাঠাদিগকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন।

তিনি বলেন, "ঐ ডাকাত শিবাজীটার কথা আর কি বলিব। ব্যাটা'-ছেলে কারাগারে মরিলেও নিশ্চিন্ত হইতাম।"

এই বৃদ্ধার এবং তাঁহাদের পরিবারের মারাঠাদের আক্রমণের ফলে কি পরিমান ক্ষতি হইয়াছে তাহা শিবাজী উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলেন। কয়েক মাস পরে নিজ রাজ্যে পৌঁছিয়া তিনি এই স্ত্রীলোকটিকে একটি টাকার থলি পাঠাইয়া দেন। বৃদ্ধার হিসাবে তাঁহাদের পরিবারে যে ক্ষতি হইয়াছিল উহার দ্বিগুণ টাকা ঐ থলিতে ছিল।

শিবাজীর মাতা তখনও রাজ প্রতিনিধির কাজ চালাইতে ছিলেন। আগষ্ট মাসে তিনি শিবাজীর পলায়নের সংবাদ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর তিনি আর কিছু জানিতে পারেন নাই। শুধু শুনিয়াছিলেন যে এই ঘটনার আলোড়ন সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যে বিস্তীর্ণ হইয়াছে এবং কর্ত্তৃপক্ষ শিবাজীকে সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছেন। চারিমাস চলিয়া গেল। শিবাজীর আর কোন সংবাদ আসিল না।

ডিসেম্বর মাসে একদিন প্রাতে তিনি অন্তঃপুরে নিজের প্রকোষ্ঠে একাকী বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে একটি ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে বলে যে এক ফকীর তাঁহার দর্শন প্রার্থী। তিনি মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিলেন। পথের ধূল্যবলুণ্ঠিত ছিন্নবস্ত্র পরিহিত এক ভিখারীকে ভিতরে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইল। তিনি কোনদিকে না তাকাইয়া।" বলেন, "আচ্ছা, ব্যাপারকি? কি হইয়াছে?"

ফকীর উত্তর দিল "আমি আপনার নিকট এক বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছি।" এই বলিয়া সে তাঁহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

ফকীরের কার্য্যকলাপে বিচলিত হইয়া তিনি তাহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করেন এবং তাহার মুখের দিকে তাকান।

এই মুখ শিবাজীর।----

শিবাজীর প্রত্যাগমনের বার্ত্তা সমস্ত মারাঠাদেশে বিদ্যুৎবেগে ছড়াইয়া

পড়ে। রাত্রি দিন তোপ ধ্বনি প্রতি পাহাড়ের শীর্ষে বহ্যুৎসব, শীতের আকাশে হাউই বাজি পোড়ান প্রভৃতি অনুষ্ঠানে লোকে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল ; গ্রামবাসীরা উৎসব ও আমোদ আহ্লাদে গা ভাসাইয়া দিল। সকলের মুখেই শিবাজীর মনোমুগ্ধকর নাম। যাহাদের একটু সঙ্গতি ছিল তাহারা প্রত্যেকেই রাজধানীতে আসিয়া বন্দীত্ব অবসানের পর রাজাকে একবার দেখিবার জন্য সতৃষ্ণনয়নে প্রাসাদের দরজার দিকে তাকাইয়া থাকিত। শিবাজীর পলায়নের ও ভ্রমনের অপূর্ব্ব ও বিপদ-সঙ্কুল আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত ও মুঘলদিগকে তিনি কিভাবে হতবুদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন এই সব রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিতে সকলেই আগ্রহান্বিত।

দাক্ষিণাত্যে বাদশাহের প্রতিনিধি মহারাজা জয়সিংহ শিবাজীর প্রত্যাবর্ত্তনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। শিবাজীর পলায়নের সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি বিভ্রান্ত হইয়া লেখেন, "আমার দুর্ভাবনার আর শেষ নাই। শিবাজীর সংবাদ আহরণের জন্য আমি সর্ব্বত্র বিশ্বস্ত অনুচর পাঠাইয়াছি।" এইবার তাঁহার প্রত্যেকটি আশঙ্কা প্রমাণিত হইল। "ঐ শয়তান শিবাজী ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার মনে এখন কি আছে কি জানে?"---এই বলিয়া তিনি হাহাকার করিয়া উঠিলেন। বাদশাহ শিবাজীকে বন্দী করিয়া তাঁহাকে যে নিরাপত্তার আশা দিয়াছিলেন এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় জয়সিংহ খুব মনঃকষ্ট পান এবং পুত্র রামসিংহের উপর শিবাজীকে সংরক্ষণ করার ভার দেওয়া হইয়াছে ইহা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনায় কাল কাটাইতেছিলেন। শিবাজীর পলায়ন করার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রামসিংহের পদচ্যুতি এবং দরবার হইতে বিতাড়িত হওয়ার সংবাদ পান। পুত্র বাদশাহ আওরঙ্গজেবের যেরূপ কঠোর কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছে তাহার পর বাদশাহের ক্রোধ কি পিতার উপর বর্ষিত হইবে না? পরম্পরায় জয়সিংহ শুনিতে পাইলেন যে মুসলমান ওমরাহগণ তাঁহার উচ্চপদ ও অত্যধিক যশ এবং খ্যাতিলাভে ঈর্ষান্বিত হইয়া শিবাজীর পলায়ন সংক্রান্ত ষড়যন্ত্রে তিনিও লিপ্ত ছিলেন বলিয়া সম্রাটের নিকট অভিযোগ করে। জয়সিংহের ন্যায় একজন বিশ্বস্ত ও রাজভক্ত বীরের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ

অপেক্ষা আর কিছু অধিক সাঙ্ঘাতিক হইতে পারে না। ইহা শোনামাত্র চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন, "কেহ এইরূপ বিশ্বাসঘাতকার কথা চিন্তা করিলেও ভগবান যেন তখনই তাহার মৃত্যু সঙ্ঘটন করান।" বড়ই পরিতাপের বিষয় যে সুদীর্ঘকাল মুঘলসাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে বিশিষ্ট কার্য্যাদিতে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও জয়সিংহের জীবনের শেষ কয় মাস ভয় এবং শোকে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। "অদৃষ্টের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব নয়"—এই বলিয়া বৃদ্ধ বীর সম্রাটের আদেশের অপেক্ষায় রহিলেন। শীঘ্রই বাদশাহী হুকুম আসিল। জয়সিংহ পদচ্যুত হইলেন ও দিল্লীর দরবারে প্রত্যাবর্ত্তন করার আদেশ পাইলেন। লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেও নির্ভীক চিত্তে জয়সিংহ ধীরে ধীরে উত্তরাভিমখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু বাদশাহের সহিত সাক্ষাত করা তাঁহার পক্ষে আর এ জীবনে সম্ভব হইল না। পথে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। পিতৃবিয়োগের পর রামসিংহ বেশীদিন বাঁচেন নাই। আসামে প্লেগরোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শিবাজী ও তাঁহার সঙ্গীগণের মধ্যে অনেকেই ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া নানা পথে ঘুরিয়া নিরাপদে দেশে পৌঁছিলেন বটে, তাঁহার পুত্র শম্ভূজী কিন্তু বিদেশেই রহিয়া গেলেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে মথুরায় এক সহৃদয় ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহাকে রাখিয়া আসা হইয়াছিল। বাদশাহী সৈন্যরা তাঁহাকে পাইলে নিশ্চয়ই পিতার পলায়নের জন্য তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইত। কাজেই শিবাজী পুনরায় "চাতুরির" আশ্রয় লইলেন। শম্ভূজীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার ভাব দেখাইয়া তিনি প্রকাশ্যে পুত্রের জন্য গভীর উদ্বেগের ভাণ করেন। মুঘল দূতেরা রাজধানীতে সংবাদ পাঠায় যে শিবাজীকে "পুত্রের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন মনে হইতেছে।" ইহার পর শিবাজী ঘোষণা করেন যে তিনি পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছেন। তিনি অনেকক্ষণ নিদারুণ ক্রন্দন করেন এবং তাঁহার সমস্ত অনুচর বর্গকে শোক পালন করিতে নির্দ্দেশ দেন। এইরূপ শোকের নিদর্শনে মুঘল রাজদূতেরা সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হয়; কারণ তাহারা এই সংবাদ নিশ্চয়ই সত্য বলিয়া মনে করে।

কয়েকদিন পরে এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর হাতে মথুরায় কাশীঠাকুরের নিকট চিঠি দিয়া তিনি শম্ভুজীকে রায়গড়ে লইয়া আসিবার জন্য ঐ ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করেন। তখন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে শম্ভুজী কাশী-ঠাকুরের সহিত মারাঠা দেশে রওনা হন।

উজ্জয়িনীর নিকট আসিলে তাঁহারা অতিকষ্টে পরিত্রাণ পান। একজন মুঘল দারোগা শম্ভুজীর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাইয়া স্থির করেন যে তাঁহার হাবভাব মোটেই পরোহিতের পুত্রের ন্যায় নহে।

দারোগা কাশীকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই বালক কি সত্যিই আপনার পুত্র?" "হাঁ মহাশয়" এই বলিয়া কাশী কথার মোড় ঘুরাইয়া দিয়া তাহাদের এলাহাবাদে তীর্থযাত্রার এক কাহিনী খুব তাড়াতাড়ি বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে গঙ্গায় স্নান করিয়া তাঁহারা মন্দিরাদি দর্শন করেন। কিন্তু জায়গাটা বড়ই অস্বাস্থ্যকর বিশেষ দাক্ষিণাত্যের লোকেদের পক্ষে। কারণ, কাশীর স্ত্রী সেখানে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং মারা যান। সুতরাং এখন পিতা ও পুত্র শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বীয় গ্রামে ফিরিয়া যাইতেছেন----ইত্যাদি।

মুঘল পুলিশ কর্ম্মচারী তাঁহার বক্তৃতা থামাইয়া দিয়া বলেন, "বালক যদি সত্যিই আপনার পুত্র হয় তাহা হইলে আমার সম্মুখে আপনারা দুইজনে একই থালা হইতে আহার গ্রহন করুন।"

জাতিপ্রথা অনযায়ী ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের একই সঙ্গে আহার করিলে ব্রাহ্মণের জাতি ভ্রষ্ট হয়। বহুব্যয় সাধ্য ও শ্রান্তিকর প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত ইহার কোন প্রতিবিধান নাই। কিন্তু কাশী বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে পুলিশ তাঁহার প্রতিটি কথা এবং আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিতেছে। তিনি কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া শম্ভুজীকে লইয়া একই পাত্রে আহারে বসিলেন।

ইহাতে তাঁহাদের আত্মীয়তা সম্বন্ধে পুলিশের প্রত্যয় জন্মে ও তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন। পরে আর কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে নাই এবং যথা সময়ে তাঁহারা রায়গড়ে পৌঁছান।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

শিবাজীর বন্দীত্ব ও পলায়ন সম্বন্ধে আলোচনা

আগ্রা কিম্বা দিল্লী এই দুই স্থানের কোথায় শিবাজীকে বন্দী করা হয় ইহা লইয়া ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। মারাঠা তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব্বতন লেখকেরা মনে করেন যে শিবাজী দিল্লীতে বন্দী হন। অপর দিকে কাফী খাঁয়ের মতে তিনি আগ্রায় বন্দী হন। উত্তর ভারতীয় মুসলমান লেখক যে স্থানীয় আঞ্চলিক সংবাদ সম্বন্ধে দক্ষিণ দেশীয় হিন্দুদিগের অপেক্ষা অধিকতর অবহিত হইবেন ইহা একপ্রকার ধিশ্চিতরূপে বলা চলে। এতদ্ব্যতীত অন্ধকার যুগের ইউরোপীয়েরা রোম শহরকে যেমন একটা রহস্যাবৃত নগরী বলিয়া মনে করিত, বর্ত্তমান কালেও সেইরূপ দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা দিল্লী শহর সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা পোষণ করে। তাহাদিগকে নিকট দিল্লী সর্ব্বদাই সরকারী দরবারের স্থান বলিয়া প্রতিভাত হয়। বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন শিবাজী "মুঘল সম্রাটের সহিত সাক্ষাত করিতে "দিল্লী গিয়াছিলেন (পৃ ১৯০) ; কিন্তু তিনি কোথাও একথা বলেন নাই যে শিবাজীকে দিল্লীতে বন্দী করা হয়। যাহা হউক সমস্ত ব্যাপারটা তিনি মাত্র দুই তিন লাইনে লিপিবদ্ধ করেন। বার্ণিয়ার এ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন (তাঁহার অজ্ঞতার প্রমাণ-স্বরূপ তাঁহার একটা উদ্‌ভট ধারনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি অত্যন্ত নির্ব্বোধের ন্যায় ইঙ্গিত করিয়াছেন যে আওরঙ্গজেব স্বয়ং শিবাজীর পলায়নের উপায় উদ্‌ভাবন করেন।) ঐতিহাসিক ওর্ম্ম অবশ্য ঘটনাস্থল আগ্রা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ওর্মের লেখা সব সময় খুব বিশ্বাসযোগ্য নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে তাঁহার বর্ণনা অনুযায়ী শিবাজীর পলায়নের সময় শম্ভুজীর মৃত্যু ঘটে। ঐতিহাসিকগণ ব্যতীত যে ব্যক্তি এই ঘটনাস্থল সম্বন্ধে সম্যক সংবাদ দিতে পারিবেন তিনি যে স্বয়ং শিবাজী ইহা সহজেই অনুমেয়। এক চিঠিতে শম্ভুজীকে লইয়া আসিবার জন্য শিবাজী কাশীঠাকুরকে পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কারের আদেশ দেন। এই চিঠির সূচনায় লেখা,

"আগ্রা পরিত্যাগ করার পর...." ইত্যাদি। ডাঃ ফ্রায়ার সর্ব্বদাই সতর্ক ও সঠিকভাবে ঘটনাদি লিপিবদ্ধ করিতেন। তাঁহার বৃত্তান্ত এই বলিয়া শেষ হইয়াছে, "লোকের ধারণা যে তিনি (শিবাজী) হয়তো আর কখনও আগ্রায় আসিতে সাহস করিবেন না।"

শিবাজী কোন পথে পলায়ন করেন এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিক স্যর যদুনাথ সরকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও প্রায় সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও একটা অদ্ভুত ভ্রম করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আগ্রা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে যাওয়ার পরিবর্ত্তে তিনি (শিবাজী) পূর্ব্বদিকে মথুরা অভিমুখে চলিতে থাকেন....। স্যর যদুনাথ "পূর্ব্বদিক" কথাটা বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়াছেন; করিলেও ইহা জানা কথা যে মথুরা পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তীকালে বরাবরই আগ্রার পশ্চিমে অবস্থিত। হয়তো এইভাবে স্যর যদুনাথের লেখার সামান্য ত্রুটির ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে: পূর্ব্বতন লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই দিল্লীকে ঘটনাস্থল বলিয়া মনে করিতেন এবং স্যর যদুনাথ ঐ মতেই অনুসরণ করেন। পরে কিন্তু তিনি মত পরিবর্ত্তন করেন এবং দিল্লীর স্থলে আগ্রার উল্লেখ করেন (বাস্তবিক, মথুরা দিল্লী হইতে পূর্ব্বদিকে।) যদিও তিনি শিবাজীর পলায়নের পথের ভৌগলিক খুটিনাটি শুদ্ধ করার কোন প্রচেষ্টা কারণ নাই। যাহা হউক এই সব কারণে ইহা স্পষ্ট যে প্রথমে তিনি পশ্চিমে মথুরার দিকে অগ্রসর হন (ইহা তিনি ভালভাবে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন) কিন্তু ইহাতে তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ছিল মুঘল কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা যে তিনি নিজের দেশের দিকে সোজা ও সিধা পথ অনুসরণ করিতে লাগিলেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্ব অভিমুখে রওনা হইলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

উত্তর ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শিবাজী তাঁহার মাতা ও প্রতিনিধি সভার নিকট হইতে স্বয়ং শাসন কার্য্যের ভার লইলেন। মুঘলদিগের সহিত তাঁহার এখন অদ্ভুত সম্পর্ক। সরকারীভাবে তাঁহার

এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সহিত মুঘল সাম্রাজ্যের এখন মৈত্রীপূর্ণ ভাব। কিন্তু দুই পক্ষই মনে করেতেন যে এই মিত্রতা সম্পর্কের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। শিবাজীর ধারনা যে তাঁহাকে বন্দী করিয়া ও তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়া মুঘলেরা সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছেন আর অন্য পক্ষের মত এই যে বিজয়ী বীরের মত নিজ রাজধানীতে পুনরাগমন করিয়া শিবাজী সন্ধী অনুযায়ী কাজ করেন নাই। বাস্তবিক দুই পক্ষের কেহই তখনও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ইতিমধ্যে জয়সিংহের স্থলে যোধপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহ দাক্ষিণাত্যে প্রধান সৈন্যাধক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনিও বাদশাহের অনুগত রাজপুতনার একজন সামন্ত নৃপতি।

যোগ্য সেনাপতি জয়সিংহের পুত্র স্বহধর্ম্মী হিন্দু নেতা শিবাজীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এই অজুহাতে জয়সিংহকে পদচ্যুত করিয়া যুদ্ধবিদ্যায় তাঁহার অপেক্ষা অনেক হীনতর আর একজন হিন্দুকে কেন যে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সৈন্যাধক্ষ্য করিয়া পাঠাইলেন ইহা একটু বিস্ময়কর। কিন্তু ধর্ম্মে গোঁড়ামি সত্ত্বেও মুসলমান সেনাপতিদিগের কার্য্যকলাপে ও উচ্চাকাঙ্খায় সন্দিহান আওরঙ্গজেবকে বাধ্য হইয়া হিন্দুসেনাপতিদিগের উপর নির্ভর করিতে হইত। এ বিষয়ে তাঁহার অবস্থা অনেকটা কনস্তানতিনোপোলের খালিফাদিগের মত হইয়াছিল। ঐ খালিতারাও ধর্ম্মের বিরোধিতা সত্ত্বেও গ্রীক সেনাপতি নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইতেন। জয়সিংহ প্রথম হইতেই শাসনকার্য্যে দ্বৈত অধ্যক্ষতার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব এখন সেই মারাত্মক ভুল করিলেন। তিনি যুবরাজ মুয়জমকে দাক্ষিণাত্যের অসামরিক শাসনকর্ত্তা ও যশোবন্ত সিংহকে সামরিক শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। বাদশাহ আশা করিয়াছিলেন যে ইহাঁরা একে অন্যের উপর গোয়েন্দাগিরি করিয়া তাহাকে সংবাদ সরবরাহ করিবেন ; এবং এইভাবে আওরঙ্গজেব উভয়েরই কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সংবাদাদি পাইবেন। তিনি এক চিঠিতে মন্তব্য করেন, "রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে বা না হইতেছে সে সম্বন্ধে ত্বরিত অবহিত হওয়াই রাজ্যশাসনের প্রধান ভিত্তি।" যাহা হউক যশোবন্ত সিংহ ছিলেন মিষ্টভাষী সভাসদ। তিনি যুবরাজকে তোষামোদে তুষ্ট রাখিতেন। রাজধানী

হইতে যুবরাজের নির্ব্বাসনের ক্লান্তি অপনোদনের নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে পোলো খেলিবার ঘোড়া ও কুস্তিগির বালক প্রভৃতি আমদানি করিতেন। ইহার পরিবর্ত্তে যুবরাজ যশোবন্ত সিংহকে সেনা বিভাগ ও বে-সামরিক বিভাগ উভয়ের উপরই প্রকৃত ক্ষমতাচালনের অধিকার দেন।

শিবাজীর প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাওয়ামাত্র জয়সিংহ উত্তেজিত হইয়া যে কোন উপায়ে পুনরায় শিবাজীকে করায়ত্ব করা প্রয়োজন এই মর্ম্মে বাদশাহকে চিঠি লেখেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া শিবাজীকে বন্দী করায় এই বৃদ্ধ রাজপুত মনে খুবই আঘাত পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ইহাও মনে মনে বেশ বুঝিয়াছিলেন যে তখন মান-সম্মান যাঁচাই করিয়া দেখার উপযুক্ত সময় নয়। জয়সিংহ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে ত্যক্ত-বিরক্ত ও বেপরোয়া বীর শিবাজী এখন পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ভয়ানক ও বিপজনক শত্রুতে পরিণত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ছলে বলে কৌশলে যে ভাবেই হউক শিবাজীকে আবার বন্দী করার জন্য তিনি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক তাঁহার দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ পেঁৗছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সৈন্যরা মারাঠাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে।

যশোবন্ত ছিলেন অন্য ধরনের লোক। স্বার্থপর ও আমোদপ্রিয় এই রাজপুত সেনাপতির অভিজ্ঞতা এতদিন যুদ্ধক্ষেত্র অপেক্ষা দরবারের খোশামোদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এতদ্ব্যতীত আগ্রায় তিনি শিবাজীর সাক্ষাতলাভ করেন; এবং "এই জাদুকরের অপূর্ব্ব জাদুদণ্ডের মোহে যাহারা আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের অন্যান্য সকলের মত" যশোবন্ত সিংহও তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

জয়সিংহ পুনরায় যে যুদ্ধ আরম্ভ করেন উহা বৎসরাবধি চলিয়াছিল। শেষপর্য্যন্ত ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে এক নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। উহার সর্ত্তাদি শিবাজী-জয়সিংহের মধ্যে পূর্ব্বে স্বাক্ষরিত সন্ধি হইতে বহুলাংশে পৃথক। পূর্ব্বের সন্ধি অনুযায়ী মুঘলদিগের অধিকৃত সাতাশটি দুর্গের অধিকাংশই শিবাজীকে প্রত্যার্পণ করা হয়। পুণার চারিদিকে অবস্থিত দুর্গগুলির মধ্যে কেবল পুরন্দর ও সিংহগড় মুঘলদিগের অধীনে রহিল।

ইহার পর শিবাজী বাদশাহের নিকট এক চিঠি লেখেন। আওরঙ্গ-

জেব তাঁহার প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার ভান করিয়া মুরুব্বিয়ানা চালে উহার উত্তরে লেখেন, "নমস্কার জানিবেন। আমরা আপনার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। আপনার চিঠি পাঠ করার পর আমরা আপনাকে রাজা উপাধি দিয়া সম্মানিত করিলাম। আপনি এই সম্মানিত উপাধি গ্রহণ করিয়া আরও অধিকতর প্রশংসনীয় কাজ করিবেন আশা করি।" বিগত কয়েক বৎসরের ঘটনার পর মনের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া মুখ রক্ষা করার প্রচেষ্টার এই চিঠি একটি মনোরম নিদর্শন।

মহারাষ্ট্রে শিবাজীর প্রত্যাবর্ত্তনে কেবল মাত্র মুঘলেরাই অপ্রত্যাশিত রকমে চমৎকৃত হন নাই। বিজাপুর রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ শিবাজী যেরূপ অনুকূল সর্ত্তে মুঘলদিগের সহিত সন্ধি করিয়াছেন উহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা এই ভাবিয়া ভয় পাইলেন যে উত্তর সীমান্তে এখন গোলমালের সম্ভাবনা অপসারিত হওয়ায়, "এই অমানুষিক নরঘাতকের" ধ্বংসাত্মক অশুভ দৃষ্টি এখন দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইবে। তাঁহারাও অচিরাৎ শিবাজীকে তুষ্ট করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিবেন না এই প্রতিশ্রুতির মূল্যস্বরূপ শিবাজী বিজাপুর রাজ্য হইতে বার্ষিক তিন হাজার পাঁচশত টাকা কর পাইবেন স্থির হইল।

দুই বৎসর শিবাজী উভয় মুসলমান প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ হইতে বিরত রহিলেন। বিগত জীবনে তিনি উহাদিগকে ভয় দেখাইয়া বা আক্রমণ করিয়া যেরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি করিতেন তাহার পরিপ্রেক্ষিতে শিবাজীর এই সহসা নিষ্ক্রিয়তা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে। সাধারণতঃ অনেকেই এইরূপ একটা পরিস্থিতি বিশ্বাস করিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। একটা চাপা সন্দেহ চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। এই অবস্থায় ইংরাজ কুঠিয়ালগণ চিঠি পত্রের বিনিময়ে লেখেন "শিবাজী এখন বেশ শান্ত।" তাহাদের চিঠিতে এই ধরণের সুর প্রায়ই ধ্বনিত হইতে লাগিল। অন্যান্য চিঠিতে লেখা "দেশের সর্ব্বত্র এখন একটা শান্তির সমাচ্ছন্ন আবহাওয়া;" "শিবাজী বেশ শান্ত, মুঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করার তাঁহার কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না"—ইত্যাদি।

এই সময়ে শিবাজী তাঁহার রাজ্যের শাসনপদ্ধতির সংস্কার করেন।

প্রজাদের দেয় খাজনার পরিমান হ্রাস করা হইল এবং যে সব জমি মুঘলদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছিল, ঐ সব অঞ্চলের খাজনা আদায় মুলতুবী রাখা হইল। প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে সামান্ততন্ত্র প্রচলিত থাকায় ওখানে কর আদায় নানা প্রকার খামখেয়ালীর উপর নির্ভব করিত। কিন্তু শিবাজী পক্ষপাতশূন্য ও সমতার ভিত্তির উপর রাজস্ব প্রণালী আইন এবং শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীভূত করিয়া নিজের ক্ষমতার ভিত্তি সর্ব্বত্র দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার ফলে তাঁহার রাজ্য অতি আশ্চর্য্যরূপে বিগত যুদ্ধেব ক্ষতি পরিশোধ করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইল।

শিবাজীর রাজ্যের সমৃদ্ধি ও প্রজাদিগের তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তির প্রকৃত কারণ হইল এই যে তাঁহার বাল্যশিক্ষক দাদাজীব পুণার সন্নিকটস্থ তাঁহাদের পারিবারিক জমিদারি পরিচালনার সুদৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া তিনি খুব বিচক্ষণ ও পক্ষপাতশূন্য এবং ন্যায় সঙ্গত রীতি অনুযায়ী রাজস্ব প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। কর ধার্য্য করিবার সময় লোকের আনুমানিক সম্পত্তি অথবা জমির উর্ব্বরতা সম্বন্ধে কেবল কল্পনার উপর নির্ভর না করিয়া প্রতি বৎসর জমির উৎপাদনের পরিমান বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা হইত। ধানী, পাহাড়ী, ও ফলের বাগান—এই তিন শ্রেণীতে জমি ভাগ করা হইল। ধানী জমির কর ধার্য্য হইল উৎপাদিত শস্যের এক তৃতীয়াংশ। এই কর শস্য অথবা নগদ টাকায় সরকারকে দেওয়া যাইত। উদ্যানের, —অর্থাৎ ফল, সব্জি, তালগাছের বাগান—ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত জমির কর ধার্য্য হইল বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত ফলের অর্দ্ধেকাংশ পার্ব্বত্য জমিগুলির কর খুব উচ্চহারে ধার্য্য করা হইল। উপরোক্ত করের পরিমান বেশী মনে করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ সময় ভারতবর্ষে অন্য যে কোন রাজ্যে প্রচলিত করের সহিত তুলনায় উহা পরিমানে অনেক কম। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা হইল যে এই কর নিয়মিত আদায় করিয়া উহা সরাসরি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইত। কর আদায়ের জন্য কোন মধ্যবর্ত্তী দালালের বা প্রজাদিগকে গুরুতর ভারে নিষ্পেষিত করার জন্য সামন্ত প্রথানুযায়ী কোন জমিদারের অস্তিত্ব ছিলনা। রাজা ছিলেন সমস্ত জমির মালিক। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় এখানে উচ্চ পদস্থ ও সম্ভ্রান্তবংশীয়

অমাত্যগণকে যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন বা দরবারে কোন উৎকর্ষজনক কাজের জন্য রাজ্যের কোন অংশ বিলি ব্যবস্থা করার প্রথা প্রচলন করা হয় নাই। বাস্তবিক বৃটিশ শাসনকালীন ভারতবর্ষের কৃষিবিভাগের ব্যবস্থা শিবাজীর রাজস্বপ্রথার উপর অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত।

আটজন সদস্য লইয়া গঠিত এক পরিষদের উপর শিবাজী রাজ্যের শাসন কার্য্য পরিচালনার ভার অর্পন করেন। এই সদস্যগণকে শিবাজী স্বয়ং নিযুক্ত করিতেন। কার্য্যতঃ কেবলমাত্র তাহাদিগকে দপ্তরের কর্ম্ম-সচিবের মত কাজ করিতে হইত। পুণার চতুস্পার্শ্বস্থিত জমিদারি পরিচালনার জন্য কয়েকজন কেরানী লইয়া দাদাজী যে দপ্তর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন উহা হইতেই এই পরিষদের উদ্ভব হয়। ক্ষুদ্র জায়-গিরদারের পদ হইতে শিবাজী স্বাধীন রাজারূপে সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গেসঙ্গে ঐ সব কেরাণীদিগের কাজের প্রকৃতি ও পদমর্য্যাদাও পরিবর্দ্ধিত হয়। আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে শিবাজী প্রধান বিচারপতিকে পরিষদের একজন সভ্যরূপে নিযুক্ত করেন। একমাত্র প্রধান সেনাপতি ব্যতীত পরিষদের অন্যান্য সমস্ত সদস্যই ছিলেন ব্রাহ্মণ। প্রধান সেনাপতি ছিলেন মারাঠা।

শিবাজী রাজধানীতে উপস্থিত থাকিলে পরিষদের সভ্যগণের ক্ষমতা পরিচালন করার বিশেষ সুযোগ ঘটিত না, যদিও বিদেশী শক্তিদিগের সহিত সন্ধিপত্র শিবাজী এবং পরিষদের প্রত্যেক সভ্যকেই সহি করিতে হইত বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রণা পরিষদ থাকা সত্ত্বেও আগ্রা গমন অথবা সুদীর্ঘ অভিযান পরিচালনা প্রভৃতি ব্যাপারে যখন শিবাজীকে দীর্ঘকালের জন্য রাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকিতে হইত তখন তিনি পরিষদের সভ্যগণের মধ্য হইতে মনোনয়ন করিয়া একটি প্রতিনিধি-সভা গঠন করিতেন। বিচার বিভাগের ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় সমূহের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রীদ্বয় তাঁহাদের শাসনকার্য্যে শিবাজীর হস্তক্ষেপ যে বিশেষ পছন্দ করিতেন না ইহা সহজেই ধারনা করা যায়। হিন্দু ধর্ম্মের নানা প্রকার খুঁটি নাটি সমস্যা এবং উহার ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য এত জটিলতাপূর্ণ যে ব্রাহ্মণ বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে উহা বিশ্লেষণ করা সম্ভব ছিলনা। শিবাজীর পুঁথিগত বিদ্যার বিশেষ পারদর্শিতা ছিলনা। আর

তখনকার দিনে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের ব্যবহারে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতদিগের চালচালনের আভাস পাওয়া যাইত। কাজেই শিক্ষিত ও বিদ্বান লোকের অভাবে ব্রাহ্মণগণই যে শিবাজীর পরিষদ সভায় প্রাধান্য লাভ করিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার ফল পরে অশুভ হয়। একদিন এই ব্রাহ্মণমন্ত্রীদের কর্ত্তৃত্ব এতদূর বর্দ্ধিত হয় যে প্রাসাদের প্রধান ব্রাহ্মণশাসকের ক্ষমতা শিবাজীর বংশধরগণের গৌরব ম্লান করিয়া তাহাদের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করে।

সৈন্যদিগকে কিভাবে কাজে নিযুক্ত রাখিবেন ও কি উপায়ে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবেন প্রথম হইতেই শিবাজীর এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। একটি দরিদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সমর বাহিনীর সাজ সরঞ্জাম ও ঠাঁট বজায় রাখা খুবই ব্যয়সাধ্য। এ কথাও সত্য যে বহুবৎসর পরিশ্রমের ফলে সমর বাহিনী সুশৃঙ্খলিত ও সংগঠিত করা হয়। সেনা বাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে সমস্ত পরিশ্রমই বিফলতায় পর্য্যবেশিত হওয়ার সম্ভাবনা। সকলেরই ধারনা যে এই সন্ধি বেশী কাল স্থায়ী হইবে না। শিবাজী এই সমস্যার যে আংশিক সমাধান করেন উহা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যেরই পরিচায়ক।' তাঁহার প্রতি যশোবন্ত সিংহের শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবের সুযোগ লইয়া তিনি প্রস্তাব করেন যে মুঘল সাম্রাজ্য এবং মারাঠাদিগের মধ্যে সৌহার্দের প্রতীকরূপে একদল মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য মুঘল সমর বাহিনীর সহিত সংযুক্ত করা হউক। এই প্রস্তাব সাগ্রহে গৃহীত হইল। শিবাজী তাঁহার মূল অশ্বারোহী সৈন্যদলের মধ্য হইতে এক সহস্র সৈন্য বাছাই করিয়া বাদশাহের প্রতিনিধির আবাস স্থানে প্রেরণ করেন। ঐ সৈন্যদল দুইবৎসর ওখানে অবস্থান করে। মারাঠারা উল্লসিত হইয়া মন্তব্য করিত যে উহারা "মুঘলদিগের খরচে আহারাদি করিয়া" বেশ স্বচ্ছন্দে আছে; আর এদিকে মুঘল রাজকর্ম্মচারীরা ইহা বেশ একটা কূটনীতির চাল খেলা হইয়াছে মনে করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

দুঃখের বিষয় যে এই মনোরম কিন্তু সামান্য ব্যবস্থা আওরঙ্গজেবের অসন্তোষ উদ্রেক করে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে, ইহা নিশ্চয়ই শাহজাদা মুয়জ্জম, যশোবন্ত সিংহ ও শিবাজী,

এই তিনজনের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা। তিনি স্বয়ং যে পন্থা অবলম্বন করিয়া সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিলেন উহা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে পড়িত। সেই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া তিনি তাঁহার প্রত্যেক পুত্রের কার্য্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেন। যুবরাজ মুয়জমের পিতৃভক্তি পরীক্ষা করার জন্য তিনি তাঁহাকে এক চিঠিতে আদেশ করেন শিবাজীকে কোন ছলে তাঁহার প্রাসাদে আনিয়া তারপর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দিল্লীতে পাঠাইতে হইবে। বাদশাহী দরবারের অধিবেশন তখন দিল্লীতে হইতেছিল। একবার শিবাজীকে দিল্লীতে আনিতে পারিলে আর তাঁহার পলাইবার উপায় থাকিবে না।

পিতা যেমন তাঁহাকে সামান্যই বিশ্বাস করিতেন মুয়জমও সেইরূপ পিতাকে বিশ্বাস করিতে দ্বিধা করিতেন। বাদশাহের কর্ম্মচারীদের মধ্যে মুয়জমের নিযুক্ত গুপ্তচর ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে সংবাদ দেয় যে এইরূপ একটি চিঠি শীঘ্রই আসিতেছে। শাহজাদা মুয়জম অলস ও অকর্ম্মন্য ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার খানিকটা আত্মসম্মানের জ্ঞান ছিল। তিনি এই প্রকার কোন সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে রাজী হইলেন না। এতদ্ব্যতীত যশোবন্তের সহিত তিনি শিবাজীকে পূর্ব্বে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি এক গুপ্তচরের মারফত দ্রুত সংবাদ পাঠাইয়া শিবাজী যাহাতে এই প্রকারের কোন নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করেন এ বিষয়ে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার প্রাসাদে অবস্থিত মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যদলের অধ্যক্ষকে সরিয়া পড়িতে বলেন। বাদশাহের দূত পৌঁছিবার পর মুয়জম পিতার আদেশ পালন করার বাহ্যিক চেষ্টা প্রদর্শন করেন, যদিও শিবাজী যে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার অভিসন্ধির বিষয় অবগত আছেন একথা শাহজাদা বেশ জানিতেন।

পুনরায় যে শীঘ্রই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে ইহা ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। শাহজাদা মুয়জম এবং যশোবন্তসিংহের সহিত একত্র হইয়া দক্ষিণ-ভারতে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাদশাহ যোগ্য অথচ খামখেয়ালী সেনাপতি দিলির খাঁর অধীনে নূতন সমরবাহিনী প্রেরণ করেন। মুয়জম এবং যশোবন্ত সিংহ উভয়ই এই নিয়োগে ক্ষুব্ধ হইলেন। দিলির খাঁর

শিবিরে সেনাপতিদের মধ্যে মতদ্বৈধ প্রকট হইয়া উঠিল। তিনজন মুঘল সেনাপতি পরস্পর শৃঙ্খলার রীতি নীতি জলাঞ্জলি দিয়া অবান্তর ও অসংলগ্ন বিষয় লইয়া কলহ করিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেবের রাজ্যশাসনে সর্ব্বত্রই পরস্পরের প্রতি কেমন একটা সন্দেহের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই শাহজাদা মুয়জ্জমের মনে ধারণা হয় যে তাঁহার গতিবিধি ও কার্য্যকলাপের উপর নজর রাখিবার জন্যই সম্রাট দিলির খাঁকে দক্ষিণে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া দিলির খাঁর প্রতি তাঁহার মনোভাবের কোন কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। দিলির খাঁর ব্যবহার ছিল অমার্জিত ও বর্ব্বরোচিত। তিনি কথায় কথায় মার্জিতরুচি ও অমায়িক সভাসদ যশোবন্ত সিংহকে অপমানিত করিতে লাগিলেন। তিনজন সেনাপতিই একে অন্যের বিরুদ্ধে বাদশাহের নিকট অভিযোগ করিতে আরম্ভ করেন। এদিকে বাদশাহ তখন পারস্য সম্রাটের সহসা ভারত আক্রমণ প্রতিরোধ ও পেশোয়ারে পাঠানদিগের বিদ্রোহ দমন করিতে বিব্রত। জয়সিংহের দক্ষিণভারতে অভিযানের তুলনায় বর্ত্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। সৈন্য চালনায় সেনাপতিদিগের মধ্যে বিরোধ এবং কেন্দ্রীভূত কোনরূপ পরিকল্পনার অভাবে মারাঠাদিগের সহিত যুদ্ধ লক্ষ্যহীন অবস্থায় চলিতে থাকে। অবস্থার সুযোগ লইয়া মারাঠারাই এই যুদ্ধের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিল।

মারাঠাদিগের উদ্দেশ্য হইল তখনও যে কয়টি দুর্গ মুঘল অধিকারে ছিল উহা পুনরুদ্ধার করা। তাহারা প্রথম পুণার দক্ষিণে অবস্থিত সিংহগড় দুর্গ আক্রমণ করে। মেঘহীন পরিষ্কার দিনে এই দুর্গের প্রকাণ্ড পাথরের প্রাচীর খড়গওয়াষলার (Kharagwasla) হ্রদে সুন্দর প্রতিফলিত দেখা যায়; মেঘলা দিনের আচ্ছন্ন আবহাওয়ায় ইহার চূড়া মেঘে আবৃত হইয়া যায়। তখন মনে হয় যে সমস্ত আকাশ ইহার অন্ধকারাবৃত স্কন্ধের উপর ভর করিয়া আছে। ইহা ছিল একটি প্রাকৃতিক দুর্গ এবং ঠিক মত প্রতিরোধ করিতে পারিলে এই দুর্ভেদ্য দুর্গ বাহির হইতে জয়করা প্রায় অসম্ভব ছিল। পঞ্চাশফুট পরিধিযুক্ত পাহাড়ের শিলার উপর ইহার প্রচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাহির হইতে

মুরুব্বিয়ানার চাল তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। বাহির হইতে প্রবেশের দরজা ছিল মাত্র একটি। ইহার গায়ে অসংখ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার অতি তীক্ষ্ম গজাল এবং উপরে সুবৃহৎ ও অত্যুচ্চ দুর্গের অট্টালিকা।

যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হওয়ার সময় এক সহস্র বাছাইকরা আফগান, আরব এবং রাজপুত প্রভৃতি সম্মিলিত সৈন্যদ্বারা এই দুর্গ রক্ষিত হইতেছিল। ইহাদের অধ্যক্ষ উদয়ভান ছিলেন যেমনই বলিষ্ঠ তেমনই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। আজিও তাহার সম্বন্ধে নানা প্রকার কাহিনী পশ্চিম ভারতের চারণ কবিদের মুখে শোনা যায়। কিম্বদন্তী এই যে শিবাজীও প্রথমে এই সিংহগড় আক্রমণ করিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতা শিবাজীকে এই অসম সাহসিক কাজ করিতে উত্তেজিত করেন ও উদ্দীপনা দেন। একটি মারাঠা গাথা-সঙ্গীতে (১) এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। একদিন প্রাতে প্রতাপগড় প্রাসাদের জানালার ধারে বসিয়া হাতীর দাঁতের চিরুণী দিয়া শিবাজীর মাতা কেশ আঁচরাইতেছিলেন। পূর্ব্বদিকে প্রভাত সূর্য্যের কিরণে পাহাড়ের চূড়া ও সিংহগড়ের প্রাচীর উদ্ভাসিত। এই দৃশ্য দেখিয়া মুহূর্ত্তকাল তিনি আনন্দে অভিভূত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই এই দুর্গ তখনও মুঘলদিগের অধিকৃত একথা মনে পড়ায় তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রোধে মলিন হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ এক ভৃত্যকে রায়গড়ে যাইয়া শিবাজীকে ডাকিয়া আনিতে বলেন। শিবাজী এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অনতিবিলম্বে তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে আরোহন করিয়া মাতৃসকাশে প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতা কেন তাঁহাকে সহসা এত সত্বর আসিতে আদেশ করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি প্রথম এই প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া যান; এবং পরে হঠাৎ শিবাজীকে তাঁহার সহিত একদান পাশা খেলিতে আহ্বান করেন। শিবাজী প্রথম এই আহ্বানে বিস্মিত হন, কিন্তু মাতার মেজাজের সহিত তাল রাখিবার জন্য উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন। তিনি খেলায় হারিয়া যান ও পরে হাসিমুখে বলেন,

(১) 'Ishtun Phakde' নামক গ্রন্থের কিংকেয়াড কৃত অনুবাদ: অ্যাকওয়ার্থ প্রণীত *Ballads of the Marathas* ও দ্রষ্টব্য।

"আপনি ইহার জন্য আমার নিকট হইতে কি খেসারত চাহেন ?

জানালার দিকে লক্ষ্য করিয়া মাতা বলেন, "আমাকে সিংহগড় দাও।"

"কিন্তু ইহা যে এখনও মুঘলদিগের হাতে।"

মাতা স্কন্ধ ঈষৎ বাঁকাইয়া পুনরায় বলেন, "আমি সিংহগড় চাই।"

শিবাজী তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী আর যে কোন দুর্গ দিতে রাজী হইলেন।

"কিন্তু উহাদের কোনটিই আমি চাই না। আমি চাই সিংহগড়।"

অবশেষে শিবাজী সম্মত হইলেন এবং কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। হঠাৎ আক্রমণ করিয়া সিংহগড় দখল করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজ। তিনি মনে করেন যে তাঁহার অধীনে মাত্র একজন সেনাপতি এই অসমসাহসিক কাজের উপযুক্ত। ইনি হইলেন সদা প্রফুল্ল ও সাহসী তানাজী। শিবাজীর সকল অভিযানে তানাজী ছিলেন তাঁহার সঙ্গী। আগ্রাতেও তিনি শিবাজীর সঙ্গে ছিলেন এবং শিবাজীর পলায়নের সময় তানাজী তাঁহার অনুসরন করেন। শিবাজী তানাজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিবাজীর প্রেরিত সংবাদদাতা যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন তখন তানাজী পুত্রের বিবাহের সমারোহে ব্যস্ত। কিন্তু তিনি তৎক্ষনাৎ উৎসবের স্থান পরিত্যাগ করিয়া শিবাজীর সহিত সাক্ষাত করিতে রওনা হইলেন। রাস্তায় একটা শকুনি গাছ হইতে উড়িয়া আসিয়া গোঁ গোঁ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে ধাবিত হইতে লাগিল। ইহা মৃত্যুর পূর্ব্বের অশুভ লক্ষণ। কিন্তু তানাজী মনে মনে হাসিয়া এই সব উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইলেন। সন্ধ্যায় তিনি প্রাসাদে আসিয়া পৌছান এবং শিবাজী তাঁহাকে কি আদেশ করিবেন তাহা জিজ্ঞাসা করেন।

জীজাবাইয়ের দিকে তাকাইয়া শিবাজী বলেন, "মাতার তোমাকে প্রয়োজন, আমার নয়।" জীজাবাই দাঁড়াইয়া উঠিলেন ও পাঁচ সলিতার এক প্রদীপ তানাজীর মাথার চারিদিকে ঘুরাইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। তারপর তিনি বলেন, "তুমি আমাকে সিংহগড় দিতে পারিবে?" তানাজী মাথার পাগড়ি জীজাবাইয়ের পায়ে রাখিয়া বলেন, "মা, এই দুর্গ আপনারই হইবে।" পরদিন প্রাতে তিনি প্রাসাদ হইতে চলিয়া

যান এবং একদল মাভলে যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া সিংহগড়ের দিকে অগ্রসর হন। সৈন্যদিগকে জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিয়া তিনি কৃষকের ছদ্মবেশ ধরিয়া দুর্গের পাদমূলে অবস্থিত গ্রামের অধিবাসীদিগের নিকট হইতে রাস্তাঘাট ও প্রবেশ পথ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানিয়া লইলেন। সেই দিন, ফেব্রুয়ারী মাসের শীতের মেঘবিহীন পরিষ্কার রাত্রিতে তানাজী ও তাঁহার অনুচরেরা চুপি চুপি দুর্গের প্রাচীরের নীচে জড় হইলেন নগ্ন-মসৃন প্রাচীরের গায়ে কোন গর্ত্ত বা পা রাখিবার জায়গা ছিল না। ক্রমশঃ সরু হইয়া উহা আকাশের দিকে তীরের ন্যায় উঠিয়া গিয়াছে।

তানাজীর এক ভৃত্য স্কন্ধে একটি বাক্স বহন করিতেছিল তিনি তাহাকে উহা নিকটে আনিতে বলেন। বাক্সটি ভূতলে রাখা মাত্র একটি প্রকাণ্ড সরীসৃপ বাহির হইয়া আসিল।. ঘরপদ নামক এই প্রকারের বৃহদাকৃতি সরীসৃপ পশ্চিম ভারতের একটা বৈশিষ্ট্য। ইহারা এমন দৃঢ়পদে চলিতে অভ্যস্ত যে মসৃন ও খাড়া পাথরের ওপরেও ইহারা অনায়াসে চলিতে পারে। ইহাদের গায়ে এত শক্তি যে ইহারা একটি মানুষকেও বহন করিতে পারে। মারাঠারা এই প্রাণীর উপরোক্ত ব্যবহার প্রমান করিয়াছে (১)। এই সরীসৃপটি ছিল অতি প্রকাণ্ড ও বলশালী। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল যশোবন্ত।

তানাজী নানা প্রকারে যশোবন্তকে খোশ মেজাজ রাখিতে চেষ্টা করেন। তাহার কপালে সিঁদূর দিয়া চিত্রিত করায় তাহাকে ঠিক মন্দিরের দেবমূর্ত্তির মত মনে হইল। তানাজি তাহার গলায় নিজের মুক্তার মালা পরাইয়া দেন এবং রাজাকে প্রণাম করিবার প্রণালীতে তাহার সম্মুখে নত হন। তারপর তাহার গায়ে একটা দড়ির মই বাঁধিয়া দিয়া উপরে উঠিয়া যাইতে বলেন। ঘরপদ এই আদেশ পালন

---

(১) এইরূপ উদ্‌ভট দুর্গ অবরোধ প্রথা মারাঠারা প্রায়ই অবলম্বন করিত। আজিও মারাঠাদের মধ্যে ঘরপদে নামক বংশগত উপাধি দেখা যায়। ঘরপদে নামক সরীসৃপদিগকে যাহারা উপযোগী শিক্ষা দিয়া এইরূপভাবে ব্যবহার করিত তাহাদিগকে এই উপাধি প্রথম দেওয়া হয়।

করিতে তীব্রবেগে পাথরের গা দিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু অর্দ্ধেক পথ উঠিয়া যশোবন্ত হঠাৎ থামিয়া গেল এবং তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। ইহা অতি অশুভ লক্ষণ। তানাজীর অনুচরেরা তাঁহার চারিদিকে জড় হইয়া তাঁহাকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে নিবৃত্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করে। তাহারা বলে "ঘরপদের ভীতি আপনার নিশ্চিত মৃত্যু নির্দ্দেশ করিতেছে।" কিন্তু তানাজী হাসিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দেন ও বলেন, "আমি কথা দিয়াছি। আর ফিরিয়া যাইতে পারিব না।" তারপর তিনি যশোবন্তের দিকে তাকাইয়া চীৎকার করেন, "হতভাগা সরীসৃপ উপরে ধাওয়া করিতে থাক। ইহার অন্যথা করিলে আমি তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া তরকারির সহিত রন্ধন করিয়া পরিবেশন করিব।"

ভীত যশোবন্ত প্রাচীরের উপরের দিকে দ্রুত উঠিতে লাগিল এবং একটা গর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। পঞ্চাশ ফুট উচ্চ প্রাচীরের গায়ে দড়ির মইটা ঝুলিতে লাগিল। একজন যুবক মাভলে চুপি চুপি উপরে উঠিয়া উহা শক্ত করিয়া বাঁধিল। এক আরব প্রহরী দুর্গের মধ্য হইতে বাহির হইয়া কান পাতিয়া ছিল। মাভলে যুবককে দড়ির মইয়ের উপর বক্র অবস্থায় দেখিয়া সে অগ্রসর হইয়া আসিল। প্রাচীরের পাদদেশে দণ্ডায়মান তানাজী প্রহরীকে দেখিতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে তীর ছুড়িয়া তাহাকে নিহত করেন। তারপর তিনজন বাছাই করা সৈন্য লইয়া তিনি দড়ির মই বাহিয়া উঠিতে লাগিলেন। তাহার মুখ পাগড়ীর কাপড়ে লুক্কায়িত এবং মুখে দন্তপাটিদ্বয় মধ্যে একটি অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি তলোয়ার।

কিন্তু মৃত প্রহরীর পতনে দুর্গ মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। প্রহরীদের কক্ষসমূহে কলরব; মশাল প্রজ্জলিত করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন সৈন্যগণ ফেব্রুয়ারী মাসের শীতের রাত্রিতে পতনোন্মুখ অবস্থায় বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু তানাজী ইতিমধ্যে প্রাচীরের প্রান্তে উঠিয়া গিয়াছেন। কয়েকজন আফগান প্রহরী তাঁহাকে দেখিয়া ফেলে। তাহারা তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া তানাজীর দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেয়। ভূতলে পড়িয়া যাওয়ার সময়ও তানাজী তাঁহার অনুচরদিগকে সাহস দিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন

এবং প্রাচীরের গায়ে গড়াইতে গড়াইতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মারাঠা সৈন্যরা "হর। হর। মহাদেব" বলিয়া চীৎকার করিয়া স্রোতের ন্যায় দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করে। তাহারা মাত্র তিনশত আর দুর্গের সৈন্য সংখ্যা এক হাজার। ইহা সত্বেও মারাঠারা অতর্কিতে দুর্গ দখল করিতে সমর্থ হন। আরব ও আফগান সৈন্যরা মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করে। কিন্তু যুদ্ধের গতি প্রতিকূল দেখিয়া তাহারা প্রাচীর হইতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। রাজপুতদিগের মধ্যে কতিপয় সৈন্য ভীষণভাবে আহত হইয়া আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধের সময় সৈন্যদিগের একটি মশাল নীচে পড়িয়া যাওয়ায় সৈন্যদিগের আবাসের খড়ো চাল জ্বলিয়া উঠে। বিস্তীর্ণ আগুনের লেলিহমান জিহ্বা আকাশের দিকে ধাবিত হয়। মাতার সহিত শিবাজী উৎকণ্ঠিতভাবে প্রাসাদের বাতায়নের মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। সহসা পাহাড়ের মাথায় প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা দেখিয়া তিনি মাতাকে বলেন, "এই দুর্গ এখন তোমার।"

কিন্তু তানাজীর অনুচরেরা এই বিষয়ে মোটেই উল্লসিত হইল না। মৃত নেতার দেহের চারিপাশে তাহারা খানিকক্ষণ অশ্রুনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরেধীরে তানাজীর দেহ সুসজ্জিত পালঙ্কে তুলিয়া পাহাড়ের ধার দিয়া নীচে লইয়া আসিল। এদিকে মারাঠাদিগের দ্বারা চালিত উপরিস্থ কামানগুলি মৃতের সম্মানে গর্জিত হইতে লাগিল। শোক শোভাযাত্রার সহিত তাল রাখিয়া চলিল দুন্দুভি ও মৃদঙ্গের বাদ্য। শিবাজী এই শোভাযাত্রা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রকৃত ঘটনা উপলব্ধি করিলেন ও কাঁদিতে লাগিলেন। (১) তিনি বলেন, "আমি সিংহগড় জয় করিলাম বটে কিন্তু সিংহকে হারাইলাম।" তিনি রাজমিস্ত্রি ডাকাইয়া সিংহগড়ের শীর্ষে তানাজির স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করার আদেশ দেন এবং গ্রামে গ্রামে গেরুয়া পতাকা সহ দূত পাঠাইয়া ও ঢোল পিটাইয়া তানাজীর অসম

(১) 'অল্প কথায় স্পার্টানদের মত মনোভাব জ্ঞাপন করার ক্ষমতার জন্য মারাঠারা শিবাজীকে শ্রদ্ধা করিত। "গড় আলা, সিংহ গেলা', শিবাজীর মারাঠা ভাষায় এই উক্তি আজিও তাহারা সসম্মানে উল্লেখ করে।

সাহস ও অভিনব মৃত্যুর কাহিনী প্রচার করেন। তানাজীর অনুচর এবং আক্রমণকারী সৈন্যদলের প্রত্যেককে তিনি একটি করিয়া রৌপ্য নির্ম্মিত কব্জি বন্ধনী বা ব্রেসলেট এবং নগদ টাকা উপহার দেন।

সিংহগড়ের ঠিক পিছনে দক্ষিণের গিরিপথের দিকে পুরন্দর দুর্গ অবস্থিত। জয়সিংহের আক্রমণের বিরুদ্ধে এই দুর্গ মারাঠারা অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা করে এবং শিবাজীর মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করার পূর্ব্বে এই দুর্গের প্রতিরোধই ছিল তাঁহার শেষ যুদ্ধ। সিংহগড় জয় করার পরে মারাঠারা তানাজীর ভ্রাতা সূর্য্যজীর নেতৃত্বে এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত উহা দখল করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুঘলদিগের অধিকৃত সমস্ত দুর্গ হইতে শিবাজী তাহা-দিগকে বিতাড়িত করেন। শাহজাদা মুয়জম, যশোবন্ত সিংহ ও দিলির খাঁ —এই তিন মুঘল সেনাপতির মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান কলহের ফলে দক্ষিণ ভারতের মুঘল সমর বাহিনী একেবারে অকর্ম্মন্য ও নিশ্চল হইয়া পড়ে। দিলির খাঁর দৃঢ় ধারণা হইল যে শাহজাদা তাঁহাকে বিষপান করাইয়া হত্যা করিবার চেষ্টায় আছেন। তিনি 'অসুখের অজুহাতে' শিবির ত্যাগ করেন এবং মুয়জম সম্রাটের প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন এই অভিযোগ করিয়া বাদশাহের নিকট চিঠি লেখেন। অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য আওরঙ্গজেব তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যাপার এরূপ জটিল আকার ধারন করে যে কে দোষী এবং কে নির্দ্দোষ এ বিষয়ে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় মন্ত্রী একেবারেই মনঃস্থির করিতে পারিলন না এবং সম্রাটের নিকট তিনি যে রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে (মুয়জমের অধীনে একজন ইংরাজ গোলন্দাজ সৈনিক যেমন তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া সুরাট কুঠির প্রধানের নিকট লেখেন) তিনি 'দুই প্রতি পক্ষ দলের সহিতই মিতালি বজায় রাখার চেষ্টা করেন।" বোম্বাইয়ের কুঠিয়ালদিগের কথায় বাদশাহী শিবিরের অবস্থা "এত বিশৃঙ্খল যে এ বিষয়ে কিছুই লিপিবদ্ধ করা চলে না।"

এই অবস্থার সুযোগ লইতে মারাঠারা মোটেই বিলম্ব করিল না।

মার্চ মাসে ইংরাজ কুঠিয়ালেরা তাহাদের বিবরণীতে লেখেন, "শিবাজী এখন আর পূর্ব্বেকার ন্যায় চোরের মত লুকাইয়া চলাফেরা করেন না। বরং প্রকাশ্যে তিনি ৩০.০০০ হাজার সৈন্যসহ চারিদিকে গর্ব করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। শিবাজী যদিও শাহজাদা মুয়জমের ঘাঁটির অতি নিকটে তবুও কেহই তাঁহাকে বাধা দিতেছে না।

বৃথাই বাদশাহ মুঘল সেনাপতিগনের প্রতি দোষারোপ করেন ও মুয়জমকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেন। বৃথাই তিনি নূতন সৈন্য সামন্ত লইয়া তাঁহার গুজরাটের সুবাদারকে দক্ষিণে অগ্রসর হইতে আদেশ দেন। বন্যার জলের মত প্রখর বেগে শিবাজীর সৈন্যরা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশ সমূহে ছড়াইয়া পড়ে। বহু শহর এবং গ্রাম নামে মাত্র মুঘল-দিগের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়া মারাঠাদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিবাজীকে চৌথ নামক কর দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহার প্রদত্ত সর্ত্ত সমূহ মানিয়া লয়। উৎপাদিত শস্যমূল্যের এক চতুর্থাংশ কর এই চৌথরূপে মারাঠাদিগকে বার্ষিক দিতে হইত। ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বাইজ্যানটাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাসে। ব্রুসা (Brussa) এবং নিকিয়া (Nicia) প্রদেশদ্বয়ের পূর্ব্বদিকের সমস্ত অঞ্চলগুলি তুরস্কদিগের আক্রমণ হইতে রেহাই পাইবার জন্য তাহাদিগকে কর দিতে আরম্ভ করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সীমান্তরেখা স্থির না হওয়া সত্ত্বেও এই সব অঞ্চল তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া যায়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সেপটেম্বর মাসে শিবাজী দ্বিতীয়বার সুরাট আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবারে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় কেবলমাত্র অশ্বারোহী সৈন্যদের দ্রুতগতির উপর নির্ভর করেন নাই, কিংবা গোপনেও আক্রমণ করেন নাই। পনের হাজার সৈন্য লইয়া তিনি এবারে সুচিন্তিত কল্পনা অনুযায়ী প্রকাশ্যে সুরাট শহর আক্রমণ করেন। মারাঠাদিগের আগমনের সংবাদ পাইয়া ভারতীয় বণিকেরা আতঙ্কে শহর হইতে পলাইতে লাগিল। ইংরাজেরা তাহাদের গুদাম ঘর হইতে জিনিষ পত্র সরাইয়া

লইয়া উহা উপকূলবর্ত্তী সোয়ালী বন্দরে পাঠাইয়া দেয়। বাদশাহের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ অনুসারে এই শহর রক্ষা করিবার জন্য অনেক নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু ৩রা অক্টোবর শিবাজী শহর আক্রমণ করিলে দুর্গস্থ মুঘল সমর বাহিনীর নগন্য প্রতিরোধে কিছু রক্ষা করা সম্ভব হইল না। দুর্গের নবনির্ম্মিত প্রাচীর হইতে মুঘল রক্ষীদলকে অতি সহজেই অপসৃত করিয়া মারাঠা সৈন্যরা তীব্রবেগে নগরের মধ্যে প্রবেশ করে। দ্বিতীয়বার'ও শহরের মুঘল শাসক দুর্গের মধ্যে চুপি চুপি পলায়ন করিয়া স্বীয় অযোগ্যতা প্রমান করেন; আর মারাঠারা এদিকে শহর লুঠ করিতে লাগিল।

মারাঠারা প্রথম শহরের তাতার সরাই নামক অঞ্চল লুঠ করিতে আরম্ভ করে। তুর্কী, ইরানী ও তাতার প্রভৃতি প্রাচ্যদেশীয় বণিকদের সুরাটে নিজ নিজ সরাই ছিল। বর্ত্তমান কালেও শ্রীনগর শহরে অবস্থিত তাতার সরাই যেভাবে চালিত হয় উহা হইতে অর্দ্ধেক দোকানঘর এবং অর্দ্ধেক হোটেলযুক্ত এই সব বৃহৎ সরাইখানাগুলিতে কিরূপ আমোদ প্রমোদে দিন কাটিত তাহার আভাস পাওয়া যায়। এখানে তুর্কীস্থান হইতে অনেক সওদাগরের যাতায়াত ছিল। মস্তকে পশমের গোল টুপী পরিহিত ও মোটা কাপড়ে কর্ণদ্বয় আবৃত শীর্ণ দেহ এই বণিকেরা নীল রঙের কার্পেট ওআকাটা নীলকান্ত মণি প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যের ব্যবসা করিতে এই শহরে আসে। নড়নড়ে সিড়ির উপর জড়সড় হইয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন কতকগুলি তোতাপাখীর মত তাহারা বাঁকান স্তম্ভ শ্রেণীর ভিতর দিয়া খরস্রোতা ঝিলাম নদীর জলের দিকে তাকাইয়া থাকে, আর জানালার ধারে বসিয়া কিচির মিচির করিয়া কথা বলে। বঁড়শির মত নাক ও শমশ্রুযুক্ত এবং কাপড়ের পাগড়ি ও সাদা লম্বা হাতার কোট পরিহিত কাশ্মীরি সওদাগরেরা চাঁদোয়া শোভিত শিকারা নৌকা বাহিয়া তাহাদের নিকট আসিয়া তাতারদিগের সঙ্গে জিনিষপত্রের মূল্য লইয়া দরকষাকষি করে।

১৬৭০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ঐ রাত্রিতে সুরাটের তাতার সরাইতে জনৈক অতিশয় বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত ছিলেন। তিনি হইলেন কাশগড়ের রাজা এবং বিবাহসূত্রে সম্রাট আওরঙ্গজেবের কুটুম্ব। স্বীয় পুত্রদ্বারা সিংহাসনচ্যুত হইয়া তিনি তাঁহার প্রায় সমুদয় ধন সম্পত্তি লইয়া

তুর্কীস্থানে প্রস্থান করেন। নির্ব্বাসন কাল অতিবাহিত করিতে তিনি মক্কার যান এবং সেখানে হইতে ফিরিবার পথে "প্রচুর ধন দৌলত সোনা, রূপা, বহুমূল্য থালা বাসন, স্বর্ণ নির্ম্মিত পালঙ্ক এবং অন্যান্য দামী আসবাব পত্র সহ" তিনি সুরাটের সরাইতে অবস্থান করিতেছিলেন। (১)

তাতার সরাই আক্রমণ করিবার পথে সুরাটে ফরাসীদিগের উপনিবেশের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। ফরাসী বণিকেরা প্রস্তাব করে যে তাহাদিগের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশ্বাস দিলে তাহারা মারাঠাদিগকে ফরাসীদিগের আবাসস্থানের মধ্য দিয়া যাইতে দিতে পারে। মারাঠাগণ আগ্রহের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হয়। সুরাটের ইংলিস কৌন্সিল ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া এই ঘটনা সম্বন্ধে লেখেন, "তাহাদের যথেষ্ট লোকবল থাকা সত্ত্বেও ফরাসীরা কামানের একটি গোলাও ছোড়ে নাই। কিন্তু পূর্ব্বে তাহারা এতই বড়াই করে যেন তাহারা একাই মারাঠা বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবে।" অতঃপর মারাঠারা তাতার সরাই আক্রমণ করে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাতারগণ সফলভাবে প্রতিরোধ করে। পরে অন্ধকারের সুযোগ লইয়া কাশগড়ের রাজা তাঁহার পরিবার ও লোকজন সহ দুর্গের ভিতর আশ্রয় লইলেন। তাঁহার ধনরত্ন ও 'সোনার পালঙ্ক' পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

ইংরাজদিগের জিনিষপত্র সুরাটের বাহিরে নিরাপদে লইয়া যাওয়া সত্ত্বেও সওয়ালী দ্বীপে স্থানান্তরিত ইংরাজ কৌন্সিল তাহাদিগের সুরাটের সব বাড়ী রক্ষা করিতে মনস্থ করেন। তাঁহাদের সভার কার্য্য বিবরণীতে তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে লুণ্ঠনকারীদের হাত হইতে কুঠি রক্ষা করা তাঁহারা উচিত মনে করেন কারণ "ইহাতে আমাদের আত্মসম্মান ও জাতির সম্মান রক্ষিত হইবে (ইহা আমরা এ পর্য্যন্ত সুনামের সহিত রক্ষা করিয়া আসিয়াছি) ও বিপদের সময় শহর হইতে পলাইয়া যাওয়ায় কলঙ্ক ও অপবাদ হইতে আমরা রক্ষা পাইব।" সুতরাং মিঃ স্ট্রেনসাম মাষ্টারের অধিনায়কত্বে তাহারা ত্রিশ জন নাবিককে এই রক্ষণ কার্য্যে প্রেরণ করেন। ষ্ট্রেনশাম "প্রফুল্লচিত্তে কার্য্যভার গ্রহণ

---

(১) Hedges' Diary

করেন,' এবং বলেন যে তিনি যে কোন রূপ অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত। ইহার পর তিনি সুরাটের দিকে অগ্রসর হন।

এই সুন্দর চরিত্র ইংরাজ নায়কের প্রতি তাঁহার স্বদেশীয়দের এবং ভারতীয়গণের উভয়েরই অতি উচ্চধারণা ছিল। ইংলণ্ডের ডীন (Deane) শহর হইতে মিসেস্ অমিণ্ডেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে নিযুক্ত কর্ম্মচারী তাঁহার দেবরের নিকট 'সার্টের হাতা এবং রাত্রিতে ঘুমাইবার সময় ব্যবহৃত টুপীর জন্য নবতম ফ্যাসানের লেসযক্ত ফিতা" পাঠান উপলক্ষ্যে এক চিঠিতে লেখেন, "আমার বিশ্বাস স্ট্রেনসামের সহিত মাঝে মাঝে সাক্ষাত হওয়ায় ও তাঁহার সাহচর্য্যে তুমি খুবই আনন্দ পাইতেছ ·· তিনি এত জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি।"

বাস্তবিক ভারতীয়গণের এবং বিশেষ করিয়া ভারতের গ্রামবাসীদের প্রতি স্ট্রেনসামের ছিল গভীর সহানভূতি। তিনি লিখিয়াছিলেন, "উহারা কত নম্র, কত ভদ্র; কিরূপ দয়ালু!" তাহার কৌতুকরসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার লিখিত চিঠি হইতেও। "অন্নদাস খৃষ্টান, অর্থাৎ যাহারা কেবলমাত্র ভরণপোশণের লোভে খৃষ্টান ধর্ম্মে নামে মাত্র দীক্ষিত হয়; "অথবা (বোম্বাইয়ে প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতার প্রতি সাধারণ লোকের ধারনার উল্লেখে) একজন ইংরাজ সৈন্য কেমন করিয়া নিজেই ধর্ম্মযাজক সাজিয়া ঈশ্বরের বিভূতি প্রাপ্তির ভান করিয়া খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকে, অথচ সহকারী গভর্ণর তাহার এই স্বেচ্ছা-চারিতা অপছন্দ করিয়া তাহাকে ধরিয়া কারাগারে পুরিয়া রাখেন এবং সেখানে কিছুকাল থাকিবার পর তাহার সাধারণ বিবেচনা বোধ ফিরিয়া আসে"—ষ্ট্রেনসামের চিঠির এই সব অংশ বেশ কৌতুহলপ্রদ।

যেদিন ষ্ট্রেনসাম মাষ্টার নাবিক সঙ্গীদিগের সহ ইংরাজকুঠি পুনরায় অধিকার করেন তাহার পরদিন একদল মারাঠা ঐ কুঠি আক্রমণ করে, "কিন্তু আমাদের কুঠি হইতে তাহাদিগের প্রতি এমনভাবে অস্ত্রাঘাত করা হয় যে অনেক লোক বিনাশ হওয়ার পরে তাহারা চলিয়া যায়।" পরের দিন আবার তাহাদের পুনরায় আবির্ভাব হয়। তাহাদের সৈন্যাধ্যক্ষ "মিঃ মাষ্টারের উদ্দেশে প্রাচীরের অপর দিক হইতে চীৎকার করেন .... তিনি মিঃ মাষ্টারকে বলেন যে আমরা এত মারাঠা সৈন্য বিনষ্ট করায়

রাজা অর্থাৎ শিবাজী অতিশয় কুপিত হইয়াছেন এবং তিনি ইহার প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প।" এই সংবাদ সে অবশ্য নিজের দায়িত্বে দিয়াছিল। কারণ পরে প্রমানিত হয় যে ইংরাজদিগের সহিত বিবাদে রত হওয়ায় শিবাজীর কোন গভীর মতলব ছিলনা। ইংরাজদিগকে তিনি চিরদিনই পছন্দ করিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তিনি ঐ সংবাদ নিজের দায়িত্বেই দেন বা রাজার আদেশেই দেন, এই চরম ঘোষণায় ষ্ট্রেনসাম বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি উত্তরে বলিলেন, "মারাঠারা যদি বল প্রয়োগ করে তবে ইংরাজেরাও শেষ-পর্য্যন্ত তাহাদের মূল্যবান জীবনপণ করিয়া কুঠি রক্ষা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

দুইদিন যুদ্ধ বন্ধ রহিল। অক্টোবর মাসে সুরাটের দর্দ্দান্ত গরমের মধ্যে সুকেশযুক্ত ইংরাজ নাবিক যুবকেরা রক্তবর্ণমুখে প্রাচীরের ধারে প্রতীক্ষা করিত লাগিল। পঞ্চমদিনে মারাঠা সৈন্যদিগের তৃতীয় দল ইংরাজ কুঠির প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইয়া "ভয় দেখাইয়া চীৎকার করিতে থাকে, কিন্তু মিঃ মাষ্টার এমন অটলতা প্রদর্শন করেন" যে মারাঠারা পশ্চাদপসরণ করে।

এই বারে শিবাজীর সর্ব্ব প্রথম ইংরাজদিগের কুঠির সম্পর্কে কৌতুহল প্রকাশ পায়। তিনি ঐ অঞ্চল হইতে সৈন্যাদি অপসরণ করাইয়া একজন দূতের মারফত এরূপ সঙ্গত প্রস্তব প্রেরণ করেন যে মিঃ মাষ্টার তাঁহার জন্য একটি "লাল রঙের পোশাক, তরবারি, ছুরি, ইত্যাদি" দ্রব্য ভেটস্বরূপ পাঠাইলেন। ইহার পর শিবাজী দুইজন ইংরাজকে তাঁহার শিবিরে আসিতে আমন্ত্রণ করেন। তাহারা ওখানে উপস্থিত হইলে শিবাজী অসাধারণ আন্তরিকতা প্রকাশ করিয়া তাহাদের সহিত অতিশয় মনোরম ব্যবহার করেন। "তিনি তাহাদিগকে পুরস্কারে আপ্যায়িত করিয়া অতিশয় ভদ্রভাবে তাহাদের সম্বর্ধনা করেন এবং বলেন যে তিনি ইংরাজদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ। তাহাদের হাতে হাত রাখিয়া (১) তিনি ইংরাজদিগের কোনই অনিষ্ট করিবনে না—এই আশ্বাস দেন।

(১) কোন হিন্দুর পক্ষে এরূপ ব্যবহার গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধার নিদর্শন। কারণ হিন্দুদিগের মধ্যে করমর্দ্দন করার রীতি নাই।

ইহার পরে ইংরাজকুঠির আর কোন অনিষ্ট হয় নাই। কেবল মাত্র একজন ইংরাজ নাবিক ইংরাজ এবং মারাঠাদের মধ্যে বন্দুকের গুলি বিনিময়ে নিহত হয়। সে কোম্পানীর কর্ম্মচারী ছিল না। বান্টামের রাজার 'ব্লেসিং' (Blessing) নামক জাহাজে সে কাজ করিত। খুব সম্ভব এই নাবিক নিজের জাহাজ হইতে পামিয়া আসিয়া ইংরাজ কুঠির স্বজাতীয় দিগের সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। জাভা দ্বিপের অন্তর্গত বান্টান অঞ্চল হইতে সুরাটে যে সব জাহাজ আসিত তাহাদের নাবিক অধিকাংশই ছিল ইংরাজ।

অতিশয় দক্ষতার সহিত জাহাজ চালাইতে পারিত বলিয়াই ইহারা ঐদেশে বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে। পরন্তু 'শহরের নীম্নতম শ্রেনীর লোকের উপরেও ইহারা কখনও কোন উপদ্রব করে নাই এবং উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা ইহাদিগের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা বলিত যে ফ্লেমিং (Fleming) বা অন্যান্য জাতীয় নাবিকদিগের নিকট হইতে ঐরূপ ব্যবহার পাওয়া যাইত না। (১) সুরাটের কুঠির ব্যবসা বান্টাম হইতে আগত মসলা দ্রব্যাদির উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিত। সেখান হইতে আনীত দ্রব্যের মধ্যে অতি সুগন্ধি দারুচিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরও আসিত সোনালী রঙের গন্ধগোকুলা, টাটকা পীতাভ কস্তুরী এবং সুগন্ধ নির্য্যাস বিশিষ্ট অনেক রকমের ঔষধি। উহাদের কোন কোনটির আস্বাদ এতই ঝাঁজাল যে মুখে দেওয়া মাত্র মাথার তালু পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিত। (২)

৫ই তারিখ সন্ধ্যায় মারাঠাগণ শহর হইতে অপসরণ করে ও ধীরে ধীরে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়। ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যে বাদশাহের প্রতিনিধি মুঘল সেনাপতি দাউদ খাঁকে ত্বরিত গতিতে মারাঠাদিগকে প্রতিরোধ করিতে পাঠান। দাউদ খাঁ শিবাজীর সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাত হইতে আক্রমণ করিবার জন্য একদল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইলেন, আর নিজে মুঘল সেনাবাহিনীর প্রধান পদাতিক সৈন্যদলকে লইয়া দক্ষিণে নাসীক

(১) Scot's *Discourse of Java*

(২) John Saris *Relation*

গিরিপথ অবরোধ অরেন। সহসা শিবাজী প্রত্যাগমন করিয়া মুঘল অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে আক্রমণ করেন ও তাহাদিগকে একেবারে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। তারপর সৈহাদ্রী পাহাড় অতিক্রম করিয়া দাউদ খাঁর সৈন্যবাহিনীর উপরে পশ্চাৎ হইতে ঝাপাইয়া পড়িয়া উহা-দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন।

ইতিমধ্যে সুরাটের অবস্থা ভয়ঙ্কর রকমের বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। মারাঠাদের প্রত্যাগমনের পরে মুঘল শাসকবর্গ সাহসে ভর করিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইয়া কোনরূপ নিয়ম বা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে অসমর্থ হইলেন। এদিকে দলে দলে গ্রামবাসীরা লুঠতরাজ করিতে আসিতে লাগিল। মিঃ মাষ্টারের ধারনা হইল যে ইংরাজদিগের কুঠি রক্ষা করার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত আশ্রয়পার্থী দলের সহিত সমুচিত আচরণ করা অপেক্ষা মারাঠা লুণ্ঠনকারীদের সহিত ব্যবহার অনেক সহজসাধ্য। "অনেক সুপ্রসিদ্ধ বণিক, হাবসী, আর্মেনিয়ান, কাটাবিস্ বাণিয়া, আমাদের (ইংরাজদের) আশ্রয় পাইবার জন্য এখানে পলাইয়া আসে।" এমন কি শহরের মুসলমান অধিবাসীরাও মুঘল শাসক-গনের দুর্ব্বলতায় খুব বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া সকলের সহিত ইংরাজদের বীরত্বের প্রশংসায় যোগ দেয়। সুরাটের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি পন্ন ব্যবসায়ী হাজী সৈয়দ বেগের বাটী প্রথমবার মারাঠা কর্ত্তৃক সুরাট লুণ্ঠনের সময় ইংরাজেরা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র এইবার "শপথ লইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি সপরিবারে বোম্বাই চলিয়া যাইবেন," কারণ সেখানে তিনি ইংরাজ শাসন কর্ত্তৃপক্ষের আশ্রয়ের অধীনে থাকিতে পারিবেন। আরও অনেক ব্যবসায়ীরা তাহার এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। দ্বিতীয়বার মারাঠা দিগের দ্বারা লুণ্ঠনের পর সুরাট আর তাহার পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পায় নাই; কিন্তু ইহার ফলে বোম্বাই শহরের সমৃদ্ধি খুব বৃদ্ধি পায়।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা উচিত যে ঐ শতাব্দীর ইংরাজদিগের শুধু সাহসের জন্যই যে লোকে তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিত এমন নহে, তাহাদের সৌজন্যও প্রশংসনীয় ছিল। সুরাটের ইংরাজ কৌন্সিল 'কুঠির সম্মুখে কাগজের এক ইস্তাহার ঝুলাইয়া দেন এবং উহাতে ঘোষণা করেন

যে কোন ইংরাজ দেশীয় লোকদিগের সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিলে তাহাকে সদর দরজার সম্মুখে সমস্তদিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে।

মারাঠাদের দ্বারা প্রথমবার সুরাট লুণ্ঠনের সময় দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষ যদিও ইংরাজদিগের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবারে কিন্তু ইংরাজেরা দিল্লী হইতে কোনরূপ সম্মানসূচক স্বীকৃতিপত্র পাইলেন না। ইহার কারণ এই যে ইংরাজদিগের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত মুঘলদিগের অযোগ্যতার প্রকাশ্যে তুলনামূলক সমালোচনা হওয়ায় দিল্লীর দরবারে খুবই বিরক্তি ও অসন্তোষর সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইংরাজেরা শিবাজীর চররূপে মারাঠাদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের কুঠিতে মারাঠাদের আক্রমণ পূর্ব্ব হইতে সুকল্পিত একটা অভিনয় মাত্র ----এইরূপ গুজব রটাইয়া মুঘল সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। কিন্তু এই প্রকারের নির্ব্বোধ ও হাস্যকর ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তিতে কেহই প্রতারিত হয় নাই।

যাহা হউক মুঘল সাম্রাজ্যের এত বহুল সংখ্যক প্রজাদিগকে রক্ষা ও আশ্রয়দান করা সত্ত্বেও মিঃ মাষ্টার বাদশাহের নিকট হইতে কোন প্রশংসাবাণী পাইলেননা। বটে কিন্তু তিনি ইংরাজ কৌন্সী লের নিকট হইতে একটি পদক পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন। তাহাতে লেখা ছিল, "শিবাজীর সহিত যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শনের নিদর্শন।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঐ বৎসর সারা শীতকাল এবং পর বৎসর বসন্তকাল ব্যাপিয়া শিবাজী সাফল্য অর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দ্রুত গতিবিধিতে ইংরাজেরা একেবারে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। বোম্বাইয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই সময় লেখেন, "কি যে তাঁহার লক্ষ্য তাহা আমরা বলিতে বা ধারনা করিতে পারি না। তিনি সর্ব্বদাই কোন না কোন অসম সাহসের কাজে নিযুক্ত আছেন।"

এমনকি পর্ত্তুগীজেরা পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকৃত স্থান সমূহের নিরাপত্তা সম্বন্ধে ভীত হইয়া পড়িল। শিবাজীর রাজ্যের সীমান্ত পর্ত্তুগীজদিগের ভারতে অধিকৃত দেশ সমূহের সংলগ্ন ছিল। তিনি মাঝে মাঝে তাঁহার

সীমান্তবর্ত্তী দুর্গগুলির "সৈন্য সামন্ত বদলি করিতে এবং নূতন মালপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিতে উহা পরিদর্শনে আসিতেন।" হঠাৎ তিনি গোয়ার দক্ষিণ দিকে চলিয়া যান, এবং ইংরাজদিগের বিবরণী অনুসারে "খুব উচচ এক পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ নির্ম্মান করেন। ওখান হইতে ঐ অঞ্চলে তিনি অনেক উপদ্রব করিতে পারিতেন।"

ফরাসী চিকিৎসক ডাঃ ডেলন (Dellon) গোয়ায় অবস্থান কালে লেখেন, "শিবাজী একজন অতিশয় পরাক্রান্ত রাজা। চতুর্দ্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি এমন বিচিক্ষণতার সহিত তাঁহার কার্য্য-প্রণালী পরিচালনা করিয়াছেন যে তাঁহার শাসন এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। এই সব অঞ্চলে তিনি প্রতিবেশীদের মধ্যে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাঁহার আগমনের সংবাদে গোয়া শহর ভয়ে কম্পিত। তাঁহার প্রজারা তাঁহারই ন্যায় পৌত্তলিক। কিন্তু তিনি সকল ধর্ম্মকেই সমভাবে প্রশ্রয় দেন।"(১)

তৃতীয়বার সুরাট আক্রমণ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়া শিবাজী মুঘলদিগকে তাঁহাদের মধ্যভারতস্থিত সৈন্যদল সুরাট রক্ষার জন্য পশ্চিমাঞ্চলে স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু এবাবে সুরাট আক্রমণের ভীতি প্রদর্শনের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুঘল সমরবাহিনী উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে সরাইয়া আনা। ক্লান্ত মুঘল সৈন্যদল যেই পশ্চিম-দিকে আসিতে আরম্ভ করিল, অমনি শিবাজী সহসা তীব্রগতিতে মধ্য-ভারতে সৈন্যচালনা করিয়া খান্দেশ বিধ্বস্ত করেন।

বাদশাহ দিল্লী হইতে ঝানু সেনাপতি মহাব্বত খাঁকে চল্লিশহাজার সৈন্যসহ শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মহাব্বত খাঁ শাহাজাহানের রাজত্বকালে প্রধান সেনাপতিরূপে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে সৈন্যরা প্রথমতঃ মারাঠাদিগকে হঠাইয়া দেয়। কিন্তু

(১) ডাঃ ডেলন অবশ্য ধর্ম্মাচরণে স্বাধীনতা সম্বন্ধে খুব কৌতুহলী ছিলেন। ইহার অন্যতম কারণ যে তাঁহাকে গোয়ার ধর্ম্মবিষয়ক বিচার সভার সম্মুখীন হইতে হয়।

মুঘলেরা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। বৃদ্ধ সেনাপতি কেবল তাঁহার অনুচর ও বন্ধু বান্ধব লইয়াই আসেন নাই; তাঁহার সঙ্গে ছিল বাছাই করা চারিশত আফগানী নর্ত্তকী। পরে আরও সৈন্য তাঁহার নিকট পাঠান হইল বটে; কিন্তু ইহাতে অগ্রগতি আরও মন্থর হইয়া আসিল। কয়েক মাস পরে মহাব্বত খাঁর অভিযান সম্পর্কে ইংরাজেরা তাহাদের বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করেন যে "তিনি মাত্র চারিটি দুর্গ অধিকার করিয়াছেন; আর এদিকে শিবাজী সাহসের সহিত শত্রুর সঙ্গে লড়িয়া যাইতেছেন……এবং তাঁহার ধাবমান সৈন্যরা সর্ব্বদা মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করিতেছে।" ১৬৭২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সালহার শহরের বাহিরে দীর্ঘকাল ব্যাপী এক বিশৃঙ্খল যুদ্ধে মুঘলদিগকে প্রথমতঃ বাধা দেওয়া হয় এবং পরে মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যরা এক যুদ্ধে অভূতপূর্ব্ব দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া মুঘল সমরবাহিনী একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। এই যুদ্ধে বিশ হাজার মুঘল সৈন্য নিহত হয়, নতুবা আত্ম-সমর্পন করে। আহত সৈন্যদিগের প্রতি শিবাজী তাঁহার বীরচরিতোপম চিরাভ্যস্ত সদয় ব্যবহার করেন। তিনি নিজে আহত সৈন্যদিগের শুশ্রূষা করেন এবং তাহারা সুস্থ হইয়া উঠিলে তিনি তাহাদিগকে এবং অন্যান্য বন্দীগনকে উপযক্ত অর্থ ও পুরস্কারাদী সহ নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করেন। মারাঠারা এই যুদ্ধে বহুলোক গ্রেপ্তার করে ও শত্রুপক্ষের ছয় হাজার অশ্ব, যুদ্ধে ব্যবহৃত একশত পঁচিশটি হস্তী এবং যাবতীয় ধনরত্ন অধিকার করে। সুরাটের ইংরাজ কুঠির সভ্যরা লেখেন, "যে সব সেনাপতি তাঁহার স্বদেশে সৈন্য লইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি (অর্থাৎ শিবাজী) তাহাদের প্রায় সকলকেই কাপুরুষের মত পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া-ছিলেন।"

পূর্ব্বের ন্যায় এখনও আওরঙ্গজেব শিবাজীকে পার্ব্বত্যমূষিক" (১) বলিয়া অভিহিত করিতন। যুদ্ধে শিবাজীর পুনঃ পুনঃ সফলতায় বাদশাহ বাহাদুর খাঁ নামক এক সেনাপতিকে তাঁহার দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধি

(১) ওর্ম্ম

করিয়া শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। মারাঠাদের সঙ্গে কখন যুদ্ধ করা উচিত কি অনুচিত উহা এতদিন মুঘলেরা স্থির করিতেন। কিন্তু এখন উহা মারাঠাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে লাগিল। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও মারাঠাদিগকে কোনওরূপে প্রকাশ্যযুদ্ধে প্রলোভিত করিয়া এবং সুকল্পিত কৌশলে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া উহাদিগকে পরাস্ত করাই ছিল মুঘলদিগের লক্ষ্য। কিন্তু এখন মুঘলেরাই যুদ্ধে পরাঙমুখ হইতে লাগিলেন।

বাদশাহের নূতন প্রতিনিধি প্রথমে কয়েকটি কৌশলী অভিযানের চেষ্টা করেন। কিন্তু উহা এতই সামান্য ধরনের যে ক্যাপটেন গ্যারী (Gary) (১) ঐ সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যভাবে মন্তব্য করেন যে "উহা যেন শিবাজীর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হয়, যদিও উহাতে শিবাজীর কোনই ক্ষতি হইল না।" তারপর তিনি মারাঠাদিগের আক্রমণ হইতে মুঘল এলাকা রক্ষা করার জন্য সারিসারি দুর্গ ও গৃহাদি নির্ম্মান করিতে আরম্ভ করেন। মুঘল সেনাপতিদিগের মধ্যে অনেকেই শিবাজীর সহিত সামাজিক আদান প্রদান করিতে লাগিলেন, কেহ বা মুঘল সমর বাহিনী প্রকাশ্যে ছাড়িয়া গেলেন, আবার কেহ কেহ প্রতিদিনই মারাঠাদিগের দ্বারা তাড়িত হইবেন ভাবিয়া বিলাসীতাপূর্ণ পানাহারে উন্মত্তভাবে মত্ত রহিলেন।

বাহাদুর খাঁ যখন দাক্ষিণাত্যে বাদশাহের প্রতিনিধি ছিলেন সেই সময় ডাঃ জন ফ্রায়ার মুঘলদিগের কয়েকটি দুর্গ পরিদর্শন করেন। মুঘল সৈন্যদিগের যে কতদূর নৈতিক অবনতি হইয়াছিল ইহাব তিনি একটা সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়াছেন। তিনি সৈন্যদিগকে নিতান্ত উদাসীন এবং কাপুরুষের ন্যায় চলাফেরা করিতে দেখিতে পান। "যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দৌড়াইতে পারে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ সৈনিক মনে করা হইত।

(১) ইনি গ্রীক দেশবাসী এবং পর্ত্তুগীজ সরকারের অধীনে চাকুরি করিতেন। মিঃ ওর্ম্ম ইহার সম্বন্ধে বলেন যে "ইনি হইলেন একজন ব্যস্ত সমস্ত দাম্ভিক ব্যক্তি। ইনি বাক চাতুর্য্যে ও ষড়যন্ত্র করিতে বিশেষ পটু ছিলেন।"

তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র এত উজ্জ্বল ও চকচকে রাখা হইত যে উহাতে কোনরূপ দাগ পড়িবে এই ভয়ে তাহারা উহাতে হাত দিত না। তাহাদের সেনাপতিরা কেবল রাজসভার প্রভাবের জোরে বীরের আখ্যায় ভূষিত হইতেন। যুদ্ধক্ষেত্র অপেক্ষা তাহারা কোমল শয্যা অনেক বেশী পছন্দ করিতেন।" সৈন্যদিগের প্রায় চৌদ্দ মাসের বেতন বাকী ছিল এবং তাহারা সৈন্যাধ্যক্ষের প্রাসাদের চারিপাশে জড় হইয়া তাঁহাকে সেলাম প্রদর্শন করিয়া তাহাদের বাকী মাহিনার কথা স্মরণ করাইয়া দিত।" তাহারা যে এই অবিশ্রান্ত এবং বিফল যুদ্ধ সম্পর্কে একেবারেই কোন উৎসাহ দেখাইত না ইহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই। "শিবাজী একটু বীরত্ব প্রদর্শন করিলেই, মুঘলেরা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিত।"

শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় সুনিশ্চিত মনে করিয়া সেনাপতিরা হাল ছাড়িয়া দিয়া প্রাসাদে আরামে দিন কাটাইত, এবং দিল্লী হইতে নির্ব্বাসিত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা বিলাসিতার মধ্যে দিন কাটাইতেছে এই ভাবিয়া মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করিত। এইরূপ একজন সেনাপতি ডাঃ ফ্রায়ারকে তাঁহার "বৃক্ষগুল্ম পরিবেশিত তৃণশ্যামল অঙ্গনে অভ্যর্থনা করেন। মুঘল সেনাপতি কারুকার্য্যময় বহু তাকিয়ার উপরে হেলান দিয়া উচ্চ আসনে বসিয়া গড়গড়া টানিতেছিলেন; তাঁহার সম্মুখে ছিল একটি তরোয়াল ও একটি ঢাল। ঢালের মধ্যখানে ধাতব দ্রব্যের উচ্চ স্তবকের পরিবর্ত্তে একটি অর্দ্ধচন্দ্র অঙ্কিত ছিল। বালকভৃত্য অনেকটা তুর্কীদিগের অনুকরণে তীর ধনুক লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিত। .... ঘরের সমস্ত মেজের উপর ছিল মশ্লিনে আবৃত কোমল শয্যা, বসিবার বেদীটি পুরু রূপার চাদরে নির্ম্মিত।"

এত বিলাস সামগ্রী দেখিয়াও বিদেশী পরিদর্শকের মনে গৃহস্বামীর ধনদৌলত ও সম্ভ্রম সম্বন্ধে যাহাতে কোন দ্বিধা না থাকে সেইজন্য দুইজন গায়ক আসিয়া তাহার গুণগান করিতে লাগিল। গানের বিষয় বস্তু হইল যে এই গৃহস্বামী যাবতীয় সদ্‌গুন ও সৌন্দর্য্যের আধার। এই সব দেখিয়াও ডাঃ ফ্রায়ারের খুব ভাল ধারণা হইল না। গায়কদ্বয়কে তিনি স্তাবক ও প্রতারক বলিয়া আখ্যা দেন। তোষামোদ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ দার্শনিক সেনেকার (Seneca) উক্তি তাঁহার মনে পড়ে।

কিয়ৎকালের মধ্যেই ডাঃ ফ্রায়ারকে অন্দর মহল ঘুরাইয়া দেখান হয়। এখানে ছিল গৃহস্বামীর চারিজন পত্নী ও তিনশত উপপত্নী। বিদেশী লোকের উপস্থিতিতে মহিলারা লজ্জায় অভিভূত হওয়ার ভান করেন এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পাখীর মত ছুটাছুটি করিতে থাকেন। তবে তাঁহারা যে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া আগন্তুককে দেখিতে ছিলেন ইহা ডাঃ ফ্রায়ারের দৃষ্টি এড়াইল না। অতিথি একজন চিকিৎসক ইহা জানিতে পারিয়া মুঘল সেনাপতি তাঁহার "মোটা সোটা লাল টুকটুকে" এক পত্নীর চিকিৎসার ভার অতিথির উপর ন্যস্ত করেন। মেয়েরা সেলাইয়ের কাজ করিয়া বা মিষ্টি বা চাটনি খাইয়া অবসর সময় অতিবাহিত করিত। ডাঃ ফ্রায়ার সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করেন যে মারাঠাদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি কোনরূপ সামরিক শক্তি চালনা করিতেছেন না কেন। ইহার উত্তর সেনাপতি জবাব দেন যে শিবাজীকে দমন করা যত সহজ মনে করা হয় আসলে কাজটা তত সহজ নহে। তারপর তিনি এক তরফা বাদশাহের প্রতিনিধি বাহাদুরখাঁর নিন্দা করিতে থাকেন। তিনি বলেন যে বাহাদুরখাঁ ঘুষ লওয়া ছাড়া আর কোন কাজ করেন না। মুঘল সেনাপতিদের নৈতিক চরিত্রের এই অবস্থায় যুদ্ধে শিবাজীর সাফল্যে আশ্চর্য্য হওয়ার কোন কারণ নাই।

মুঘল সেনাপতির সহিত ফ্রায়ারের সাক্ষাতকারের প্রসঙ্গে সমসাময়িক মুঘল অভিযাত সম্প্রদায়ের জনৈক ভদ্রলোকের বোম্বাই শহরবাসী একজন ইংরাজের বাটীতে সাক্ষাতের তুলনামূলক উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"আবদার রাজ্জার সহিত হায়দরাবাদনিবাসী একজন ইংরাজের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি একদিন আমাকে তাঁহার বোম্বাইয়ের আবাসবাটীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আমি তাঁহার নিকট গেলাম। ঐ প্রাশাদে প্রবেস করিয়া অমি রাস্তার দুইধারে সদ্য শ্মশ্রু যুক্ত সুন্দর চেহারার এবং সুন্দর পোশাক পরিহিত বন্দুক হস্তে কয়েকজন-যুবককে দেখিতে পাই। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমি দীর্ঘ শ্মশ্রুযুক্ত ঐ বয়সের এবং ঐরূপ সাজসজ্জায় কয়েকজন ইংরাজ যুবককে দেখি। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে শ্বেত শ্মশ্রুযুক্ত কিংখাবের পোশাক পরিহিত

কয়েকজন ইংরাজকে দেখিতে পাই। কয়েকটি ইংরাজ বালককেও দেখি। তাহাদের চেহারা সুন্দর ও তাহাদের টুপিরধারে মুক্তার মালা দোলায়মান।" নির্দ্দিষ্ট বাটিতে পেঁছাইয়া তিনি দেখেন যে গৃহকর্ত্তা "কেদারায়বসিয়া আছেন। তাঁহাদের প্রথামত তিনি আমাকে অভিবাদন করিয়া শুভেচ্ছা প্রকাশ করেন। তারপর তিনি আসন হইতে উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ এক কেদারায় বসিতে ইঙ্গিত করেন। সাধারণ কুশলাদি প্রশ্নের পর আমাদের নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। তাঁহার প্রতিটি কথায় ভদ্রতা ও দরদ প্রকাশ পায়। সাক্ষাতের পর তিনি তাঁহাদের প্রথানুযায়ী আমার উপভোগের জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অমি কোনরূপে চলিয়া আসি।"

মুঘল সৈন্যদিগকে প্রতিরক্ষার কাজে অকর্ম্মন্য করিয়া ফেলিয়া শিবাজী হঠাৎ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত গোলকুণ্ডা রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই রাজা মুসলমানদিগের অধীন হইলেও দীর্ঘকাল ব্যাপী বিজাপুর ও মুঘলসাম্রাজ্যের মধ্যে বিরোধের সময় নিরপেক্ষ ছিলেন। নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও শিবাজী এই রাজ্যের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্থাপন ও কর আদায়ের দাবী করেন। গোলকুণ্ডার রাজা যথাসম্ভব সত্বর বিশ-লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা কর দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ঐবৎসর বিজাপুরের সুলতানের মৃত্যু হওয়ায় শিবাজী এই ধংসোন্মুখ রাজ্যের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ও উহার কয়দংশ নিজের রাজ্যের সহিত যুক্ত করার সুযোগ পান।

এইবার শিবাজী দক্ষিণভারতে সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করেন। স্বধর্মীরা তাঁহাকে উত্তরভারতের মুসলমান বাদশাহের সমকক্ষ হিন্দু প্রতিদ্বন্দীরূপে দেখিতে লাগিল। তিনিও তাঁহার ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষমতা ও প্রভাব নাটকীয় উল্লাসের সহিত ঘোষণা করিতে মনস্থ করেন। তিনি প্রচার করেন যে ভারতবর্ষে হিন্দুরাজত্বকালে যে পদ্ধতিতে পুরাতন সম্রাটদিগের অভিষেক হেইত ঠিক সেইভাবে তিনি নিজকে হিন্দুভারতের রাজা বলিয়া অভিষিক্ত করিবেন।

চতুর্থ খণ্ড

নৃপতি

ঊনবিংশ অধ্যায়

১৬৭৪ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে রায়গড়ে অভিষেক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই বিরাট সমারোহের উপযোগী নানা প্রকার জাঁকজমক পূর্ণ-সজ্জায় শিবাজীর রাজধানী সুশোভিত করা হয়। নূতন প্রাসাদ এবং রাষ্ট্র শাসনোপযোগী মহাকরণ ভবন নির্ম্মাণ করিয়া উহা আনুষ্ঠানিক ভাবে মন্ত্র পড়িয়া এবং যাগযজ্ঞ ও পূতবারি দ্বারা শোধন করা হয়। দরবার কক্ষে এক নূতন সিংহাসন স্থাপিত হইল। উহার পাদদেশে চতুর্দ্দিকে ব্যাঘ্র, সিংহ এবং হস্তীর প্রতিকৃতি খোদিত করা হয় এবং মধ্যস্থলে শিবাজীর সার্ব্বভৌম রাজ্যাধিকারের চিহ্ন স্বরূপ ত্রিশ বিন্দুসহ এক দিক্-নির্ণয়-যন্ত্র অঙ্কিত হইল। ভারতবর্ষের প্রত্যেক অঞ্চল হইতে এগার-হাজার পুরোহিত এবং এক লক্ষ দর্শনাভিলাষী দলে দলে রায়গড়ে আসিয়া পৌঁছিল। রাজধানীতে চারিমাস তাহাদিগকে শিবাজীর অতিথিরূপে নানা প্রকার আদর যত্নে ও আমোদ-প্রমোদে আপ্যায়িত করা হয়। বারাণসী হইতে আসিলেন ঐ পবিত্র নগরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গাগাভাট। তিনি মহা সমারোহে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য দক্ষিণ দেশে আগমন করেন। পথে শিবাজী মন্ত্রীবর্গসহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের নিকটস্থ হওয়ামাত্র অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে লইয়া রায়গড়ের দিকে অগ্রসর হন।

প্রায় একমাস কাল উৎসব চলে। প্রথমতঃ শিবাজী প্রতাপগড়ে ভবানী মন্দির প্রদর্শন করেন। ঐ মন্দিরে তিনি একুশ সের ওজনের একটি খাঁটি সোনায় প্রস্তুত ছাতা উপহার স্বরূপ দান করেন। তারপর, কয়েকজন অনুচর সহ তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অনেকদিন বিনিদ্র-নয়নে পূজা ও আরাধনায় যাপন করেন। বেদীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম

করিবার সময় তিনি ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় তাঁহার মুখ হইতে ক্ষীণ স্বরে কথা নির্গত হইতে থাকে। উপস্থিত সকলেরই ধারণা হয় যে ভবনী নিজে শিবাজীর মুখ দিয়া কথা বলাবইতেছেন। শিবাজী মারাঠা রাষ্ট্রের কাহিনী, মুঘল সাম্রাজ্যের উপসংহার, মারাঠাদিগের দিল্লী অধিকার, তাঁহার বংশধর দিগের সাতাশ পুরুষ ব্যাপী রাজত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ভবিষ্যৎ বানী উচ্চারণ করিতে থাকেন। সর্ব্বশেষে তাঁহার কণ্ঠস্বরে এই কথা বাহির হয়, "রাজদণ্ড লালবর্ণ মুখের এক বিদেশী জাতির অধিকারে চলিয়া যাইবে।"

দৈবক্রমে ঠিক সেই সময় লালবর্ণ-মুখ একদল লোক শিবাজীর দরবার অভিমুখে আসিতেছিল। ইহারা বোম্বাইয়ের ইংরাজ কুঠি হইতে প্রেরিত হয়। পথে গাছের ডালে ডালে বানরের ছুটাছুটি দেখিয়া ইহারা খুব আমোদ পায়। তাঁহাদের কিচির মিচির শুনিয়া মনে হইল যেন বনের মধ্যে একটা যুদ্ধ চলিতেছে। পথিমধ্যে মারাঠা সৈন্যদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহারা মুঘল এবং মারাঠার মধ্যে পার্থক্য সহজেই বুঝিতে পারে। "মারাঠাসৈন্যদের পাগড়ির নীচে দুই কানের ধারে দোলায়মান কেশ তাহাদের একটা বৈশিষ্ঠ্য।"

শিবাজী রায়গড়ে অনুপস্থিত থাকায় নারায়ণজী পণ্ডিত নামক তাঁহার এক মন্ত্রী ইংরাজ দূতদিগকে অভ্যর্থনা করেন। এই লোকটিকে তাঁহাদের "বেশ জ্ঞানী ও সম্মানী" বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা নারায়ণজীকে একটি হীরার অঙ্গুরী ও তাঁহার জৈষ্ঠ্যপুত্রকে দুইটি পোষাক উপহার দেন। রায়গড় হইতে প্রতাপগড়ে যাওয়ার সময় ইহাদের আগমনের সংবাদ শিবাজীর জানা না থাকায় তিনি ইহাদের অভ্যর্থনার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই। সহরে অতিরিক্ত জনসমাগম হওয়ায় তাঁহারা কোন আবাসস্থান পাইলেন না এবং তাহাদিগকে তাঁবুতে থাকিতে হয়। ইহা তাহাদের নিকট অতিরিক্ত গরম বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক শিবাজী রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করা মাত্র তিনি ইংরাজদিগকে তাঁহার প্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন এবং তাহাদিগকে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়া বলেন যে "তাঁহারা তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিবেন। কোনরূপ

দুর্ব্যবহারে ভীত হওয়ার তাঁহাদের পক্ষে কোন হেতু নাই।" রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত বাণিজ্য-চুক্তির সর্ত্তগুলির চরম ব্যবস্থা স্থগিত থাকে। ইংরাজ দূতেরা রায়গড়ে এক পক্ষকাল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

চারিদিকে শুভ্র মস্লিনের বস্ত্র পরিহিত হিন্দু অভিযাত বংশীয় ভদ্রলোক ব্রাহ্মণদের সহিত পরচুলা এবং পাখীর পালক শোভিত টুপি ও বকলস্‌যুক্ত পাদুকা পরিহিত ইংরাজ বণিকদের চেহারায় পার্থক্য খুবই লক্ষণীয় হইয়া থাকিবে। সমস্ত প্রকার প্রাচ্য বেশভূষার জাঁক জমক ও চাকচিক্য সম্বন্ধে আমরা এমনই ধারণা করিতে অভ্যস্ত যে ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগে ইংরাজদিগের ময়ূরের পেখমযুক্ত বিলাসী বেশভূষা অপেক্ষাকৃত সংযমী ও অনাড়ম্বর বেশ পরিহিত মারাঠারা যে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিত তাহা আমাদের পক্ষে বুঝিতে পারাও কঠিন। ডাঃ ফ্রায়ারের লেখা হইতে আমারা ইহাও জানিতে পাই যে পরম ভোগ বিলাসী মুঘলেরাও তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতে "আমাদের ইউরোপীয় পোশাকের জাঁক জমক ও অভিনবত্ব প্রশংসা করেন, এবং আমি (ডাঃ ফ্রায়ার) উষ্ণ গায় দিয়া শয়ন করি কিনা এই কথা আমার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করেন।"

ইংরাজদিগের আহার করিবার ক্ষমতা দেখিয়াও মারাঠারা বিস্মিত হয়। আমারা জানি যে শিবাজী সারাদিন মাত্র একবার আহার করিতেন ইংরাজেরা দুঃখ করিয়া অভিযোগ করেন যে, "তাহার এই খাদ্যও ছিল চালডাল একটু মাখন সহযোগে একত্রে সিদ্ধ করা সামান্য খিচুরী মাত্র।" ষ্টুয়ার্ট যুগের ইংরাজদের খাদ্যতালিকা যিনিই দেখিয়াছেন তিনিই এই সামান্য খাদ্য বস্তুতে ইংরাজেরা যে কত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেন তাহা বুঝিতে পারিবেন। অবশেষে তাঁহারা শিবাজীর নিকট অভিযোগ করিয়া বলেন যে তাঁহারা "প্রচুর পরিমাণে মাংস খাইতে অভ্যস্ত।" অতিথিদিগকে খুশি রাখিতে শিবাজী বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু ছাগ মাংস ব্যতীত অন্য কোন মাংসই তখন পাওয়া গেল না। ইহা খাইয়াই ইংরাজদিগকে তৃপ্ত হইতে হয়। তাহারা প্রত্যেকে প্রতিদিন একটি পাঁঠার অর্দ্ধেকাংশ ভক্ষণ করিয়া রাজসভায় বিস্ময় উৎপাদন করেন। এই কাহিনী শুনিলে ইংরাজেরা যে স্বভাবতঃ

হিন্দুগণের অপেক্ষা বলিষ্ঠ (কারণ কোন অতি মানব ব্যতীত কেহ এত বেশী পরিমাণে আহার করিতে পারে না) —মিঃ গান্ধীর পূর্ব্বেকার এই মতবাদ মনে পড়ে।

ইংরাজদিগের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে তাঁহারা ছাগ মাংস সিদ্ধ করিয়া ঝোল বা ডালনার মত করিয়া না খাইয়া আগুনে ঝলসাইয়া বা রোষ্ট করিয়া খাইবেন। তাঁহারা কিছুকাল এইরূপ খাদ্য সমস্যা লইয়া বিব্রত রহিলেন। এদিকে শিবাজীর অভিষেক উৎসব চলিতে লাগিল। তাঁহার মাতা জীজাবাইয়ের বয়স এখন আশির‍ও উর্দ্ধে। পালকিতে করিয়া তাহাকে প্রাসাদের সম্মুখে আনা হইল। শিবাজী সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। তারপর শিবাজী জ্ঞানতঃ এবং অজ্ঞানে যত পাপ করিয়াছিলেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। পূর্ণ তিন দিন তিনি দিবারাত্র জাগ্রত রহিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন। অবশেষে পুরোহিতেরা তাঁহাকে পাপমুক্ত বলিয়া ঘোষণা করার পর প্রধান পুরোহিত গাগাভাট তাঁহাকে দ্বিজগণের প্রতীক উপনয়ন পরাইয়া তাঁহার কানে সূর্য্য অর্ঘ্যের বীজমন্ত্র উচ্চারণ করেন। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদিগেরই ইহা জানিবার অধিকার ছিল। এইবার মুঘল বাদশাহদের অনুকরণে শিবাজীকে তুলদণ্ডে সোনা রূপা, ধন রত্ন, পানীয় ও মশলা দ্রব্য ফল এবং রেশমী কাপড়, প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যের সহিত ওজন করা হয়। এই সমস্ত সামগ্রী ব্রাহ্মণ দিগকে দান করা হইল।

এই উৎসবের শেষে জন সাধারণের আমোদের জন্য একটি ক্ষুদ্র অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। একটি ছোট হ্রদ খনন করিয়া উহা জলহীন করিয়া রাখা হইয়াছিল। এক কোনে একটি ক্ষুদ্র কপাট দিয়া জল ঢুকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একজন জাদুকর মাটিতে তাঁহার দণ্ড ঠক্ ঠক্ করায় উহা দ্বারাই যেন পাথর হইতে জল বাহির হইয়া আসিল—ইহা দেখানই ছিল এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অদ্ভুতদর্শন জাদুকরের তিড়িং তিড়িং লাফালাফি ও জাদুদণ্ডের আঘাতের দৃশ্য দেখিয়া একটি গেঁয়ো ও সরল প্রকৃতির মারাঠা সৈনিক ভয় পায়। জাদুকর বুঝি শিবাজী রাজাকে আক্রমণ করিতে চায় এই মনে করিয়া সৈনিক তাহার তরবারি খুলিয়া জাদুকরকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া কাটিয়া

ফেলে। নির্দ্দোষ অভিনয়ের এই পরিণতিতে শিবাজী খুব ক্লেশ অনুভব করেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ জাদুকরের পরিবারের প্রতিপালনের জন্য একখণ্ডভূমি দান করিয়া প্রভূত বৃত্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহার অর্থমন্ত্রীকে আদেশ দেন।

অভিষেকের পূর্ব্বে সাতদিন পর্য্যন্ত পুরোহিতেরা উপবাস করিয়া পূজা ও যজ্ঞ করেন।

৬ই জুন প্রকৃত অভিষেক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। অঙ্গে শুভ্র বস্ত্র, মাথায় মুকুট, এবং গলায় ফুলের মালা পরিধান করিয়া শিবাজী রাজ্ঞী সয়িবার সহিত প্রাসাদের সুবৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করেন। রাজা ও রাণীর এই শুভ মিলন মুহূর্ত্তে তাঁহাদের অঙ্গবস্ত্রের আঁচল একত্র বাঁধিয়া দেওয়া হইল। শিবাজীর ঠিক পশ্চাতে আসিলেন তাঁহার মতা এবং পুত্র শম্ভুজী। ইহাদের অনুসরণ করেন আটজন মন্ত্রী। প্রত্যেক মন্ত্রীর হাতে পবিত্র জলে পূর্ণ একটি করিয়া সোনার কলসী। মুক্তার মালা পরিশোভিত সোনালী বস্ত্রের চন্দ্রাতপের নীচে সিংহাসন স্থাপিত। শিবাজী কক্ষের মধ্য দিয়া সিংহাসনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময় জনতার মধ্যে সোনার পদ্ম পাপড়ি ও মনি মুক্তা ছড়ান হইতে থাকে। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর প্রতিটি তোপ হইতে গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইল। পশ্চিমঘাটের এক দুর্গ হইতে অপর দুর্গে রাজধানীর তোপ-ধ্বনির সহিত তাল রাখিয়া কামান গর্জন হইতে লাগিল। সমতল ভূমিতে মহারাষ্ট্রের প্রতিটি ফাঁড়ি হইতে রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তোপের শব্দ ধ্বনিত হইল। এইরূপে শিবাজীর রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে অভিষেকের সংবাদ ঘোষিত হইল। ষোলটি ব্রাহ্মণ রমনী সিংহাসনের নিকট অগ্রসর হইয়া শিবাজীর চোখের সম্মুখে প্রদীপ ধরিয়া তাঁহার মঙ্গলার্থে আরতি করেন। এইবার শিবাজী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার আড়ম্বরহীন শ্বেত অঙ্গ বস্ত্রের উপরে স্বর্ণখচিত রাজপোষাক পরিধান করেন। মস্তকে পুস্পমাল্যের পরিবর্ত্তে মনিমুক্তা বিজড়িত পাগড়ি শোভিত হইল। প্রধান হোতা গাগাভাট শিবাজীর শিরোপরি সাম্রাজ্যের ও সার্ব্বভৌমত্বের প্রতীক মুক্তাখচিত স্বর্ণছত্র উত্তোলন করেন, আর ঐ সঙ্গে সমর বাহিনী ঢালের

উপর বল্লম দ্বারা আঘাত করে এবং সমগ্র জনতা আনন্দে হর্ষধ্বনি করিতে থাকে।

তারপর সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া শিবাজী ঐ কক্ষের মধ্য-দিয়া ধীর পদক্ষেপে আসিয়া, সোনালী কার্পেট মণ্ডিত হস্তী-পৃষ্ঠ আরোহণ করেন এবং শোভাযাত্রা করিয়া রাজধানীর সর্ব্বত্র পরিদর্শন করেন। গবাক্ষ হইতে মেয়েরা তাঁহার মাথায় ফুল ও খৈ বর্ষণ করে এবং সম্মুখে প্রদীপ ধরিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করে। শোভাযাত্রার সঙ্গে মারাঠা-সৈন্যদের বিজয়ী পতাকা উড়িতে লাগিল। সহসা সমস্ত নগরীতে দমকা হাওয়া বহিল এবং পতাকাগুলি ঢেউয়ের মত উড়িতে লাগিল। মেঘ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গৈরিক পতাকা যেন সন্ধ্যার তাম্রবর্ণ আকাশের গায়ে তাল রাখিয়া উড়িতে লাগিল। আসন্ন বর্ষার প্রারম্ভে সহসা ঝঞ্ঝাবর্তে সূর্য্যাস্তের মুখে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

আজ শিবাজীর প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার সিংহাসন যে স্থানে স্থাপিত ছিল উহা একটা মাটির ঢিপি দেখাইয়া নির্দ্দেশ করা হয়। কেহ সেখানে নগ্নপদে ভিন্ন অগ্রসের হয়না। নীচুতর জাতির লোকদের উহার নিকটে যাওয়ারই অনুমতি নাই।

অভিষেক উৎসব শেষ হইলে শিবাজী ইংরাজ দূতদিগকে নিয়মানুযায়ী অভ্যর্থনা করেন। প্রথম পরিচয়ের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান পর্ব্ব শেষ হইলে ইংরাজেরা তাঁহাদের আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। হুব্লি (Hubli) ও রাজপুরে মারাঠাদের আক্রমণের সম্বন্ধে তাহারা অভিযোগ করেন। তাঁহারা মহারাষ্ট্র রাজ্যে আমদানি দ্রব্যে উপর শতকড়া সর্ব্বাধিক আড়াই টাকা পর্য্যন্ত শুল্ক দিয়া বাণিজ্য করিবার অনুমতি চাহেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এই পরিমান শুল্ক দিয়াই তাঁহারা মুঘলসাম্রাজ্যের অধীনস্থ সুরাটে ব্যবসা করিতেছিলেন। মারাঠা রাজ্যের অন্তর্গত সমুদ্রতীরে বিক্ষিপ্ত ইংরাজদিগের জাহাজগুলি ফিরাইয়া পাইবার জন্য এবং শিবাজীর রাজ্যে ইংরাজদিগের মুদ্রার অবাধে প্রচ-লনের জন্যও তাঁহারা প্রার্থনা জানান।

শিবাজী ইংরাজদিগের প্রস্তাবে যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত মনোভাব প্রকাশ করেন। রাজাপুরে ইংরাজদিগের যে ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিবার জন্য

তিনি তাহাদিগকে দশসহস্র প্যাগোডা বা দক্ষিণভারতীয় মুদ্রা দান করেন কিন্তু হুবলিতে ইংরাজেরা ক্ষতির পরিমানের যে হিসাব দেয় উহা তিনি অগ্রাহ্য করেন। ধ্বংস জাহাজ সম্বন্ধে তিনি বলেন প্রচলিত নিয়মানুযায়ী উহা সমুদ্রতটস্থ মৎস্যজীবীদিগের সম্পত্তি। তবুও ঐ সব জাহাজের ইংরাজ নাবিকদের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় এ বিষয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁহার রাজ্যে ইংরাজদিগের মুদ্রিত টাকায় প্রচলনের প্রস্তাবে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁহার টাকশাল হইতে মুঘলদিগের টাকার ন্যায় খাঁটি এবং গৌরবপূর্ণ মুদ্রা প্রস্তুত করা সম্ভব ছিল না। বাস্তবিক এই সময়ে ভারতবর্ষে মারাঠাদিগের টাকার উৎকর্ষ ছিল খুবই নীচুস্তরের। শিবাজীর টাঁকশালে মুদ্রিত টাকায় তাহার নাম আটরকমের বানানে লিখিত হইয়াছিল। মুদ্রা প্রস্তুত প্রণালীও ছিল অত্যন্ত সেকেলে ধরণের। টাঁকশালে "প্রত্যেক কারিগরের নিকট উপযুক্ত পরিমানের রৌপ্য খণ্ড দেওয়া হইত। সে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরায় বিভক্ত এবং গোলাকৃতি করিয়া ওজন করিত। মুদ্রার আকৃতির সঙ্গতি অপেক্ষা সঠিক ওজনের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইত। রৌপ্যখণ্ডের অপেক্ষা শীলমোহরের আয়তন অধিক হওয়ায় মুদ্রালিপির সবগুলি অক্ষর প্রায়ই খোদাই করা সম্ভব হইত না।"(১) সুতরাং মুদ্রা প্রচলনের এবং আভ্যন্তরীন বাণিজ্যের শুল্কের সম্বন্ধে ইংরাজদিগের প্রস্তাব শিবাজী স্বেচ্ছায় গ্রহণীয় মনে করেন; এবং আমাদের (ইংরাজদের) সহিত বন্ধুত্বের প্রস্তাবে সাদর সম্মতি দেন ও সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁহার ও তাঁহার রাজ্যের ইহাতে পরম সুবিধা হইবে তিনি এইরূপ আভাস দেন।" ইংরাজ দূতদিগের সঙ্গে ছিলেন শিবাজীর অন্যতম মন্ত্রী নারায়ণজী। তিনি শিবাজীর অপেক্ষাও অধিকতর হৃদ্যতা দেখাইয়া "আমাদের জাতির প্রতি গভীর বন্ধুত্ব প্রকাশ করেন।" ইহার পর ইংরাজেরা শিবাজীকে একটি অঙ্গুরী উপহার দেন। শিবাজীও উহাদের নেতা মিঃ অক্সিন্ড্যনকে একটি মূল্যবান এবং সমানর সূচক পোষাক উপঢৌকন দেন।

---

(১) বোম্বাই গেজেটিয়ার, ষোড়স খণ্ড, পৃ ৪২৯,

শিবাজী ও ইংরাজদিগের মধ্যে উপরোক্ত মনোরম আদান প্রদানের আবহাওয়ায় সহসা এক বৃদ্ধের আচরণে বাধা প্রাপ্ত হইল। ঐ ব্যক্তি চীৎকার করিয়া ঘোষণা করে যে সে ইংরাজদিগকে একবার মাত্র দেখিতে চায়। সে পরিস্কার করিয়া বলে যে সে হইল সেই কসাই যে ইংরাজ-দিগের রায়গড়ে অবস্থানের সময় তাহাদের জন্য ছাগমাংস সরবরাহ করিত। ইংরাজেরা শীঘ্রই সহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এই সংবাদ পাইয়া সে জিদ করিয়া পাহাড়ের উপরে উঠিয়া ইংরাজদিগের রক্তমাংসে গড়া চেহারা দেখিতে আসিয়াছে। তাঁহার ইংরাজ খরিদ্দারদিগের নিকট তাহাকে আনা হইলে সে নীরব বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাঁহাদিগের প্রতি হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। পরে সে বলিল যে গত কয়েক বৎসরে তাহার সমস্ত খরিদ্দারগণ যত মাংস খাইয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী মাংস মাত্র এত অল্প সময়ের মধ্যে যাহারা ভক্ষণ করিয়াছে আজ সে সেইসব মনুষ্য দেখিতে পাইল।

শিবাজীর অভিষেকের পরে কয়েকদিন গত হইলে রায়গড়ের পথঘাটে প্রবল ঝড়ের ব্যাত্যা বহিতে লাগিল। বর্ষার বৃষ্টিতে রাজপ্রসাদের দেওয়াল সিক্ত হইয়া গেল। এই অবস্থায় জীজাবাই অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিনি চিন্তাকুল অবস্থায় কিছুকাল শায়িত থাকিয়া শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যে পুত্রকে দারিদ্র্য এবং নির্জনতার মধ্যে লালন পালন করিয়া মানুষ করিয়াছেন হিন্দুদিগের রাজা রূপে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া পর্য্যন্ত তিনি জীবত থাকিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার মনে হইল যে জীবনে তাঁহার আর কোন আকাঙ্খা নাই। তাঁহার সমস্ত দ্রব্যাদি তিনি গরীব দুঃখী-দিগের মধ্যে বিতরণ করিতে আদেশ দেন। অসুস্থ হওয়ার পর পঞ্চম দিবসে তিনি শান্তিতে নশ্বর দেহে ত্যাগ করেন। রায়গড়ে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। চিতাভস্ম লইয়া গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত করা হইল।

আর একদল ইংরাজ পরের বৎসর শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন নিম্ন লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন—

"২২শে মার্চ্চ দুপুর বেলায় বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং প্রায় দেড়শত শিবিকা সহ রাজা আগমন করেন। তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন জানিতে পারা মাত্র আমরা তাঁবু হইতে বাহির হইয়া তাহার

পালকির নিকট গেলাম, তিনি পালকি থামাইবার আদেশ দিয়া আমাদিগকে তাঁহার সন্নিকটে আহ্বান করেন। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি খুব খুশি হইয়াছেন মনে হইল। তিনি বলেন যে এখন রোদের তাপ বড় বেশী; আমাদিগকে তিনি অধিক সময় তাহার নিকট রাখিবেন না; সন্ধ্যায় তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইবেন......পরের দিন রাজা আমাদের নিকট আসেন। পালকি থামাইয়া তিনি আমাদিগকে তাঁহার নিকট আহ্বান করেন। আমারা তাঁহার দিকে বেশ একটু আগাইয়া আসিয়া থামিলাম। কিন্তু তিনি হাতের ইঙ্গিতে আমাদিগকে আরও নিকটে আসিতে বলায় আমি তাহার খুব কাছে আসিলাম। তিনি একটু সরিয়া বসিয়া আমার পরচুলার একটি গুচ্ছ ধরেন এবং কয়েকটি প্রশ্ন করেন।......তাঁহার সঙ্গে আমরা প্রায় দুইঘন্টা কাটাইলাম। এই সময়ের অধিক্ষণ আমাদিগকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে অতিবাহিত হয়। অবশেষে আমরা ঐ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করা আমাদের আবেদন পত্র তাহার নিকট পেশ করি। উহা পঠিত হওয়ার পর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে আমাদের দিকে গম্ভীরভাবে চাহিয়া বলেন যে আমরা যাহা চাহিয়াছি উহা সবই মঞ্জুর হইল।"

এইরূপ সৌহার্দ্দ সত্ত্বেও শিবাজীর সহিত ইংরাজদের সম্পর্ক একটু তিক্ত হইয়া উঠে। (ঐ সময় বোধ হয় ইংরাজ কুঠির কর্ত্তারা তাঁদের বিবেকের দ্বিধায় বিব্রত বোধ করেন। এইরূপ ব্যবহার তাহারা মাঝে মাঝে করিতেন।) তিক্ততার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ কোম্পানী শিবাজীকে 'পঞ্চাশটি বড় কামান ও দুইটি পিত্তল নির্ম্মিত বন্দুক' দিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা মনে করেন যে প্রকাশ্যে এইরূপ কাজ করিলে "বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন।" দ্বিতীয়তঃ মারাঠারা এই সময় ধরণগাঁও আক্রমণ করায় কোম্পানীর কিছু ক্ষতি হয়। কিন্তু শিবাজী উহার জন্য ক্ষতি পূরণ দিতে অস্বীকার করেন। এ বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে ইংরাজদের কুঠি "গুণ্ডা শ্রেণীর লোকেরা লুঠ করিয়াছে। ঐ সম্পর্কে তিনি কিছু জানিতেন না এবং কোন নির্দ্দেশ দেন নাই।"

ইংরাজদিগের সুরাট কৌন্সিল ক্রোধান্বিত হইয়া মন্তব্য করেন, "এই

জলদস্যু এবং সর্ব্বত্র লুণ্ঠনকারী যাহার মিত্র এবং শত্রুর সম্বন্ধে মনোভাবের কোন তারতম্য নাই এবং যে ভগবান বা মানুষকে গ্রাহ্য করে না, যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন এই দেশে বাণিজ্যের কোন নিরাপত্তা নাই।"

যাহা হউক কিছুকাল "কঠোর সমালোচনার" পর উভয় পক্ষের পারস্পরিক মনোভাবের উন্নতি হয়। বোম্বাই কৌন্সিল আত্মপ্রসাদ দেখাইয়া সুরাট কুঠিতে লেখেন, "তিনি আমাদের সমস্ত অনুরোধে সম্মতি দিয়াছেন। আমাদের দাবির পূরণের নিদর্শনরূপে আমাদিগকে একশত খান্দি (১) শুপারি পাঠাইয়াছেন।"

বহুবিষয়ে মতের অনৈক্য সত্বেও ইংরাজেরা "আমাদের প্রতিবেশী শিবাজীর" প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বোম্বাই কৌন্সিল মন্তব্য করেন, "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে শিবাজীর যদি কোন রাষ্ট্রের লোকের প্রতি মমতা বোধ থাকে তবে ইংরাজগণই সেই জাতি।"

ত্রিংশ অধ্যায়

অভিষেকের পর দুইবৎসর শিবাজীর কর্ম্ম তৎপরতায় সাময়িক বিরতি দেখা গেল। মাতাকে তিনি যত ভালবাসিতেন এরূপ তিনি অন্য কোন নারীকেই কখনও ভালবাসেন নাই। মাতার উপদেশ ও অভিজ্ঞতার উপর তিনি সতত নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শিবাজী বড়ই আঘাত পাইলেন। অবিরত কর্ম্মচাঞ্চল্যে ও পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি খুব অসুস্থ হইলেন। তিনি আরোগ্য লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক তপস্বী-মনোভাব ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। বহুকাল পূর্ব্বে শিবাজী একবার সন্ন্যাস জীবন গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পুনরায় তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই প্রকার কাজে তাঁহাকে যদিও অতিকষ্টে বিরত করা হইল, তবুও দেখা যাইত যে

---

(১) ব্যাগ বা থলে

তিনি প্রায়ই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া একাকী বনে জঙ্গলে বিচরণ করিতেছেন। কখনও বা অরণ্যমধ্যস্ত স্রোতস্বিনীর তীরে অথবা কোন বৃহৎ বৃক্ষের নিম্নে শান্তিপূর্ণ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন। অধুনা তিনি যে কোমল রাজ শয্যায় শয়ন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন উহার পরিবর্ত্তে তিনি গ্রাম্য কৃষকদের ন্যায় দড়ি ও কাষ্ঠদণ্ডযুক্ত খাটিয়ায় নিদ্রা যাইতেন।

মাতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তিতে আচ্ছন্ন হইল। অমায়িক প্রকৃতির ও স্নেহশীল তাঁহার প্রথমা পত্নী সইবাঈ বহুকাল পূর্ব্বে পরলোকগত হন। তাঁহার পুত্রও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এবং মুঘল রাজধানীতে বন্দী দশায় তাঁহার সাথী শম্ভুজী যৌবনে গোঁয়ার প্রকৃতির ও রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন। পিতার শাসন তাহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। সরিয়াবাঈ তখন রাজমহিষী। চেহারায় ও চরিত্রে তিনি ছিলেন সম্রাজ্ঞী য়্যাগ্রিপ্পিনার ন্যায়। শম্ভুজীকে উত্তরাধিকারীর পদ হইতে অপসৃত করিয়া তিনি স্বীয়পুত্র রাজরামকে ঐ স্থলে অভিষিক্ত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। এই বিষয়ে অনুরোধ, উপরোধ ও ষড়যন্ত্র করিয়া তিনি শিবাজীর জীবন প্রায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজী অপেক্ষা রাজরাম যে শিবাজীর উত্তরাধিকারী হওয়ার পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত এবিষয়ে তাঁহার ধারণা যে নির্ভুল ছিল ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। প্রকৃত পক্ষে ঘটনা পরম্পরায় শম্ভুজীর মৃত্যুর পরে রাজারাম সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গৌরবের সহিত শাসন কার্য্য সম্পন্ন করেন। (সম্ভবতঃ পিতার সহিত পলায়নে সমর্থ হওয়ায় শম্ভুজীর প্রতি আওরঙ্গজেব বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন এবং পরে সম্রাট তাহাকে বন্দী করিয়া ভয়ঙ্কর নৃশংসতার সহিত হত্যা করেন।) কিন্তু সরিয়াবাঈ যেন এ বিষয়ে বাতিকগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং ইহার ফলে রাজপ্রাসাদের সকলেই ত্যক্ত বিরক্ত বোধ করেন এবং শিবাজীর ও শম্ভুজীর মধ্যে একটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়।

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে রোগমুক্তির পর শিবাজী সহসা তারুণ্য-পূর্ণ উৎসাহে এক নূতন পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি তাহার শেষ এবং বৃহত্তম অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

হঠাৎ কোন অনুপ্রেরণায়ই হউক অথবা অস্বস্তিকর রোগ শয্যায় সাধনার মধ্যেই হউক তিনি ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মারাঠা শক্তি সুপ্রতিষ্ঠ করার কল্পনা করেন। সম্ভবতঃ জয়সিংহের অভিযানের কথা তাঁহার মনে পড়ে। তিনি ভাবিলেন যে তাহার মৃত্যুর পর যখন মারাঠাদের পক্ষে দ্বিতীয় আর একজন শিবাজীকে মুঘলশক্তিকে বাঁধা দেওয়ার জন্য পাওয়া যাইবে না তখন যদি মুঘলেরা আর একজন জয়সিংহকে লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক সময়ের যুদ্ধের যে ফল হইয়াছে ঠিক উহার বিপরিত ফল হইতে পারে। মারাঠাদের যুদ্ধে জয় এবং তেজ বীর্য্যহীন মুঘল সাম্রাজ্যের গতিহীনতা সত্ত্বেও উত্তর ভারত হইতে মুঘলদের যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম একত্র করিয়া যুদ্ধের কাজে লাগাইতে পারিলে কোন পক্ষ যে অধিকতর শক্তিশালী—এবিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না। কেবলমাত্র লোকবলের দিক হইতেই মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই প্রতীয়মান হইত। আওরঙ্গজেব যখন স্বয়ং তাঁহার প্রধান সমর ভাহিনী দক্ষিণে পরিচালনা করেন তখন তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যসংখ্যা ছিল পাঁচলক্ষ। গোলন্দাজসৈন্যের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে মুঘলদের তুলনায় চিরকালই মারাঠাশক্তির হীনত্ব প্রমাণিত হইত। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর মারাঠা অর্থে বশীভূত বিদেশী গোলন্দাজ ভাগ্যান্বেষী সৈন্যরা যখন ব্যস্তভাবে মারাঠা নায়কদিগের অধীনে চাকুরী করিতে থাকে সেই সময় হইতে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। ভৌগলিক অবস্থিতির দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও নবপ্রতিষ্ঠিত মারাঠা রাষ্ট্রের কতকগুলি বিশেষ দুর্ব্বলতা সহজেই প্রকট হয়। চারিধারে মুঘল সাম্রাজ্য, গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুর ইত্যাদি মুসলমান শক্তি পরিবেষ্টিত মিত্র বিহীণ স্বাধীন এক হিন্দুরাজ্য। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার সমৃদ্ধি ছিল প্রচুর। উহারা মুঘল সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ আয়ত্বে আসিলে (মারাঠা রাজ্যে উত্থানের ফলে উহাদের অবস্থা মুঘল সাম্রাজ্যের কার্য্যকলাপের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিত) ঐ দুই রাজ্যের বিশেষ বিশেষ অংশ ঘাঁটি করিয়া মুঘল সৈন্যদিধকে মহারাষ্ট্রের বিরূদ্ধে পরিচালন করার জন্য ব্যবহৃত করা যাইতে পারিত। বস্তুতঃ আওরঙ্গজেবের শেষ অভিযানের সময় মুঘল সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুর

সম্পূর্ণরূপে মুঘলদিগের অধীনস্থ করার যে বিশেষ প্রয়োজন ইহা বেশ ভালভাবেই অনুভূত হইয়াছিল। শিবাজী যে আপাত: বিজয়লাভ করার পরেও তাহার রাজ্য ভবিষ্যৎ বিপর্য্যয় হইতে রক্ষা করার জন্য বদ্ধ পরিকর হন ইহা রাজ নীতিতে তাঁহার বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে কর্ণাটক প্রদেশ অবস্থিত। এখনকার মত তখনও এই প্রদেশ মন্দির ও ভূমির উর্ব্বরতার জন্য বিখ্যাত ছিল। এই প্রদেশে হিন্দুদিগের সংস্কৃতি ও সভ্যতা অক্ষুন্ন ছিল। মুসলমানদের প্রভাব এখানে প্রবেশ করে নাই বলিলেই চলে। এখানকার বৈশিষ্ট্য কৃষ্ণপাথরের বিশাল মন্দির সমূহের কারুকার্য্য, এবং মন্দির প্রাঙ্গনে মাল্যভূষিত ও সুগন্ধিপূর্ণ স্তম্ভ শ্রেনী। মধ্যে অগণিত দক্ষিণীব্রাহ্মণ। তাহাদের বিশাল বপু ও মানানসই মস্তক এবং রঙ্গীন চিত্র প্রিয়তা প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণবর্ণ ললাটে শ্বেত চন্দনের উজ্বল ত্রিশূল আঁকিয়া তাহারা ধীর পদক্ষেপে মন্দিরে বিচরণ করে। সীমাহীন শস্যক্ষেত্র ও আম্র বাতাসে ঈষৎ চঞ্চল তাল ও তমাল বৃক্ষ শ্রেণী নয়ন মুগ্ধ করে। কর্ণাটক প্রদেশ নামে মাত্র বিজাপুর সুলতানের অধীন ছিল। তাঞ্জোরের রাজা সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু সুলতানের এই প্রদেশের উপর কোন প্রকৃত অধিকার ছিল না বলিলেই চলে। বাহ্যিক বশ্যতার দাবিতেই সুলতানকে অনেক সময় সামরিক অভিযান পাঠাইতে হইত।

বিজাপুর সরকারের অধীনে চাকুরী করার সময় শিবাজীর পিতা শাহজী কয়েকবার এইরূপ অভিযান পরিচালন করেন এবং ইহার পুরস্কার স্বরূপ কর্ণাটকের প্রাদেশিক শাসকরূপে মনোনীত হন। স্বীয় পুত্রকে বিজাপুরের সহিত সন্ধি করিতে রাজী করায় তাঁহার এই পদ পাকা করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ব্যাঙ্কোজীকে (১) তাঁহার পদে নিযুক্ত করা হয়। ব্যাঙ্কোজীর ব্যক্তিত্বে বা চরিত্রে কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। শিবাজীও অভিযানের কল্পনা মনে আসার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি প্রতি কোনরূপ মনোযোগ প্রদর্শন করেন নাই। এখন

---

(১) স্মরণ থাকিতে পারে যে ইনি বিজাপুরে শাহজী যে দারপরিগ্রহ করেন সেই দ্বিতীয়া স্ত্রীর পুত্র।

যে বিরাট পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন তাহার সমর্থনে তিনি হঠাৎ দাবি করিয়া বসিলেন যে যেকয়েক বৎসর ব্যাঙ্কোজী প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছেন সেই সময় তাঁহার শিবাজীকে উহার ভাগ দেওয়া উচিত ছিল; কারণ হিন্দু আইন অনুযায়ী পৈত্রিক সম্পত্তি সকল পুত্রেরই সমান অংশে প্রাপ্য। ব্যাঙ্কোজীর আবাস স্থল তাঞ্জোর বহুদূরে অবস্থিত এবং মধ্যস্থলে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের বহুমাইল জমি থাকায় তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণে রাজী হইলেন না। এখন শিবাজী ন্যায্য ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া বলপ্রয়োগ দ্বারা তাহার স্বত্ব দখল করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

অভিযানের পক্ষে এই সময়টি খুবই উপযুক্ত ছিল। উত্তর ভারতের মুঘল সেনাবাহিনী তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিদ্রোহী পাঠানদিগের সহিত এক ক্লান্তিকর যুদ্ধে বিজড়িত।

আওরঙ্গজেব স্বয়ং রাজপুতনায় বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার ক্রমবর্দ্ধমান গোঁড়ামির ফলে রাজপুত সেনাপতিরা তাঁহার প্রতি বিরূদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। এমনকি অতি অমায়িক ও বিনয়ী ওমবরাহ যশোবন্ত সিংহ পর্য্যন্ত ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় সম্রাটকে এক চিঠিতে লেখেন, "ঈশ্বর কেবল মুসলমানদিগের ঈশ্বর নহেন; তিনি সকল মনুষ্যজাতিরই ঈশ্বর। ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্ম্ম বা আচরণের বিরূদ্ধতা করায় সর্ব্বোশক্তিমান পরমেশ্বরের ইচ্ছা অবজ্ঞা করা হয়।" (১) এখন, হিন্দু রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেববংশ সম্ভূত মেবারের রাণাও বিদ্রোহীদের দলভুক্ত হইলেন। হিন্দু আমলের বীরত্বের ঐতিহ্য ও আচরণ মুঘলদিগের সহিত যুদ্ধরত রাজপুতদিগের বিশেষ অসুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। আওরঙ্গজেবের সৈন্যদিগকে এক গিরিসঙ্কটে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয়। সেখানে তাহাদের খাদ্য কম পড়িয়া যায়। রাজপুতদিগের আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল না। তাহাদের পক্ষে যে কোন সময়ে ভয়ঙ্কর শত্রুদিগের আত্ম-সমর্পনের নিশ্চিত সম্ভাবনার অপেক্ষায় থাকিলেই চলিত। কিন্তু রাণা এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত সৌজন্যের সহিত এক সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহার

(১) ওর্ম্ম

সৈন্যদিগকে অপসরণ করিয়া আওরঙ্গজেবের নিজ ঘাঁটীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সুবিধা করিয়া দেন। অন্য আর একবার রাজপুতেরা বাদশাহের শিবিরে হানা দিয়া উদীপুরী জর্জিয়ান বেগমকে আয়ত্ব করে। (স্মরণ থাকিতে পারে যে এই মহিলা অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া আওরঙ্গজেবের অনেক ক্লেশের কারণ হইতেন।) রাণা তাঁহাকে "সসম্মানে ও সযত্নে অভ্যর্থনা করেন।" এবং অনতিবিলম্বে তাঁহারই মনোনীত সঙ্গী সহ তাঁহাকে বাদশাহের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। স্বার্থ ছাড়া মানবচরিত্রের যে অন্য কোন উদ্দেশ্য বা ধর্ম্ম থাকিতে পারে আওরঙ্গজেবের সে ধারণা ছিল না। তাঁহার মতে ভবিষ্যতে মুঘলেরা প্রতিহিংসা লইতে পারে এই ভয়ে রাণা ঐরূপ উদার ও ভদ্র ব্যবহার করেন। সুতরাং তিনি যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।" এবং "প্রতি হিন্দুগৃহে দেবমূর্ত্তি সমূহ ধ্বংস করেন।" দাক্ষিণাত্যের মুঘল সেনাপতিরা এতদিন মারাঠাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেই ব্যস্ত ছিলেন। শিবাজীর প্রস্তাবিত অভিযানের সংবাদ পাইয়া তাহারা সর্ব্বপ্রথম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন যে দুই মারাঠা নেতা আত্ম কলহে বিজড়িত হইয়া পড়িলে মুঘল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তের প্রদেশগুলির উপর যুদ্ধের চাপ অনেক কমিবে। প্রধান মুঘল সৈন্যধ্যক্ষকে প্রচুর উৎকোচ দানে বশীভূত করিয়া শিবাজী তাহাদের উদাসীনতাকে অনকুল নিরপেক্ষতায় পরিণত করিয়া উহা নিজের কাজে লাগান। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের সারা শরৎকাল শিবাজীর যুদ্ধ প্রস্তুতি চলিল। অভিযানের জন্য এক বৃহৎ সেনানী সংগৃহীত হইল। দুর্গ সমূহের রক্ষীদলের সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হইল, এবং শিবাজীর অনুপস্থিতিতে রাজ্য পরিচালনা করিবার জন্য তিনজন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইল।

নববর্ষের প্রারম্ভে শিবাজী সত্তর হাজার সৈন্য সহ রায়গড় হইতে অভিযান বাহিরে হন। এত বৃহৎ সংখ্যায় সৈন্য সমাবেশ করিয়া মারাঠারা ইতিপূর্ব্বে কখনও যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। বিনা বাধায় বিজাপুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া তিনি গোলকুণ্ডা রাজ্যের সীমানায় উপস্থিত হন। সেখানে তিনি কিছুকাল অপেক্ষা করেন। এদিকে তাঁহার প্রতিনিধি রাজদূত মারাঠাদিগের ঐ রাজ্যের মধ্যদিয়া অবাধ যাতায়াতের সম্বন্ধে গোলকুণ্ডা দরবারের সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ঐরূপ প্রস্তাবে গোলকুণ্ডার রাজা যে ভীত হইয়াছিলেন ইহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কোন কারণ নাই। কিন্তু তাঁহার বাধা দিবার কোন ক্ষমতা ছিলনা। দরবারের এবং রাজধানীর জাঁকজমক এবং পারস্য দেশীয় রাজবংশের প্রতি প্রজাদিগের গভীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও গোলকুণ্ডা রাজ্যের শক্তি ছিল অতিশয় দুর্ব্বল। মুঘল বাদশাহ সর্ব্বদা নানা প্রকারের উপঢৌকন দাবি করিয়া গোলকুণ্ডার অসহায়তা সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শন করিয়া বেশ আমোদ অনুভব করিতেন। গোলকুণ্ডার রাজা কোন কৌতুহলদ্দীপক বা দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করিয়া উহা সমাদরে রাখিলে ঐরূপ বস্তুর প্রতিই সম্রাটের বিশেষ দৃষ্টি পড়িত। গোলকুণ্ডার রাজার এক হাতী একটি মেয়ের সহিত প্রেমে পড়ায় চারিদিকে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। (১) একবার বাদশাহ ঐ হাতীটি চাহিয়া বসিলেন। মঁসিয়ে বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন, "গোলকুণ্ডা দরবারে আওরঙ্গজেবের স্থায়ী রাজদূত নিজেই ইচ্ছানুরূপ আদেশ প্রদান করেন এবং লোকজনকে কখনও বা শাসান, কখনও বা ভয় দেখান." আর এদিকে "রাজা ওলন্দাজদিগকে একটি বৃটিশ জাহাজ অধিকার করিতে না দেওয়ায় তাহারা রাজার ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়া গোলকুণ্ডার সমস্ত বাণিজ্য পোত বন্দর হইতে বাহির হইতে দিবেন না এই মর্ম্মে এক নিষেধাজ্ঞা জাহির করিবেন বলিয়া রাজাকে শাসান। এবং পর্ত্তুগীজেরা এই সময় দরিদ্র ঘৃণীত ও সকলের পরিত্যক্ত হইলেও তাঁহারা পর্য্যন্ত গোলকুণ্ডার রাজার সহিত যুদ্ধ করিবেন বলিয়া তাহাকে ভয় দেখান।"

গোলকুণ্ডার বাহ্যিক প্রতিপত্তি ও চাকচিক্যের প্রধান নিদর্শন ছিল উহার অপরিমিত ধনরত্ন। ঐ সব রত্নাদির অধিকাংশই আসিত কোল্লুরের হীরক খনি হইতে। রাজ্যের অন্যান্য শাসনবিভাগের মত খনিবিভাগের শাসনও পরিচালিত হইত কোনরূপ পূর্ব্ব পরিকল্পনা ব্যতীত নিতান্ত এলোমেলোভাবে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে উইলিয়াম মেথল্ড (William Melhold) নামক জনৈক ইংরাজ ঐ খনিগুলি পরিদর্শন করিতে আসিয়া দেখেন যে উহাতে ত্রিশ সহস্র মজুর কাজে নিযুক্ত।

(১) মানুচিচ

"তাহাদের মধ্যে একদল মাটি কাটিতেছে, আর একদল উহা ঝুড়িতে করিয়া বহন করিতেছে, অপর কেহ কেহ অত্যন্ত ক্লান্তি ও পরিশ্রমের সহিত পাত্রের পর পাত্র হাতে বহিয়া উহা হইতে জল বাহির করিয়া দিতেছে (কারণ এই অশিক্ষিত লোকেরা কোনরূপ যন্ত্রের ব্যবহার জানিত না)। এখানকার মাটি সাধারণতঃ লাল রঙের, উহার মাঝে মাঝে চকখড়ি ও চুনের আঁকা বাঁকা ডোরা কাটা দাগ। রৌদ্রে শুকাইয়া শক্ত হইলে উহা পাথর দিয়া ভাঙ্গা হয়। তৎপর অবশিষ্ট ধূলি ঝাড়িয়া কখনও বা কম এবং কখনও বা বেশী পরিমাণে তাহারা হীরার টুকরা-গুলি আবিষ্কার করে। প্রায়ই এমন হয় যে একটুকরা হীরাও পাওয়া গেলনা। ঐদিনের সময় ও পরিশ্রম বৃথাই ব্যয়িত হয়।" (১)

গোলকুণ্ডার দ্বিতীয় প্রধান আয় হইত তাড়ি বা তালরস হইতে প্রস্তুত এক প্রকারের মদ্য হইতে। এইদ্রব্যে ছিল সরকারের একচেটিয়া অধিকার। এখানে গণিকালয়ের সংখ্যা ছিল ভারতবর্ষের যে কোন শহর অপেক্ষা অধিক। উহাই ছিল তাড়ি বিক্রয়ের প্রধান স্থান। কারণ এই রূপোজীবিকাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগকে একটা ন্যূনতম নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় পানভোজনে প্ররোচিত করিয়া রাজ্যের আয়বৃদ্ধিতে সাহায্য করার উপর তাহাদের ব্যবসা চালু রাখিবার লাইসেন্স বা অনুমতি নির্ভর করিত। (২)

ব্যবসা চলাইবার জন্য প্রত্যেক গণিকার লিখিত অনুমতি পত্র লইতে হইত। ইহাদের নাম ও ঠিকানা সরকারী দারোগার খাতায় লিপিবদ্ধ থাকিত। প্রতি রাস্তায় তাঁহারা নিজ নিজ গৃহের দরজার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিত। রাত্রিকালে মোমবাতির আলোকে তাহাদের চেহারা ও রূপ দেখা যাইত। রাজবংশের প্রতি আনুগত্য তাহাদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। রাজা যে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাহারা রাজপ্রাসাদের বাহিরে নৃত্যগীতাদির প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিত। একবার এক উৎসব উপলক্ষে রাজার নগর প্রবেশ অনুষ্ঠানের অভ্যর্থনা প্রথামত রাষ্ট্রীয় হস্তীর দ্বারা না করিয়া এটা নকল হাতীর মধ্যে

---

(১) De Laet

(২) এই সমস্ত বিবরণ টভারনিয়ারের লেখা হইতে গৃহীত।

অবস্থিত নয়টি নটীর সহায়তায় করা হইল। বর্ত্তমান যুগে রঙ্গমঞ্চে দুইজন মানুষ দুইদিকে হইতে ঘোড়া টানিতে যেরূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে সে তুলনায় ইহা যে পরস্পরের সহযোগিতার একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

হীরার খনি এবং মদের একচেটিয়া ব্যবসা হইতে রাজ্যের প্রচুর আয় হইত এবং রাজধানীর শোভা খুবই জমকাল ছিল। গোলকুণ্ডার ধনরত্নের প্রাচুর্য্য ও খ্যাতির কাহিনী শুনিয়া পাশ্চাত্য দেশ হইতে অনেক ভাগ্যান্বেষী এখানে আকৃষ্ট হইত। মুঘল সাম্রাজ্যের ন্যায় এখানে তাহাদের স্বেচ্ছায় সমর বাহিনীতে ঢুকিবার সুবিধা ছিল না। কিন্তু ইস্‌লাম, ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার ভান করিয়া অনেকে ব্যবসায়ে বেশ সমৃদ্ধি লাভ করিত। রবার্ট জনসন নামক এক ব্যক্তি "মুসলমান হইয়া ওখানে বাস করিতে লাগিল। তাহার সুন্নৎ ক্রিয়াও সম্পাদিত হয়। সে রাজার নিকট হইতে দৈনিক সাত শিলিং ছয় পেন্স করিয়া বৃত্তি পায় এবং রাজার সঙ্গে এক আসনে বসিয়া আহার করিত। কিন্তু সুন্নৎ হওয়ার আটদিন পরে তহার দেহাবসান হয়।" (১) অপর একজন ইংরাজ কিন্তু এবম্বিধ দৈব ঘটনা বিপর্য্যয়ে মোটেই ভয় পাইল না। ইহার নাম রবার্ট ট্রুলি (Robert Trully)। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে আগ্রায় ইংরাজ কুঠিতে কাজ করিত। পরে সে নিজে গান ও সঙ্গীত বাদকের ব্যবসা আরম্ভ করে। (পারসেলের (Purcell) সমসাময়িক এই ব্যক্তি মুঘল সঙ্গীত রসিকদিগকে কিরূপ বাজনা শোনাইত ইহা উপলব্ধি করা শক্ত)। যাহা হউক এই নুতন ব্যবসায়ে সে অকৃতকার্য্য হইয়া দাক্ষিণাত্য অভিমুখে রওনা হয়। "তাহার সঙ্গে ছিল একজন জার্ম্মান দোভাষী। ইহারা দুইজনেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করে। সুন্নত উপলক্ষে মাষ্টার ট্রুলির নূতন নামকরণ হয় এবং সে রাজার নিকট হইতে মোটা ভাতাও লাভ করে।" কিন্তু জার্ম্মান লোকটি হীনতর দোভাষী বলিয়া পরিচিত হওয়ায় তাহাকে বেশী আমল দেওয়া হয়না। সামাজিক স্তরে রাজা তাহার স্থান অপেক্ষাকৃত নীচে নির্দ্ধারিত করেন এবং ধর্ম্মান্তরিত

(১) Withington's *"Tractatc"*.

ব্যক্তি রূপেও সে বিশেষ কোন মর্য্যাদা পাইল না। বিরক্ত হইয়া এই ব্যক্তি "আগ্রায প্রত্যাবর্ত্তন করে ও একজন ফরাসী ভদ্রলোকর অধীনে চাকরি লইয়া পুনরায় গির্জ্জায় গিয়া খৃষ্টধর্ম্মের আচার ব্যবহার অবলম্বন করে।"(১)

গোলকুণ্ডার অধিবাসীরা সকলেই ছিল কৃষিজীবী। শান্তিপ্রিয় এই দক্ষিণী ভারতীয়েরা প্রায় সকলেই নিম্নজাতীয় হিন্দু। ইহারা স্বভাবতঃ বিনয়ী এবং ইহাদিগকে শাসন করাও সহজ। কিন্তু এই রাজ্য বিদেশীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করার নিমিত্ত কোন অতিরিক্ত বিশেষ সমর বাহিনী ছিল না। গোলকুণ্ডার রাজাদিগের বিদেশ-নীতি ছিল কেবল প্রতিবেশী শক্তিগুলিকে নিয়মিত টাকা দিয়া সন্তুষ্ট রাখা। গত কয়েক বৎসর যাবৎ গোলকুণ্ডা রাজ্য মুঘল ও মারাঠা এই উভয় পক্ষকেই কর দিতেছিল। সৌভাগ্য বশতঃ এই রাজ্যের এত অফুরন্ত সম্পদ ছিল যে এই দুই প্রকারের কর অনায়াসে প্রদান করিয়াও এই দেশে অতি জাঁকজমক পূর্ণ অট্টালিকার নির্ম্মানকার্য্য নির্ব্বিবাদে চলিতে থাকে। দেশটা ছিল অতুল ঐশ্বর্য্যে ও শস্য সম্পদে ও ফলের বাগানে পূর্ণ। হ্রদগুলিতে প্রচুর মাছ। ট্যাভারনিয়ারের মতে "এখানকার মাছের মাঝখানে মাত্র একটি করিয়া কাঁটা। এই মাছ খাইতে সুস্বাদু।" ট্যাভারনিয়ার আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে "এখানকার লোকেরা ১০।১২ হাত লম্বা সুতির ধুতি পরিধান করিত। তাহারা লম্বা চুল রাখিতে এবং উহা মেয়েদের ন্যায় খোপার মত করিয়া মাথার উপরে বাঁধিতে। মাথায় কাপড়ের তিন কোণা পাগড়ি পরিত। পারস্যদেশবাসীদিগের ন্যায় ইহারা বাঁকান তরবারী ব্যবহার করিত না। ইহাদের হাতে থাকিত প্রশস্ত তরোয়াল। ইহা কোমরে বাঁধা থাকিত এবং প্রয়োজন মত ইহা দ্বারা কোপ ও আঘাত দুই-ই দেওয়া চলিত।"

এই সময়ে গোলকণ্ডার রাজা ছিলেন আবু হোসেন। অদৃষ্টক্রমে ইনিই স্বাধীন গোলকুণ্ডার শেষ রাজা। পারস্যদেশীয় সুশিক্ষিত ভদ্র ও অমায়িক স্বভাব এই রাজা চারু শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।

---

(১) পূর্ব্ব উল্লিখিত পুস্তক দ্রষ্টব্য

প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত ব্যয়বহুল সর্ত্তে শান্তি রাক্ষা করিয়া সঙ্গীত ও শিল্পকলার চর্চ্চায় কাল কাটাইতে পারিলে তাঁহার কোন অভাব বোধ হইত না। বিমর্ষচিত্ত ও নির্জীব এই রাজা পারিবারিক জীবনে বড়ই অসুখী ছিলেন। একদিন শিকারে বাহির হইয়া বনের মধ্যে এক স্রোতস্বিনীর ধারে তিনি একটি পরমাসুন্দরী কৃষক যুবতীকে দেখিতে পান তিনি তাহার অনুসরণ করেন এবং কয়েকটি গ্রামের বিনিময়ে তিনি তাহাকে তাহার মাতাপিতার নিকট হইতে লইয়া আসেন। কিন্তু এই নবাগতার প্রতি অন্তঃপুরে এতটা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনে গোলকুণ্ডার রাজ-মহিষী ক্রোধান্ধ হইয়া সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। রাজধানী হইতে রাজার অনুপস্থিতির কালে তিনি এই কৃষক যুবতীকে একটি বৃক্ষের সহিত বাঁধিতে আদেশ দেন। তারপর ঐ রমণীর বস্ত্রে তেল ঢালিয়া উহাতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। রাণী এই দুর্ভাগা যুবতীর যন্ত্রণা-ভোগ দেখিতেছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রণয় প্রতিদ্বন্দীর মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিয়া তিনি খুব উল্লসিত হইবেন। কিন্তু তাহার ধারণা-শক্তি যথেষ্ট পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। কারণ যে দৃশ্য তিনি দেখিলেন তাহার বিভীষিকা রাণীর সমস্ত কল্পনা অতিক্রম করিয়া গেল এবং তিনি অনুশোচনায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন। মেয়েটির "ছটফটানি এত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে যে নৃশংসতম ব্যক্তিরও ঐ দৃশ্য দেখিয়া মনে করুণা বা ভীতির সৃষ্টি না হইয়া পারিত না।" রাণীর মস্তিষ্ক বিকৃতি হইল এবং "পরবর্ত্তী সমগ্র জীবনে তিনি সর্ব্বদাই থরথর করিয়া কাঁপিতেন এবং ঐ মুমূর্ষ কৃষক রমণীর মত ছটফট করিতেন।"

শিবাজী মারাঠা সৈন্যবাহিনীর চলাচলের জন্য গোলকুণ্ডা রাজ্যের মধ্য দিয়া পথ চাওয়াতে রাজা আবু হোসেন প্রথমতঃ খুব ভয় পাইলেন। (সারা ভারতবর্ষে মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যরা দুর্ব্ব্যবহারের জন্য যেরূপ কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল তাহাতে অবশ্য যথেষ্ট নিরুৎসাহ হওয়ার কারণ ছিল)। কিন্তু তিনি কেবল যে তাহার রাজ্যমধ্যে বিশাল মারাঠা সেনাবাহিনীর উপস্থিতির সম্ভাবনায় ভয় পাইয়াছিলেন তাহা নহে। মুঘলের চিরশত্রু মারাঠাদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার অভিযোগে মুঘল সাম্রাজ্যের সহিত ইহার পর কলহলিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল।

এই দ্বিতীয় কারণটি শিবাজীকেও বিবেচনা করিতে হইয়াছিল। (বাস্তবিক তিনি বলপ্রয়োগ করিয়া অতিসহজেই গোলকুণ্ডার রাজ্যের ভিতর দিয়া পথ করিয়া লইতে পারিতেন।) কিন্তু গোলকুণ্ডার রাজার নিকট হইতে সৈন্যদের জন্য অনুকূল পথপাওয়ার একটি সৌহার্দ্দের ইঙ্গিতই তখন বড় কথা ছিল না। আসল প্রয়োজন ছিল দক্ষিণ পূর্ব্ব উপকূলে পৌছিবার পর পশ্চাতে গোলকুণ্ডার মত রাজ্যের অনুকূল ও মিত্রতার মনোভাব। শিবাজীর এবং তাঁহার স্বীয় রাজ্যের মধ্যস্থলে কোন প্রতিকুল, অথবা এমনকি, দুর্ব্বল রাজশক্তি যদি ভয় পাইয়া মুঘলদিগের সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিত তবে উহা শিবাজীর বিজিত দেশসমূহের সহিত যোগরক্ষার পক্ষে নিতান্তই মারাত্মক হইত।

এই অভিযানে গোলকুণ্ডার রাজদরবারে নিযুক্ত শিবাজীর দূত হনুমন্তে তাঁহাকে খুব সাহায্য করেন। এই ব্রাহ্মণ দর্শনশাস্ত্রে খুব ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং দরবারি পারস্য ভাষায়ও তাঁহার সম্পূর্ণ দখল ছিল। শিবাজীর প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করার পূর্ব্বে হনুমন্তে গোলকুণ্ডার প্রধান মন্ত্রীর সহিত বেশ ভাব করিয়া লইলেন। ইহার নাম মাদন্না এবং ইনিও জাতিতে ব্রাহ্মণ। দুই পণ্ডিত ব্যক্তি একসঙ্গে বসিয়া দীর্ঘকাল সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের দুর্বোধ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা ও মতবিনিময় করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে অনতিবিলম্বে মধ্যেই মদান্না রাজা আবু হোসেনের নিকট মহারাষ্ট্রীয় রাজার প্রেরিত দূতের গুণাবলি কীর্ত্তন করেন। আবু হোসেনের নিকট পরিচিত হওয়ামাত্র হনুমন্তে অতি সুন্দর ফারসী ভাষায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। রাজা ইহাতে অতিশয় খুশি হইয়া হনুমন্তেকে পুনঃপুনঃ প্রাসাদে আসিতে নিমন্ত্রণ করেন।

গোলকুণ্ডার রাজার নিকট হইতে কোন বিশেষ প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে হনুমন্তে যতটা সচেষ্ট ছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিকতর চেষ্টিত ছিলেন শিবাজীর ন্যায় একজন অপরাজেয় এবং মনোমুগ্ধকারী বীরের বিরোধিতা করা যে একটা অলীক স্বপ্ন এবিষয়ে আবু হোসেনের মনকে সম্মোহিত করিতে। তিনি এই কাজে এত সহজেই কৃতকার্য্য হন যে শিবাজীকে সশরীরে দেখিবার জন্য আবু হোসেন

অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া শিবাজীর নিকট এই মর্ম্মে এক বার্ত্তা পাঠান যে তিনি নিজ রাজ্যের সীমান্তে গিয়া মারাঠা নেতাকে অভ্যর্থনা করিয়া এবং তাহার প্রতি রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া দুইজনে একসঙ্গে রাজধানীতে প্রবেশ করিবেন। শিবাজীও অতিশয় ভদ্র অথচ গভীর ব্যজস্তুতিপূর্ণ উত্তরে লিখিলেন, "আমি চিরদিন আপনাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় দেখিয়া আসিয়াছি। একজন কনিষ্ঠের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়া আপনি নিজেকে ছোট করিবেন না।" কিন্তু গোলকুণ্ডার প্রধান মন্ত্রী সীমান্ত পর্য্যন্ত গিয়া শিবাজীকে অভ্যর্থনা করেন এবং বিশাল মারাঠা সৈন্য বাহিনী হায়দরাবাদের দিকে অগ্রসর হয়। গোলকুণ্ডার রাজ দরবার তখন হায়দারাবাদে আসীন।" (১)

মারাঠা সৈন্যদিগের সুশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা সকলের বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষন করে। গোলকুণ্ডা রাজ্যে যাহাতে কোনরূপ লুণ্ঠন করা না হয় এবিষয়ে শিবাজী কঠোর নির্দ্দেশ দেন। দোকান-দারগণ স্বেচ্ছায় বিক্রয় করিলেই কেবল খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা হইত মারাঠারা যে সব গ্রামাঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিত উহার কোনরূপ ক্ষতি হইলে সৈন্যদিগকে যে শাস্তি পাইতে হইবে তাহার একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিয়া সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু দুই একটি ক্ষেত্রে ছাড়া শাস্তি দেওয়ার কোন ঘটনা ঘটে নাই। সত্তর হাজার গ্রাম্য অমার্জিত পার্ব্বত্য জাতীয় সৈন্যের বাহিনী একটা অরক্ষিত দেশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল। ঐ দেশের সম্পদ ও ধনরত্ন সম্বন্ধে কত কাহিনী শোনা যাইত। দেশের শাসক ছিলেন বিধর্ম্মী এবং তাহার ধর্ম্ম মারাঠারা ঘৃণার চোখে দেখিত। অথচ মারাঠা সৈন্যরা সর্ব্বত্র ঠিক ক্রমওয়েলের 'নিউমডেল' সমর বাহিনী মত শৃঙ্খলা ও আত্মকৃচ্ছ্রতা পালন

(১) মহামান্য নিজামের বর্ত্তমান রাজ্য গোলকুণ্ডা রাজ্যের উত্তরাধিকারী। গোলকুণ্ডা রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তুঘলক বংশের পতনের পরে অরাজকতার সময় বাহমনি রাজ্য যেমন বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়; গোলকুণ্ডা রাজ্যও অষ্টাদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন রাজ্যের অংশরূপে পরিণত হয়।

করিল। লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে শিবাজী অনেক অভিযানের নেতৃত্ব করিয়াছেন বটে, তবে ইংরাজেরা যে তাঁহাকে দস্যু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এই অখ্যাতি বাতিল করিতে শিবাজীর সৈন্যদিগের গোলকুণ্ডা অভিযানের আচরণ মনে রাখাই যথেষ্ট।

হায়দরাবাদে উন্মত্ত উৎসাহ সহ শিবাজীকে অভ্যর্থনা করা হইল। শহরের রাস্তাগুলিতে লাল এবং জাফরান রঙের সুরকি পুরু করিয়া ছড়াইয়া দিয়া সুশোভিত করা হয়। লাল রঙের চাঁদোয়া এক গৃহের ছাদ হইতে অন্যগৃহের ছাদপর্য্যন্ত টাঙাইয়া দেওয়া হয়। পথে চলিতে লোকের মনে হইত তাহারা যেন একের পর এক লাল ও পীতবর্ণের সুরঙ্গের ভিতর দিয়া চলিতেছে। প্রত্যেকটি গবাক্ষ দিয়া লোকেরা শিবাজীকে উপহার দেওয়ার জন্য সোনার পদ্ম হাতে করিয়া ঝুঁকিয়া পড়ে। মাঙ্গলিক অভ্যর্থনার প্রতীক স্বরূপ হিন্দু রমনীরা শিবাজীর মাথায় চারিদিকে প্রজ্বলিত প্রদীপ দোলাইতে লাগিল। স্থানীয় লোকের মনোভাব বুঝিয়া শিবাজী তাঁহার অভ্যস্ত সাধারণ পরিচ্ছদ ও বিলাসীতার প্রতি স্বাভাবিক উদাসীনতা সাময়িক ভাবে ত্যাগ করেন। শহরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি রেশম বস্ত্রের স্বর্ণ খচিত রাজবেশে সুসজ্জিত হন। সেনাপতিদিগকে স্বর্ণনির্ম্মিত কব্জির অলঙ্কার ও বক্ষত্রাণ এবং তরবারী উপহার দেন। তাহাদের পাগড়ি মনিমুক্তায় সাজাইয়া দেন। রাজধানীর সিংহাদ্বারে প্রবেশ করা মাত্র সমবেত জনতা উচ্চরবে আনন্দধ্বনি করিতে থাকে। শিবাজী দক্ষিণে ও বামে মোহর ও মনিমুক্তা বিতরণ করেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান নগরবাসীদিগকে সম্মানিত বেশভূষা উপহার দেওয়ার জন্য তাঁহার কোষাধ্যক্ষকে আদেশ দেন।

তবে শিবাজীর মুসলমানদিগের জাঁকজমকের অনুকরণের প্রচেষ্টা গোলকুণ্ডার অভিজাত সম্প্রদায়কে যে বিমুগ্ধ করিয়াছিল তাহা মনে হয়না, কারণ ইহাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবন বিজাপুর বা আগ্রার ওমরাহদের মতই আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। গোলকুণ্ডার অভিজাত পরিবারের কোন ভদ্রলোকই দুইটি হস্তী সম্মুখে না লইয়া চলিতেন না। হাতীর হাওদার উপরে পতাকা উড্ডীয়মান থাকিত, আর পঞ্চাষষাটজন অশ্বারোহী সৈন্য, ভেরীবাদক, বংশীবদক এবং বল্লমধারী ভৃত্য সঙ্গে চলিত।

ভৃত্যদের হাতে মাছি তাড়াইবার ব্যাজন থাকিত।(১) মরাহগণ রৌপ্য নির্ম্মিত এবং রঙ্গীন পালকিতে যাতায়াত করিত। "তাহাদের হাতে ফুল, মুখে হুক্কা এবং তাহাদের সাধারণ আচরণে অত্যন্ত অলসতা ও নৈতিক শিথিলতা প্রকাশ পাইত।" (২) শিবিকার চারিদিকে থাকিত উষ্ট্রের উপর অধিষ্ঠিত গায়কগণ।

এইরূপে আবু হোসানের প্রাসাদে এক অতি মনোরম কিন্তু ভয়ঙ্কর অতিথির আবির্ভাব হইল। প্রাসাদের অট্টালিকা অতি বৃহৎ। "দৈর্ঘ্যে ইহা তিন শত আশি পাদক্ষেপ অপেক্ষাও বেশী।" সিংহদ্বারের সম্মুখে স্তম্ভশ্রেনীপূর্ণ উচচ গাড়ীবারান্দার উপরে নহবৎখানা। "শহরে রাজার উপস্থিতিকালে ঐ স্থানে তাঁহার নিযুক্ত বাদকদল দিনের মধ্যে কয়েক বার যন্ত্রসঙ্গীত করিত।(৩) প্রাসাদের প্রতেকটি গ্যালরি ছিল জলের ফোয়ারায সুশোভিত এবং প্রত্যেক ঘরে নল দিয়া জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রাসাদের গায়ে রুচিবিরোধী এবং দৃষ্টি কটু "কাষ্ঠ নির্ম্মিত কতকগুলি দোকান ঘর" থাকায়, শিবাজীর আগমনের স্বল্পকাল পূর্ব্বে থেবেনো ঐ প্রাসাদ দেখিয়া উহার প্রকত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। উদ্যানগুলির সৌন্দর্য্যে তাঁহার নৈরাশ্য অনেক লাঘব করে। মরুভূমিবাসী পূর্ব্বপুরুষদিগের জল এবং ফুল, বৃক্ষ, ছায়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক উদানের অপূর্ব্ব সমনয়ে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির স্পৃহা মুসলমানেরা চিরকালই বজায় রাখিয়াছে। গোলকুণ্ডার প্রাসাদের উদ্যানশ্রেণীও তাহাদের এই সুনাম রক্ষা করিয়াছিল। উদ্যানের মধ্যে ছায়াতরু শোভিত দীর্ঘ পরিষ্কার ভ্রমন পথ। পাশে সুন্দর ফলের বাগান। উদ্যানের সীমান্তে তাল এবং সুপারি বৃক্ষের এত ঘন সমাবেশ যে উহার মধ্য দিয়া ক্ষীণ সূর্য্য কিরণ অতিকষ্টে প্রবেশ করে। ধারে ধারে শ্বেতবর্ণ পুষ্পরাজি। ইহাকে স্থানীয় লোকেরা ডেভিডের (David) ফুল বলে। উহা অনেকটা লবঙ্গ ফুলের মত দেখিতে।

---

(১) Thevenot
(২) Idem
(৩) Thevenot

শিবাজী প্রাসাদে আগমন করার পর নৃপতিদ্বয় পরস্পরকে আলিঙ্গন করিরয়া গোলকুণ্ডার রাজার সিংহাসনে পাশাপাশি উপবেশন করেন। তাঁহাদের চারিদিকে মশলার থালা এবং লম্বাগ্রীবাযুক্ত সোনার পিকদানি হস্তে ভৃত্যগণ দণ্ডায়মান। গোলকুণ্ডার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চুমকি বসান মস্লিন বস্ত্র ও সোনার তকমা পরিহিত পরিচারকবর্গ ময়ূরের পেখমে প্রস্তুত পাখায় ব্যজনে রত। মনিমুক্তা খচিত খাঁচা হইতে পাখীর সুমধুর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসে এবং লাল ও নীল রঙের অশ্বের লেজে স্বর্ণধূলি মিশাইয়া একটি শোভাযাত্রা তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়।

দুই নৃপতি কয়েকঘন্টা আলাপ আলোচনায় কাটাইলেন। শিবাজী তাঁহার ব্যক্তিত্ব দ্বারা স্বেচছায় এই পারস্যদেশীয় ভীরু রাজাকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। গোলকুণ্ডার রাজা এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলেন যে শিবাজী পার্ব্বত্যজাতীয় এক অসভ্য বর্ব্বর এবং ইস্লাম ধর্ম্মের ধ্বংস ও বিনাশ সাধনই হইল তাঁহার পরম আনন্দের কাজ। কিন্তু শিবাজীর শিষ্টাচার ও সৌজন্যে তিনি বিস্ময়ে একেবারে তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িলেন। গোলকুণ্ডাধিপতি তাঁহার বৃহৎ কিন্তু বিষাদময় চোখদুটি দিয়া বারবার শিবাজীর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন যে ঐ কমনীয় মূর্ত্তি এবং মনোমুগ্ধকর হাসির মধ্যে মুসলমানদিগের বিরচিত কাহিনীর কোন দানবীয় লক্ষণ পাওয়া যায় কিনা। হায়দরাবাদে তাঁহার অবস্থিতির জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রাসাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে শিবাজী গাত্রোত্থান করিলে আবু হোসেন তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করেন এবং তাঁহার বাহুতে রূপার চামচ দিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে গোলাপের আতর মাখাইয়া রাজার নিজহস্তে সুপারি ও এলাচ দিয়া প্রস্তুত একখিলি পান শিবাজীকে উপহার দেন।

কয়েকদিন ধরিয়া একাদিক্রমে ভোজ ও উৎসব চলিতে লাগিল। শিবাজী ও তাঁহার সেনাপতিদিগকে আবু হোসেন প্রতিদিন নানা প্রকারের মণি, জহরত, পোশাকাদি, এবং অশ্ব ও যুদ্ধে ব্যবহার্য্য হস্তী ইত্যাদি উপহার দান করেন। পশ্চিমঘাট হইতে আগত এই অমার্জিত পার্ব্বত্যলোক-গুলিকে জাঁক করিয়া নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া গোলকুণ্ডারাজ ছেলেমানুষের

মত আনন্দ বোধ করিতেন। রাজার সাহসিকতাপূর্ণ কার্য্যের কাহিনী দ্বারা শিবাজীর বীরত্বকে ছাপাইয়া দিতে না পারিলেও তিনি নানাবিধ বিলাসীতার দ্রব্যের সূক্ষ কারুকার্য্য দেখাইয়া এবং গোলকুণ্ডার সংস্কৃতির বর্ণনা করিয়া মহারাষ্ট্ররাজের বিস্ময় উৎপাদন করেন। তিনি শিবাজীকে লইয়া রাজধানীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন এবং সুন্দর সুন্দর মসজিদ, প্রাসাদ, পূর্ব্বপুরুষগণের সমাধিস্থান এবং সবুজরঙের গম্বুজযুক্ত কৃষ্ণপাথরে নির্ম্মিত অট্টালিকাদি তাঁহাকে দেখান। সমাধি সৌধমালার প্রত্যেকটির মধ্যে পাথরের শবাধার কার্পেটে মণ্ডিত এবং কবরোপরি স্মৃতিস্তম্ভ মূল্যবান স্যাটিন বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল। উপরে শ্বেত পুষ্পগুলি মেঝে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র কক্ষটি বহু প্রদীপে আলোকিত।(১)

শিবাজী একদিন যুদ্ধে ব্যবহৃত গোলকুণ্ডার শ্রেষ্ঠ হস্তীটির বৃহৎ আকৃতি এবং কারুকার্য্যময় সাজপোষাক ও আভরণ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন। আবু হোসেন তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা আপনাদের কি যুদ্ধের হাতী নাই?"

পশ্চাতে দণ্ডায়মান প্রহরীদিগের প্রতি তাকাইয়া শিবাজী বলেন, "ইহারাই আমার যুদ্ধ হস্তী।"

আবু হোসেন ইহা শুনিয়া তাচ্ছিল্যভরে হাসিয়া ফেলেন এবং তাঁহার ঐ শ্রেষ্ঠ হাতীটি লোকের মনে কিরূপ ভীতি সঞ্চার করে সে বিষয়ে নানারূপ গল্প বলিতে আরম্ভ করেন। ইয়েসাজি (Yesaji) নামক এক সর্দ্দার প্রহরীকে নির্দ্দেশ করিয়া শিবাজী বলেন, "এই লোকটি আপনার হস্তী অপেক্ষা অধিক বলবান, ইহা আপনি ইচ্ছা করিলেই টের পাইবেন।"

আবু হোসেন উত্তরে বলেন, "আচ্ছা, পরীক্ষা করা যাক। যুদ্ধ হস্তীর মাহুত তখন হাতীটির পশ্চাৎ দিকের শিকল খুলিয়া দেয় ও আস্তাবলের ডাণ্ডার আঘাতে উহাকে উত্তেজিত করে। মুক্ত তরবারী

(১) এই বর্ণনার বিষয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পারস্য ভাষায় রীডার মি সেডলের সংগৃহিত কুতব-শাহী চিত্রাঙ্কণ হইতে গৃহীত।

(২) Thevenot

হস্তে ইয়েসাজি হাতীটির দিকে অগ্রসর হয়। হস্তী গর্জন করিয়া তাহার প্রতি ধাওয়া করে। ইয়েসাজি পাশে একটু সরিয়া যায় এবং তরবারির এক আঘাতে হাতীর শুড় দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। বড় বড় সামরিক উপাধি ও শরীরে বর্ম্মপরিহিত থাকা সত্ত্বেও ইতিপূর্ব্বে রাজোদ্যানে নকল যুদ্ধ ব্যতীত এই হাতীর আর কোন বিপজনক অভিজ্ঞতা ছিল না। শুড় ছিন্ন হওয়ায় জানোয়ার এখন বেদনায় ভীষন চীৎকার ও আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দৌড়াইয়া পলায়ন করে। ইয়েসাজি শান্তভাবে এবং ধীর পদক্ষেপে শিবাজীর পশ্চাতে নিজের স্থানে ফিরিয়া আসে। লজ্জা পাইয়া আবু হোসেন শিবাজীর ও তাঁহার অনুচরদিগের নিমিত্ত শুধু নূতন উপঢৌকনের আদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি শিবাজীর অশ্বকেও মনি-জহরত যুক্ত একটি কণ্ঠহার উপহার দেন।

শিবাজী অবশ্য উপহার এবং ভোজউৎসবে মোহিত না হইয়া গোলকুণ্ডা রাজ্যের মিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ আরও নিঃসন্দেহ প্রমান চাহেন। মুঘল ও বিজাপুর শক্তি এক হইয়া যদি গোলকুণ্ডা আক্রমণ করে, তবে ঐ রাজ্যরক্ষার জন্য কর্ণাটের উপকুলে গোলকুণ্ডার সীমারেখার কিছু অদল বদল করার জন্য শিবাজী গোলকুণ্ডার বরকন্দাজ সেনাবাহিনী ব্যবহার করার ও বর্দ্ধিত হারে কর দাবী করেন। (গোলকুণ্ডার দরবার এই ভাতার পরিমান দৈনিক তিন হাজার হুনে (Hun) ধার্য্য করেন। কিন্তু মারাঠারা ইহাকে স্পষ্ট ভাষায় অধীনতার নিদর্শন স্বরূপ কর বলিয়া অভিহিত করেন।) দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনার পর এই সর্ত্ত উভয়-পক্ষে গৃহীত হইলে শিবাজী মার্চ্চ মাসে হায়দরাবাদ পরিত্যাগ করিয়া কর্নাটের অভিমুখে রওনা হন।

কৃষ্ণা নদী পার হইয়া তিনি তাঁহার সেনানায়কদিগকে আরও দক্ষিণ-দিকে চলিতে আদেশ করেন। তারপর হঠাৎ তিনি সকলের অগোচরে সমর বাহিনী হইতে সরিয়া পড়েন। হনুমন্তে নামক যে মারাঠা ব্রাহ্মণ রাজদূতরূপে গোলকুণ্ডায় বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল কেবলমাত্র তাহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি শ্রীশৈল নামক প্রসিদ্ধ শিবমন্দিরে উপস্থিত হন। সম্ভবতঃ হায়দরাবাদের প্রমোদ উৎসবের কৃত্রিম চাকচিক্যে তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেছিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সন্যাস জীবন গ্রহণের স্পৃহা তাঁহাকে

পুনরায় পাইয়া বসিল। বিশাল মন্দিরের অন্ধকারাচ্ছন্ন অভ্যন্তরে একাকী নতজানু হইয়া বসিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, আর এই বলিয়া বিলাপ করিতে থাকেন যে যদিও একাকী নীরবে ভগবানের উপাসনাতেই মাত্র তিনি তৃপ্তি লাভ করেন তথাপি তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে এবং যুদ্ধের শিবিরে জীবন যাপন করিতে হয়। উপবাস এবং উপাসনায় তিনি দশদিন মন্দিরে অতিবাহিত করেন। হনুমন্তে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সেন্য বাহিনীর সহিত মিলিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি শিবাজীকে নানা ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। সমগ্র কর্ণাটক প্রদেশ তাঁহার অসির সম্মুখে উন্মুক্ত; এদিকে মূল্যবান সময় নষ্ট হইতেছে। মর্ম্মভেদী অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে শিবাজী বলেন, "আমি যে কেবল এখানেই শান্তি বোধ করি।" তারপর তরবারি কোষোন্মুক্ত করিয়া তিনি আরও বলেন, "আমি যদি এখানে বাস করিতে না পারি, তবে অন্ততঃ পক্ষে যেন এখানেই আমার জীবন শেষ হয়।" এই বলিয়া তিনি তরবারির উপরে ঝুকিয়া পড়িতে চেষ্টা করেন। হাতে ধরিয়া হনুমন্তে তাঁহাকে নিরস্ত করেন। তিনি শিবাজীকে মনে রাখিতে বলেন যে এইরূপ কাজ করিলে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্য পড়িয়া থাকিবে, তাঁহার সৈন্যরা নেতৃত্ব-বিহীন হইবে, এবং যে কাজ তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন উহা অসমাপ্ত রহিয়া যাইবে।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শিবাজী মুহূর্ত্তকাল নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং পরে তরবারি খাপের মধ্যে পুরিলেন। ঐদিনই তিনি মন্দির পরিত্যাগ করেন। কিন্তু উহার পূর্ব্বের দশদিন মন্দিরে চুপি চুপি থাকিয়া যে পরম শান্তি উপভোগ করেন তাহা মনে করিয়া শৈবধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত মন্দিরের পূজারীদিগকে বহুধন সম্পদ উপহার-রূপে দান করেন।

অনন্তপুরে শিবাজী মারাঠাসৈন্যদিগের সহিত পুনরায় যোগদান করেন। সৈন্যরা অপ্রতিহত গতিতে সমগ্র কর্ণাট প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে। বিজা-পুরের কেন্দ্রীয় শাসকগণ শিবাজীর অগ্রগতিতে বাধা দিতে সাহসী হন নাই, এবং এখনও পূর্ব্ব উপকূলে দুর্গ এবং শহরগুলির উপর শিবাজীর আক্রমণে তাহারা প্রকাশ্যে কোন বাধা দিলেন না। কিন্তু বিজাপুরের

গভর্ণমেন্ট অপেক্ষা দৃঢ়মনোভাবাপন্ন কয়েক দল বিজাপুরী সৈন্য ও কয়েকটি সেনাপতি মারাঠাদের প্রতিরোধ করে, কিন্তু উহা বেশী দিন টিকিল না। বিশাল জিঞ্জি দুর্গ মারাঠারা সহসা আক্রমণ করিয়া অধিকার করে। মারাঠাদের অধীনস্থ এই দুর্গ পরে মুঘলেরা আক্রমণ করে এবং তখন তাহারা ঐ দুর্গ দুর্ভেদ্য মনে করিয়া আক্রমণ প্রতিহত করিতে বাধ্য হয়। এই সময় যেসুইট মিশনারীগণ ঐ অঞ্চলে বেদান্তের পরমেশ্বরবাদ ও খৃষ্টিয় দর্শনের মধ্যে সমন্বয়তা প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা এই কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া উত্তেজিতভাবে লেখেন, বজ্র নিপাতের মত শিবাজী ঐ স্থানে আবির্ভূত হন এবং প্রথম আক্রমনেই ইহা অধিকার করেন।" কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি "নূতন প্রাচীর, পরিখা ও বুরুজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন এবং এই সব নির্র্মাণ কার্য্য এমন সূক্ষ্ম ও সম্পূর্ণরূপে সম্পাদনক করেন যে এইরূপ কাজ করিতে পারিলে ইউরোপীয় সামরিক স্থাপত্য শিল্পীদিগেরও লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ থাকিত না।"

একদল সৈন্য ভেলোরদুর্গ অবরোধ করার জন্য নিযুক্ত করিয়া শিবাজী দাক্ষিণের দিকে অগ্রসর হন। ভেলোর দুর্গ প্রতিরোধ করিতেছিল এক দঢ় প্রতিজ্ঞ আফগান, সৈন্যদল। নগর দুর্গের চারিদিকে পরিখায় বহু হিংস্র কুমীর বিচরণ করিত। তাহারও এই দুর্গ প্রতিরোধ সাহায্য করে। জুনমাসে শিবাজী এই প্রদেশের বিজাপুরী শাসন কর্ত্তাকে পিছন হইতে আক্রমণ করেন। এই গভর্ণর মারাঠাদিগের অগ্রগমনের সংবাদ পাইয়াই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির মত পলাইয়া চলিতেছিলেন। কিন্তু সহসা শিবাজীর আক্রমণে বিভ্রান্ত হইয়া তিনি মাত্র একশত অনুচর সহ গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার অন্যান্য সমস্ত সৈন্য মারাঠাদের নিকট বন্দী হয়। তাঁহার যুদ্ধে ব্যবহার্য্য অশ্ব এবং কামান প্রভৃতি মারাঠারা বাজেয়াপ্ত করে। শিবাজী তাঞ্জোরের চৌহদ্দির দশ মাইলের মধ্যে পৌছিলে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যাঙ্কাজী শিবাজীর এত দ্রুত অগ্রগতিতে আতঙ্কিত হইয়া ভীতচিত্তে সন্ধির প্রস্তাব করেন। শিবাজী তাঁহাকে শিবিরে আমন্ত্রণ করেন; কিন্তু তাঁহার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া শিবাজী তাঁহার পক্ষের পাঁচজন লোককে জামিনরূপে দাবি করেন।

ইহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি মাদ্রাজে ইংরাজ বণিকদিগের নিকট হইতে "কিছু যুদ্ধের মাল মশলা" কিনিবার প্রস্তাব করিয়া এক চিঠি লেখেন।

ব্যাঙ্কোজী ছিলেন অত্যন্ত বদমেজাজী ও উদ্ধত প্রকৃতির। এক সপ্তাহ ব্যাপী কান্নাকাটি ও বাদানুবাদ করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতার শিবির হইতে পলায়ন করেন এবং মুঘল বাদশাহ ও অন্যান্য ভারতীয় নৃপতি-বৃন্দের নিকট তাঁহার দাবি রক্ষার কাজে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া উদ্ভট আবেদন পত্র পাঠাইতে লাগিলেন। ব্যাঙ্কোজীর এই প্রকার শত্রুতা-মূলক কাজের প্রতিশোধ স্বরূপ তাহার প্রতিভূদিগের নিকট হইতে শিবাজী ন্যায্য খেসারত দাবি করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি শুধু একটু ঘাড় নাড়িয়া বলেন, "সে ঐভাবে পলাইয়া গেল কেন? সে একেবারেই অর্ব্বাচীন যুবক এবং ছেলে মানুষের মত ব্যবহার করিতেছে।" তারপর কম্পিত কলেবর প্রতিভূদিগের প্রতি তাকাইয়া তিনি উহাদিগকে নানা প্রকার উপহার ও সম্মানসূচক পোশা-কাদি দিয়া বিদায় দেন।

পরের বৎসর সম্পূর্ণ সময় ব্যাঙ্কোজী কর্ণাটের উপকূলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ঘুরাফিরা করে। কিন্তু শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মত তাহার সৈন্য সামন্ত কিছুই ছিল না। বাস্তবিক তিনি যে সব এলাকা পৈতৃক সম্পত্তিরূপে পাইয়াছিলেন উহা অনায়াসে দক্ষিণ প্রদেশে মারাঠাদের বিজিত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কোজী আত্মসমর্পন করিলে শিবাজী তাঁহাকে তাঞ্জোর শহর ও উহার সন্নিকটস্থ কিছু জমিদারী দিয়া তাঁহাকে কাজে নিযুক্ত রাখেন। কিন্তু শিবাজী চতুর ব্রাহ্মণ হনুমান্তেকে ব্যাঙ্কোজীর মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর চাপাইয়া দেন। বাস্তবিক শিবাজীর মনোনীত এই মন্ত্রীই তাঞ্জোরের প্রকৃত শাসন কর্ত্তা হইলেন। পরাজিত ব্যাঙ্কোজী তাঁহার পদমর্য্যাদা অনুযায়ী আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশ ধর্ম্মকর্ম্মে মন দেন ও ফকীরের মত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে কেবল কর্ণাটকই নহে, উহারও দক্ষিণে মহীশূর পর্য্যন্ত শিবাজীর অধিকৃত হয়। বিজিত প্রদেশ সমূহ সংরক্ষনের জন্য

ওখানে যথেষ্ট পরিমানে সৈন্য সামন্ত রাখিয়া অপর্য্যাপ্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ শিবাজী ভারতের পশ্চিমদিকে তাঁহার রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ বৎসর জানুয়ারী মাসে বোম্বাই হইতে মিঃ গ্যারী লেখেন, "সীজারের স্পেন বিজয়ের সাফল্যের ন্যায়, শিবাজী ঐ অঞ্চলে আসিয়া ওখান হইতে সোনা, হীরা চুনি, পান্না, প্রবাল প্রভৃতি এত বিশাল পরিমানে ঐশ্বর্য্য লইয়া যান যে উহাতে তাহার সামরিক শক্তি প্রচুর বৃদ্ধি পায় এবং উহা তঁহাকে নব নব বিজয় অভিযানের কল্পনা করিতে উদ্বুদ্ধ করে।"

শিবাজীর এই বিজয় এতই অনায়াসলব্ধ হইয়াছিল যে এই অভিযানের সমূহ বাধাবিঘ্নের এবং যত কৌশলে ও দক্ষতার সহিত তিনি উহা অতিক্রম করেন ইহার প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করা কঠিন। বাস্তবিক সমগ্র অভিযানটি অতি সহজে সম্পন্ন হইয়াছিল এইরূপ মনোভাব পোষণ করাও বিচিত্র নয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে এই অভিযান চলে শিবাজীর কর্ম্মস্থল হইতে ৭০০শত মাইল দূরে দুর্গম্য ও অপরিচিত দেশে। এইরূপ যুদ্ধে সত্বর চমকপ্রদ জয়লাভ করা অতি প্রয়োজন কারণ সাময়িক ভাবেও কোনরকম বিপর্য্যয় বা পরাজয় ঘটিলেই মুঘলেরা মহারাষ্ট্রের উত্তর সীমান্ত হইতে আক্রমণ করিতে প্রলুব্ধ হইত এবং বিজাপুরের সুলতান ও পুনরায় শেষবারের মত একবার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। এইরূপ ঘটনায় গোলকুণ্ডার সুলতান যে তাঁহার নূতন মিত্র শিবাজীর অপরাজেয়তায় উজ্জ্বল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন উহা মলিন হইয়া পড়িত। প্রত্যেকটি অভিযানের পূর্ব্বে শিবাজী সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে সমালোচনা করিয়া তাঁহার পক্ষে কত রকমের আশঙ্কার সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে এইসব বিবেচনা করিতেন। মুঘলেরা যদি মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা মুঘলের সামরিক সাহায্য ও অর্থ লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করে এবং তাহাদের রাজ্যের মধ্য দিয়া শিবাজীকে গৃহমুখে যাইতে না দেয়—এইরূপ কত রকমের আতঙ্ক তাঁহার মনে উদিত হইত। কিন্তু এই প্রকারের আশঙ্কামূলক চিন্তায় শিবাজী নূতন উদ্যমে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপ অবস্থার কথা চিন্তা করা সত্ত্বেও শিবাজী কখনও মনের অস্থিরতা প্রকাশ করেন

নাই, এবং এই সুদীর্ঘ অভিযানের ক্লান্তি কখনও বাহিরে প্রকট হয় নাই। এমনকি যখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতরূপে একটি নগর দুর্গ ছাব্বিশ দিন যাবত তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করিয়া টিকিয়া থাকে তখনও তাহার মানসিক কোনরূপ চাঞ্চল্য হয় নাই। এই দুর্গের সৈন্যধ্যক্ষ মারাঠাদের প্রথম আক্রমণেই নিহত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পত্নীর নেতৃত্বে সৈন্যরা যুদ্ধ চালাইতে থাকে। এই দুর্গ শেষ পর্য্যন্ত বিজিত হইলে ঐ বীর মহিলাকে শিবাজী তাঁহার স্বাভাবিক সৌজন্যের সহিত সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুক্তিদান করেন।

আঠার মাস ব্যাপী অভিযানের পর কর্ণাটক ও মহীশূর বিজয় সমাপ্ত হয়। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিজাপুর রাজ্যের যে অংশ বিজিত দেশগুলি এবং মারাঠা রাজ্যের সহিত সংযুক্ত ছিল উহাও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন।

শিবাজীর এই অভিযানের সাফল্য শুধু নূতন দেশ জয় দ্বারা বিচার্য্য নয়, ইহার আসল গুরুত্ব হইল ভবিষ্যৎ যুদ্ধে এই সব বিজিত প্রদেশের কৌশলী ও সামরিক ব্যবহারের সুবিধা লাভ। মুঘলেরা যদি বহু বিস্তৃত কোন অভিযান চালনা করে তবে মারাঠাদের পক্ষে কর্ণাটক হইবে প্রতিরোধের ও আত্মরক্ষার শেষ সীমান্ত। এথেন্স বাসীরা যেমন তাহাদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া এক দ্বীপে ও জাহাজে আশ্রয় লইয়াছিল, সেইরূপ মারাঠারাও পূর্ব্ব উপকূলে সুদূরে অবস্থিত দুর্গাদিতে প্রয়োজন বোধে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে। মহারাষ্ট্র দেশ বশ করিবার জন্য একবার যুদ্ধ করিয়া পরে আবার নূতন দেশ আক্রমণ করিয়া ৭০০ মাইল ব্যাপী এলাকার মধ্যে শত্রুপূর্ণ মহারাষ্ট্রের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রচেষ্টা বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষেও কষ্টকর।

এই অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় শিবাজী এই সব বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনাবলিতে শিবাজীর অসাধারণ সামরিক দূরদৃষ্টির সমর্থন পাওয়া যায়। শিবাজীর মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তাঁহার জীবনের শেষ অভিযানে সাম্রাজ্যের সমস্ত ধনবল ও লোকবল দিয়া মারাঠাশক্তিকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করেন। মুঘল সৈন্যগণ তাহাদের সম্মুখের সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে। প্রবল বন্যার মুখে বাঁধের

ন্যায় বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য বিধ্বস্ত হইল। আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া হইয়া বাধা দেওয়া সত্ত্বেও একে একে মারাঠা দুর্গগুলি মুঘলদের অধিকৃত হয়। অবশেষে মুঘলেরা জিঞ্জি দুর্গে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেখানে শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম মারাঠা প্রতিরোধের প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে। যেসুইট মিশনারীগণ শিবাজীর জিঞ্জিদুর্গের নির্ম্মাণকার্য্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই দুর্গের রোমাঞ্চকর অবরোধে তাঁহাদের প্রশংসার তাৎপর্য্য প্রমানিত হয়। মুঘলদিগের আক্রমন ব্যর্থ হইল। বিশাল মুঘল সৈন্যবাহিনী অনাহারে ও রোগে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল। বয়সের চাপে ও সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আওরঙ্গজেব টলিতে টলিতে কোনওরূপে উত্তরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চতুর্দিকে বিদ্রোহের গর্জ্জন ও সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ার লক্ষণ প্রকটিত হয়। ব্যর্থ-প্রয়াস আওরঙ্গজেব দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পরম মর্ম্মযন্ত্রণা ও দুর্দ্দশার মধ্যে জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার বালিশের নীচে একখানি দলিল পাওয়া যায়। উহার শেষ অংশে লিখিত ছিল, "কখনও নিজের পুত্রদিগকে বিশ্বাস করিও না, আর সর্ব্বদা এই প্রবাদ বাক্য মনে রাখিও যে "রাজার কথা নিস্ফল।"

আওরঙ্গজেবের মৃতদেহ জনহীন রাস্তা দিয়া সমাধি-স্থানে দ্রুত লইয়া যাওয়া হইল। প্রজাদের মধ্যে কেহই তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিল না। রাঞ্জা নামক একটি ছোট শহরে অতি সাধারণভাবে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়। একথা অবশ্য বলা প্রয়োজন যে তখনও একটি লোক ছিল যে আওরঙ্গজেবের বহুপূর্ব্বের এক সহৃদয় কাজের কথা স্মরণ করে। ইনি শিবাজীর পৌত্র এবং মারাঠাদের তদানীন্তন রাজা। রাজকীয় অনুষ্ঠানাদির নিয়মমত তিনি আওরঙ্গজেবের সমাধিস্থানে আসিয়া প্রার্থনা করেন। মারাঠা যুবকের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করার জন্য জিনাত্-উন-নিসার কাতর অনুরোধ রক্ষা করায় আওরঙ্গজেব যে উদার্য্য দেখাইয়াছিলেন উহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করাই ছিল মারাঠারাজের সমাধিস্থানে আসার উদ্দেশ্য।

দুর্গাদি অবরোধে রত সামান্য এক সৈন্যদল হইতে মারাঠারা এখন ভারতবর্ষ বৃহত্তম সামরিক শক্তিতে পরিণত হইল। আওরঙ্গজেবের

মৃত্যুর পর নামে মাত্র মুঘল বাদশাহের অস্তিত্ব রহিল। মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যদল অবাধে দিল্লীর রাজপথে বিচরণ করিত; আর মারাঠা প্রহরীরা বাদ্শাহের প্রাসাদের বারান্দায় তাল রাখিয়া ধীর পদক্ষেপে পাহারা দিত। মারাঠা ওডোসারের (Odoacer) কবল হইতে রোমুলাস অগস্টুলাসের (Romulus Augustulus) অপেক্ষাও হীনতর অবস্থা হইতে দিল্লীর বাদশাহ অবশেষে ইংরাজদিগের হাতেই উদ্ধার লাভ করেন। বাদশাহের জীবন তখন নিতান্ত নিঃসঙ্গ। বৃদ্ধ দিল্লীশ্বর কম্পিত কলেবরে ছিন্ন চাঁদোয়ার তলায় আসীন। তৈমুরলঙ্গের বংশধর-রূপে তাঁহাকে তখন চিনিতে পারাও কষ্টকর।

একবিংশতি অধ্যায়

কর্ণাট অভিযানের সাফল্যে শিবাজী যে আনন্দ উপভোগ করিলেন তাহা শীঘ্রই পারিবারিক অশান্তিতে মলিন হইয়া গেল।

তাঁহার রায়গড়ে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্ঞী সয়িরাবাই তাঁহার পুত্র রাজারামকে শিবাজীর উত্তরাধিকারী করার জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। শম্ভুজীর চরিত্রে অস্থিরতা ও অসংযমতার প্রতি দোষারূপ করিয়া তিনি যে সব ইঙ্গিত করেন অদৃষ্টক্রমে এক ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত ঘৃণিত ও অখ্যাতিকর যোগাযোগে এই সময় শম্ভুজীর চরিত্রের ঐসব ত্রুটি বিচ্যুতি খুব প্রকট হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠপুত্রের গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়া শিবাজী তাহাকে পানহালা দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। চিরকাল রাজপ্রাসাদে লালিত পালিত শম্ভুজী পিতার কঠোর শ্রমশীলতা বা তাহার প্রজাদিগের সরল জীবন যাপন পদ্ধতি কিছুই পছন্দ করিতেন না। আওরঙ্গাবাদে মুঘল দরবারে তিনি দেখিতে পান যে ওখানকার সৈন্যাধ্যক্ষেরা তাঁহার পিতার অপেক্ষা অনেক জমকাল বেশভূষা পরিধান করিতেন ও তাঁহার অপেক্ষা অনেক্ বেশী আরামে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার পিতা নিজকে রাজা বলিয়া অভিহিত করিতেন বটে কিন্তু মুঘল ওমরাহদের অন্তঃপুরের বিলাসীতা ও অজস্র দাসদাসীর তুলনায় তাঁহার পিতৃগৃহের নিরস শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের তারতম্য বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিত। শম্ভুজী

দিল্লীর দরবারের ওমারাহদের মত পোশাক পড়িতে আরম্ভ করেন। শ্বেতবর্ণের মস্লিন, বস্ত্র ভাঁজে ভাঁজে শক্ত ইস্ত্রি করিয়া উহা এরূপ স্বচ্ছ করা হইত যে ভিতরে তাঁহার সুগঠিত দেহের সঙ্গে আঁটা কিংখাবের পরিচ্ছদও উহার ভিতর দিয়া দেখা যাইত। ফুলের কাজ করা সিল্কের শাল ও রত্নরাজি বিরাজিত পাগড়ি তাঁহার অঙ্গে শোভা পাইত। মুঘল রাজপুরুষদের অনুকরণে তিনি তাঁহার পুরু নাকের ডগায় একটি ফুল ধরিয়া রাখিতেন, আর তাঁহার বৃহৎ চক্ষুদ্বয় দিয়া উদাস দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাইতেন। তাঁহার চোখে শিবাজীর সুদর্শন চক্ষুর দীপ্তি ছিল না। উহাতে বরং তাঁহার মাতার স্বপ্নাতুল উদাস চোখের আভাস পাওয়া যাইত।(১) কিন্তু তাঁহার চরিত্রে ইন্দ্রিয় ভোগবাসনার স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল, যদিও তাঁহার মধ্যে সদগুনাবলীর আবেগময় উচ্ছ্বাসও কদাচিৎ পরিলক্ষিত হইত।

শম্ভুজী যে তাঁহার গ্রেপ্তার ও কারাবাস ধীরভাবে সহ্য করিবেন ইহার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তিনি গোপনে মুঘল সেনাপতি দিলির খাঁর নিকট এক চিঠি দেন। (১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের অভিযানের সময় ইনি ছিলেন জয়সিংহের অধীনস্থ সেনাপতি। ইনি অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির ও বদমেজাজী ছিলেন। সন্ধিতে শিবাজী কতকগুলি অনুকূল সর্ত্ত লাভ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া ইনি ক্রোধে দাঁত দিয়া বাহুর মাংস কামড়াইয়া ছিড়েন।) দিলির খাঁয়ের নিকট হইতে সহানুভূতিপূর্ণ উত্তর পাইয়া শম্ভুজী পানহালা দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া মুঘলদিগের অধীনস্থ এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। দিলির খাঁ তাঁহাকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিয়া সম্মানসূচক পরিচ্ছদ উপহার দেন ও তাঁহাকে সাত হাজারী মনসবদারের পদে নিযুক্ত করার প্রস্তাব করেন। শম্ভুজীকে মারাঠাদের রাজা, বলিয়া স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়া দিলির খাঁ বাদশাহের নিকট এক চিঠি লেখেন। তিনি মনে আশা পোষণ করেন যে ইহাতে মারাঠারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া যাইবে।

এই আশা সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ শিবাজীর

---

(১) Details from miniatures in the Parasnis collection.

প্রতিষ্ঠিত মারাঠা জাতি তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত, আর এদিকে শম্ভুজীর অনুগামী কেহ ছিল না বলিলেই চলে। তথাপি আপাতঃ দৃষ্টিতে দিলির খাঁর প্রস্তাব যে স্বাভাবিক ছিল ইহা স্বীকার্য্য। সাধারণতঃ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ সীমান্তদেশগুলির সম্বন্ধে এইরূপ পদ্ধতি ও যুক্তি অবলম্বন করে। কিন্তু নিজের স্বভাব অনুযায়ী আওরঙ্গজেব তাঁহার সেনাপতির প্রস্তাব সন্দেহের চোখে দেখেন। তিনি মনে মনে প্রশ্ন করেন যে শম্ভুজী পিতার সহিত আগ্রায় আসিয়াছিলেন এবং পিতার ন্যায় পলায়ন করিয়াছিলেন অথচ তাঁহার স্বার্থ রক্ষায় দিলির খাঁ এত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন? সুতরাং আওরঙ্গজেব শম্ভুজীকে গ্রেপ্তার করিয়া বন্দীর ন্যায় দিল্লীতে আনিতে দিলির খাঁকে আদেশ করেন। যে মারাঠা রাজপুত্রকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া আতিথ্য দান করিয়াছেন তাঁহাকে দীর্ঘকাল সন্দেহ ও অস্থির অবস্থায় রাখিয়া অবশেষে মৃত্যুর সম্মুখীন করিবেন, অথবা শম্ভুজী দ্বিতীয়বার পলায়ন করিলে দিলির খাঁ নিজে সম্রাটের বিরাগভাজন হইবেন—এই সব চিন্তা করিয়া দিলির খাঁ শম্ভুজীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বাহিরে নানারূপ আড়ম্বর করার ভান করেন এবং কারাবাসের অধ্যক্ষ যে ভাবে কয়েদীর সঙ্গে ব্যবহার করে এইভাবে শম্ভুজীর সহিত অপমানসূচক কথাবার্ত্তা বলেন। ব্যাপার বুঝিয়া শম্ভুজী পলায়ন করিয়া একেবারে পিতার নিকট উপস্থিত হন। কাজেই দিলির খাঁ ওজর দেখান যে শম্ভুজী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া বন্দীত্ব এড়াইবার জন্য সময়মত পলায়ন করিয়াছেন। শিবাজী কোনরূপ তিরস্কার না করিয়া পুত্রকে ফিরাইয়া লহেন এবং তঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত সস্নেহে কথাবার্ত্তা বলেন। কিন্তু তিনি জ্যৈষ্ঠপুত্রের মর্য্যাদা অনুযায়ী শম্ভুজীকে কোন সরকারী পদ দিলেন না। দরবারে হাজীর থাকার জন্যও শম্ভুজী কোন অনুমতি পাইলেন না।

পিতাপুত্রের মনোমালিন্য কখনও তিরোহিত হয় নাই। কারণ শিবাজী যখন মৃত্যুশয্যায় তখনও শম্ভুজীকে পিতার আকস্মিক পীড়ার সংবাদ যথা সময়ে দেওয়া হয় নাই। পিতার অসুখের সংবাদ পাওয়ামাত্র শম্ভুজী দ্রুততম উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া পানহাল. হইতে রায়গড়ের অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে বিন্দুমাত্র বিশ্রাম না করিয়া ভারতীয়

গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিন ও শ্বাসরুদ্ধকারী রাত্রি অবিরত ছুটিয়া পার্ব্বত্য রায়গড় দুর্গে উপস্থিত হওয়া মাত্র শুনিতে পান যে পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ উষ্ট্রটির দিকে ফিরিয়া উহার মস্তক কাটিয়া ফেলেন। তারপর পিতার মৃত্যুসময়ে উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার হতাশা ও শোক নাটকীয় ভাবে প্রদর্শন করার চিহ্নস্বরূপ তিনি মস্তকহীন উষ্ট্রের একটি শিলামূর্ত্তি ঐস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার আদেশ দেন। এই স্মৃতিস্তম্ভ খুব সুবুদ্ধির পরিচায়ক না হইলেও উহা এখনও দণ্ডায়মান আছে।

পিতৃচরিত্র হইতে শম্ভুজীর চরিত্র শোচনীয়রূপে বিপরীত হইলেও তাঁহার অতিভয়ঙ্কর মৃত্যু ও ধর্ম্মের প্রতি একনিষ্ঠা বিবেচনা করিয়া মারাঠারা পিতার প্রতি তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করিয়াছে। বাদশাহ তাঁহকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হুকুম দেন। তিনি ইহা অস্বীকার করিলে তাঁহাকে জোর করিয়া সৈন্যশ্রেনীর মধ্যে দৌড় করান হয়। ঐ সময় সৈন্যরা তাঁহার উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে। ছিন্ন বস্ত্র ও রক্তাক্ত শরীরে তাঁহাকে বাদশাহের সম্মুখে আনা হইলে তখনও তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণে স্বক্বিত হইলেন না। তাঁহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিয়া পুনরায় তাঁহাকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বলা হয়। তিনি তখন লিখিবার জন্য কাগজ কলম চাহেন ও লেখেন, "সম্রাট তাঁহার কন্যাকে আমার সহিত বিবাহ দিয়া আমাকে ঘুষ দিলেও আমি ধর্ম্মত্যাগ করিব না।" ফলে তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হয়। বাদশাহের প্রতিহিংসাপরায়ণতা শম্ভুজীকে অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সাহায্য করিয়াছে।

জীবনের শেষ বৎসরে শিবাজী বিজাপুরের প্রতিরক্ষকরূপে এক নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

সতত দলগত কলহ এবং অশান্তি ছিল এই দুর্ভাগা নগরীর বৈশিষ্ট। সুলতান নাবালক। যে দৃঢ়-চরিত্রা রাণী শিবাজীর বিরুদ্ধে আফজলখাঁকে প্রেরণ করেন তাঁহার সহিত তুলনায় বর্ত্তমান রাজমাতা ছিলেন একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁহার পুত্র পর্য্যন্ত তাঁহার অশোভন চরিত্রে অসন্তোষ ও আপত্তি প্রকাশ করিত। বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ তিনি ওলন্দাজ

সৈন্যদিগের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাহাদের সহিত বাণী ক্যারোলীনের (Caroline) অপেক্ষাও অধিকতর প্রকাশ্যে আববোপসাগরে নৌবিহারে প্রমোদ উপভোগ করিতেন। (১) বিজাপুরের জনৈক রাজকন্যার সহিত আওরঙ্গজেবের এক পুত্রের বিবাহ দেওয়া হইবে এইরূপ একটি স্বীকৃতির অভিযোগের ফলে বিজাপুর রাজ্য এবং মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দিলির খাঁ বিজাপুবেব দিকে অগ্রসর হইয়া রাজধানী অবরোধ করেন এবং নগর প্রাচীবের বাহিরে সমগ্র এলাকা ধ্বংস ও বিধ্বস্ত কবেন। বাদশাহের পদমর্য্যাদা এবং জিদ রক্ষার জন্য মুসলমান অধিকৃত ভারতবর্ষ খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়া যায় এবং ইহার ফলে মারাঠাদিগের আধিপত্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

দেহের চর্ম্ম কাটিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে লাগাইবার পরীক্ষা-কার্য্যে মুঘল অস্ত্রচিকিৎসকগণ যে নৈপুন্য প্রদর্শন করেন তাহা এই যুদ্ধের একটি বৈশিষ্ট্য। বিজাপুব বাসীরা ধৃত মুঘলদিগেব নাক কাটিয়া দেয়। মুঘল সামরিক বিভাগের কয়েকজন ডাক্তাব আহত ব্যক্তির ললাট হইতে চামড়া কাটিয়া উহার সাহায্যে কাটা নাক পুনরায় যথাস্থানে জুড়িয়া দেয়। মানুচিচ লিখিয়াছেন, "আমি এইরূপ নাক সংযুক্ত অনেক লোককে দেখিয়াছি। নাক না থাকিলে তাহাদিগকে যেরূপ অঙ্গহীন বলিয়া মনে হইত ইহাতে ততটা খারাপ মনে হয়না। কিন্তু তাহাদের ভুরুর দুইদিকে ক্ষতের দাগ দেখা যাইত।"

এই যুদ্ধে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং বিজাপুরীরা ক্রমশঃ হতাশ হইতে থাকে। অবশেষে বিজাপুরের নাবালক সুলতানের অভিভাবক শিবাজীর নিকট সাহায্যের নিমিত্ত আবেদন করেন। যাহাকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও "অমানুষিক কসাই" বলিয়া অভিহিত করা হইত তাঁহার নিকট যে চিঠি লেখা হয় তাহার করুণ সুর বড় মর্ম্মন্তুদ। সুলতানের অভিভাবক লেখেন, "আপনি এই রাজ্যের অবস্থা সম্যক অবগত আছেন। আমাদের সৈন্য নাই, অর্থ নাই, এবং সাহায্য করিতে কোন মিত্রও নাই। আমাদের শত্রু অগণিত এবং তাহারা যুদ্ধ লিপ্সু। ...

(১) Bernier

আপনি আমাদিগকে সাহায্য না করিলে আমরা নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারিব না। আপনি আমাদের দিকে একবার তাকান। আমাদের কি কর্ত্তব্য তাহা আমাদিগকে বলুন, আমরা আপনার কথামত চলিব।"

শিবাজী প্রথমতঃ দাবি করেন যে দক্ষিণভারতে তাঁহার সমস্ত বিজিত দেশ সমূহে এবং বিজাপুর রাজ্যের যে সব অঞ্চল তিনি বলপূর্ব্বক দখল করিয়াছেন বিজাপুর কর্ত্তৃপক্ষকে উহার উপর শিবাজীর অধিকার মানিয়া লইতে হইবে। বিজাপুর সরকার এই সর্ত্তে সম্মত হওয়ার পরে শিবাজী তাঁহার দুইটি সেনাপতিকে বিজাপুরের পক্ষে যুদ্ধে সাহায্য করিতে পাঠান তাঁহারা প্রথমেই দিলির খাঁয়ের সাহায্যের জন্য যে নূতন মুঘল সৈন্যদল আসিতেছিল তাহাদিগকে পরাজিত করেন। তারপর তাহারা দিলির খাঁর অবরোধকারী সৈন্যদিগকে বিজাপুরের প্রাচীর হইতে অপসারিত করিয়া তাহাদিগকে মুঘল এলাকায় হটাইয়া দেয়। জয়সিংহের অধীনস্থ সেনাপতি হিসাবে দিলির খাঁ জয়সিংহের হাতে শিবাজীর পরাজয়ের সাক্ষী ছিলেন। এখন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধানতম সেনাপতি হিসাবে তিনি শিবাজীর অধীনস্থ একজন সেনাপতির নিকট পরাজিত হন। মারাঠাদের মুঘল-ভীতির পূর্ব্বতন মনোভাবের যে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা একটি উদাহরণ হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। শিবাজীর একজন সেনাপতিকে দিলির খাঁয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সৈন্য চালনা করিতে বলা মাত্র তিনি খুশি হইয়া জবাব দেন, "আমি এক্ষুনি যাইয়া দিলির খাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দিব।"

প্রকৃতপক্ষে বিজাপুর ও এখন গোলকুণ্ডার ন্যায় মারাঠাদের মুখাপেক্ষী ও অধীনস্থ রাজ্যে পরিণত হইল। কিন্তু বিজাপুরের জনসাধারণ (শাসন কর্ত্তৃপক্ষ বাদে) শিবাজীকে অধুনাতম বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তাহাদের মুক্তিদাতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। যে বিজাপুর শহরে একদিন গ্রাম্য নিঃসঙ্গ বালক শিবাজী সন্দিগ্ধ আবহাওয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই বিজাপুর শহরে যখন তিনি সাড়ম্বরে বিজয়োৎসবের শোভাযাত্রায় অশ্বারোহণ করিয়া প্রবেশ করেন তখন আনন্দে উন্মত্ত জনতা তাঁহাকে পরম সাদরে অভ্যর্থনা করিল। ইহার পর তাহারা শিবাজীকে দেবতার মত শ্রদ্ধার চোখে দেখিত।

যে মসজিদে হজরত মহম্মদের কেশ স্মৃতি চিহ্নরূপে সংরক্ষিত ছিল সেই মসজিদে ঐ কেশ সম্বলিত কৌটায় এবং চিত্রাঙ্কিত ভেনাস্ ও কিউপিডের সদা হাস্যমুখের সম্মুখে নতজানু হইয়া যে সব উলেমারা দিনের পর দিন তাঁহাদের অভিধানের অভিশাপ সম্পর্কিত সমস্ত ভাষা শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতেন তাঁহারই এখন শিবাজীর নিরাপত্তা এবং সুখ সম্পদের নিমিত্ত প্রার্থনা করতে লাগিলেন। "সোনালী বস্ত্রে সুশোভিত পাগড়ি" এবং "আপাদ লম্বিত কোট" পরিহিত যে সব ধনী ব্যবসায়ীরা এক কালে শিবাজীকে তাহাদের ধনরত্ন লুণ্ঠনকারী বলিয়া অভিশপ্ত করিতেন তাঁহারই এখন কারুকার্য্য মণ্ডিত মেহগিনি কাঠে প্রস্তুত বারান্দার চাতালে ঝুকিয়া মুঘলদিগের ধ্বংসাত্মক কার্য্যের উদ্ধার-কর্ত্তারূপে হর্ষধ্বনি করিয়া শিবাজীকে সোল্লাসে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে শিবাজী প্রাসাদের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলে ফোঁয়ারার চারিদিকে রোয়াকের উপর আসীন বড় বড় ওমরাহরা তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সুলতান নিজে অগ্রসর হইয়া বিজয়ী বীরের সম্মানার্থে ভোজ সভায় শিবাজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহ আমন্ত্রণ করেন। তখন হয়তো বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার এক চিত্র শিবাজীর মনে ভাসিয়া উঠে। পিতা তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া আসিলেন, আর তদা-নীন্তন সুলতান এক গ্রাম্য অমার্জ্জিত কিশোর বালকের সিংহাসনের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে অভিবাদনের জন্য তাচ্ছিল্যভরে অপেক্ষমান। যে মারাঠা বালক সেদিন অভিবাদন না করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল সে আজ ঐ প্রাসাদেই বহু আড়ম্বর ও জাঁকজমকের পরিবেশের মধ্যে অধিষ্ঠিত, আর সুলতান তাঁহার সম্মুখে ভীতি-বিহ্বল কলেবরে দণ্ডায়মান। উত্তর ভারতে আর এক সিংহাসন কক্ষে ঐ মারাঠা যুবকই আর একদিন ঐরূপ অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধী মনোভাব প্রদর্শন করেন; ঐস্থানেই আর একজন মারাঠা (১) আর একদিন সাম্রাজ্যের বিধি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রনের আদেশ দেন, আর বিনয়াবনত বাদশাহ তাঁহার উপর একান্ত নির্ভরশীল!

ভোজোৎসবের পর ভোজোৎসব! কখনও সৈন্য বাহিনী পরিদর্শন,

---

(১) বর্ত্তমান গোয়ালিয়রের মহারাজার পূর্ব্বপুরুষ সিন্ধিয়া।

কখনও শোভাযাত্রা, কখনও প্রমোদমেলা !

কিন্তু এত বিজয়োৎসব ও আমোদ প্রমোদের মধ্যেও শিবাজীর মুখ চিন্তাগ্রস্ত এবং উহাতে বিষাদরেখা। কাজের অজুহাত দেখাইয়া তিনি যত সত্বর সম্ভব বিজাপুর হইতে সরিয়া পড়েন। এইরূপ অপূর্ব্ব ভাগ্য পরিবর্ত্তনে যে কোন লোকের পক্ষে আত্মশ্লাঘায় গর্ব্বিত ও মহিমান্বিত বোধকরা স্বাভাবিক----যে বালক একদিন পিতার অবহেলিত, বিদ্রোহী বলিয়া বিতাড়িত, রাজ্যের চিরশত্রু বলিয়া গণ্য, তাহাকে কিনা আজ ছোট-বড় নির্ব্বিশেষে সকলে তোষামোদ ও স্তোকবাক্যে অভ্যর্থনা করিতে ব্যস্ত ! কিন্তু এই সব ঘটনার পরিবেশই শিবাজীকে পার্থিব জগতের চপলতা, পরিবর্ত্তন ও সমাপ্তি----এই চিন্তায় বিভোর করিয়া তোলে।

শিবাজীর দুঃসাহসী কাজ করার ক্ষমতা যে শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল তাঁহার আর একটি রোমাঞ্চকর কাজে ইহা প্রমাণিত হয়। পিতার পুনঃপুনঃ তিরস্কারে হতাশ হইয়া শাহজাদা মুয়জম হতাশ হইয়া পড়েন। শঠতা ও খলতাপূর্ণ কার্য্যের সম্বন্ধে পূর্ব্বে তাহার যে প্রতিকূল মনোভাব ছিল উহা পরিত্যাগ করিয়া তিনি শিবাজীকে আটক করিবার এক মস্ত ফন্দি আঁটিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে শিবাজী যখন বিজাপুর রাজ্যকে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছেন তখন তিনি মুঘল বাদশাহের বিদ্রোহী পুত্রকেও সম্রাটের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবেন। সুতরাং তিনি এক মিথ্যা বিদ্রোহের অভিনয় করিতে সংকল্প করিয়া শিবাজীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। একবার শিবাজীকে মুঘল শিবিরে পাইলে তাঁহাকে আবদ্ধ করা বেশ সহজ হইবে! কিন্তু কাজটি তত সহজ ছিল না। শিবাজীর গোয়েন্দারা শীঘ্রই সমস্ত বুঝিতে পারে। শিকার হইতে শিবিরে ফিরিবার পথে শাহজাদা একদিন এক বৃদ্ধ কৃষককে পথে দণ্ডায়মান দেখিতে পান। সে অতিশয় বিনম্রভাবে সেলাম করিয়া শাহজাদাকে এক ঘটি খাঁটি দুধ দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। মুয়জম তখন তৃষিত। তিনি আপ্যায়িত বোধ করিয়া দুধের পাত্র গ্রহণ করেন। দুধপান শেষ হইলে তিনি ঐ পাত্রের নীচে এক টুকরা কাগজ দেখিতে পান। উহাতে লেখা ছিল "আমার নাম শিবাজী। আমি আপনাকে

এই দুধের পাত্র উপহার দিলাম। আপনার যদি আর কিছু প্রয়োজন হয় আমাকে সংবাদ দিবেন। আমি সানন্দে আপনার সেবা করিব।" কাগজের লেখা পড়িয়া মুয়জম সম্মুখে তাকাইয়া মাত্র দেখেন যে ঐ তাকাইবা মাত্র দেখেন যে ঐ জাল কৃষক তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। শিবাজী যে মুয়জমের ষড়যন্ত্রের বিষয় সম্যকজ্ঞাত ছিলেন তাহা শাহজাদাকে জানাইবার ইহা হইল তাঁহার অপূর্ব্ব কৌশল। (১)

শিবাজী রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর বন্ধুরা তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটা নূতন রকমের গাম্ভীর্য্য এবং ব্যবহারে নম্রতা ও উদাসীনতার ভার লক্ষ্য করেন। কোনও একজন লোকের প্রতি হঠাৎ তাকাইয়া তিনি তাঁহার ভুল, দোষ ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চাহিতেন; কখনও বা আর একজন লোকের নিকট তাঁহার মৃত্যুর পর দেশেব অবস্থা কিরূপ হওয়ার সম্ভাবনা পুত্র শম্ভুজীর নির্বুদ্ধিতা, এবং স্বল্পভাষিনী কিন্তু রুক্ষ স্বভাবা রাণী সোয়িরার বিষয়ের উল্লেখ সোয়িবার আচরণ---প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করিতেন। রাজ-মহিষীর নানা প্রকার চক্রান্তে শিবাজী মনে খুব ক্লেশ অনুভব করিতেন। এই কারণেই ঐ রাণীর পুত্রের সাপক্ষে শম্ভুজীর চরিত্রে অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও শিবাজী তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকারিত্বের অধিকাব হইতে বঞ্চিত করিলেন না। কিন্তু এই সব ব্যাপারে শিবাজী অন্তঃপুর মহলে যাওয়া ত্যাগ করেন। বাণী সোয়িরা মর্ম্মভেদী উক্তি করিয়া বলেন, "বাল্যাবস্থা হইতে আমি বিশ্বস্তভাবে তাঁহার সেবা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আমার প্রতি এখন আর তাঁহার স্নেহ নাই। তাই তিনি আমার সংসর্গ ত্যাগ কবিয়া একাকী রাত্রিবাস করিতেছেন"। (২) কেহ তাঁহার প্রতি শিবাজীর আগেকার ভালবাসা ফিরাইয়া দিতে পারিলে তিনি তাহাকে পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু শিবাজীর ক্রমবর্দ্ধমান বিষন্নতা কিছুতেই দূর হইল না। তিনি গুরু রামদাসের নিকট এক চিঠিতে লেখেন, "ভগবান যদি এখন আমাকে তাঁহার পদতলে

---

(১) মানুচিচ

(২) এস্ এন্ সেন অনুদিত, "শিবদিগ্বিজয়"

আহ্বান করেন তবে বড়ই ভাল হয়। মাতৃদেবীর নিকট হইতে বিচ্ছেদ আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না" (১)

ক্রমশঃ শিবাজীর আসন্নমৃত্যুর অশুভলক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পা শ ফুলিয়া উঠায় তিনি অত্যন্ত বেদনা বোধ করেন এবং হাটিতে কষ্টবোধ করেন। তখন হইতেই তিনি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া শয্যা গ্রহণ করেন। তাঁহার হাঁটু ক্রমেই অধিকতর ফুলিয়া লাল হইয়া উঠে এবং তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হন। তেসরা এপ্রিল শিবাজী বেশ বুঝিতে পারিলেন যে তিনি দ্রুত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার মন্ত্রী এবং সেনাপতিরা শোকান্বিত চিত্তে শয্যার চারিপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া যায়। তিনি পার্শ্বচরদের দিকে তাকাইয়া তাঁহাদিগকে কাঁদিতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন যে উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে মৃত্যু সকলকেই আহ্বান করে; তাঁহাদের ধর্ম্মে আত্মা অমর বলিয়া অভিহিত।

রাজপ্রাসাদে রাণীর মহলে নানা প্রকার গোপন আশঙ্কার ও অশুভ ঘটনার আভাস পাওয়া যাইতেছিল বটে, কিন্তু শিবাজীর শয্যাকক্ষে অতি প্রশান্ত ভাব বিরাজিত। সেখানে সারিবদ্ধ ব্রাহ্মণগন শিবাজীর আত্মার মুক্তির জন্য আরাধনায় (১) নিমগ্ন শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী তাঁহারা শিবাজীকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেন আপনি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন?" মুমূর্ষ শিবাজী বলেন, "জন্মাবধি এখন পর্য্যন্ত আমি কখনও পাপকার্য্য করিতে বিরত হই নাই। আপনারা কি আমাকে পাপের দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেবেন?" যজমানের কল্পিত পাপের জন্য দায়ী প্রধান পুরোহিত তখন প্রার্থনান্তে বলেন, "কেবল নরহত্যা ও স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যাভিচার ভিন্ন আমি আপনার সমস্ত পাপ নিজ দেহে তুলিয়া লইয়া আপনাকে উহা হইতে মুক্ত করিয়া দিলাম।" ব্রাহ্মণগণ পুনরায় প্রার্থনায় রত হইলেন। শিবাজীর দেহ গঙ্গাজলে শুদ্ধ করিয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি যে হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান রহিয়াছেন ইহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ

---

(১) পূর্ব্বে উল্লিখিত পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

করেন। শিবাজী হিন্দুধর্মে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করার পরে তাহারা তাঁহার শয্যার চারিপার্শ্বে তুলসীপাতা ছড়াইয়া দেন (১)

পরক্ষণেই শিবাজীর মৃত্যু হয়।

অনুচরবর্গ শিবাজীর তরবারি তুলিয়া লইয়া উহা সাতারায় ভবানী-মন্দিরে প্রেরণ করে। তরবারিটি এখনও ঐ মন্দিরে সংরক্ষিত। মন্দিরের পরিচারকেরা উহা আভ্যন্তরীণ কক্ষ হইতে বাহির করিয়া দর্শকদিগকে দেখায়। খাপের মধ্য হইতে বাহির করিলে তরবারিটি অতি প্রকাণ্ড ও উহার ওজন এবং আয়তনের জন্য উহা আপাতঃ দৃষ্টিতে বাগমানান শক্ত বলিয়া মনে হয়। কৃত্রিম ফুল ও কাঁচের ঝাড় লণ্ঠনে শোভিত মন্দিরের সাজ সজ্জার সহিত তুলনায় ঐ তরবারীর অতি সাদাসিধা সেকেলে গঠনের বৈষম্য সহজেই ধরা পড়ে। সম্রাট স্বার্লামেনের (Charlemogne) সমসাময়িক জুয়ইযুস্ (Joyeuse) ও ডুরাণ্ড (Durand) এর নাম এবং আমাদের (খৃষ্টান ধর্ম্মে রোলাণ্ড ও অস্‌কালন (Askalon) এর কথা যেমন মধ্যযুগের ইউরোপীয় ভ্রাম্যমান গায়কদের মুখে মুখে শোনা যাইত, তেমনই শিবাজীর কাহিনী মারাঠাদের চারণকবিদের মুখে শোনা যায় (২)

শিবাজীর মৃত্যুসংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে আওরঙ্গজেবের মুখে আনন্দের আভাস দেখা যায় বটে, কিন্তু এই সময় তিনি শিবাজীর অসাধারণ বীরত্বের উল্লেখ করিয়া বলেন, "তিনি ছিলেন একজন মহাবীর নেতা। একমাত্র তাঁহারই পক্ষে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইয়াছে। দীর্ঘ উনিশ বৎসর আমার সৈন্যবাহিনী তাঁহার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহার রাজ্যের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে।" (ওর্ম্ম)

মুঘলদিগের সাধারণ মনোভাব ঐতিহাসিক কাফি খাঁ স্পষ্টতর ভাষায়

---

(১) মৃত্যুশয্যায়. মারাঠাদিগের, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম্ম সম্বন্ধে *Tribes and Castes of the Bombay Presideary* নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।
(Bom. Govt. Press and. Bom. Gagette)

(২) Sallivan, quoted in Parasinis "*Mahabaleshwar*"

বর্ণনা করিয়াছেন। শিবাজীর মৃত্যুসংবাদ শুনিবামাত্র তিনি সবিস্ময়ে লেখেন, "কাফের জাহান্নমে গিয়াছে।" (১)

এই মহাবীর এবং অসাধারণ মহারাষ্ট্রনেতার মৃত্যু যে সত্যই সম্ভব হইতে পারে ইহা বিশ্বাস করিতে ইংরাজদিগের বহু সময় লাগিয়াছিল। বোম্বাইয়ের ইংরাজ কুঠি সুরাটের কুঠিতে চিঠি লিখিয়া জানান, "এখানে এক সংবাদে প্রকাশ যে শিবাজী মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু সুরাট কুঠি হইতে ৭ইমে তারিখের চিঠি অনেক বেশী সতর্কতাপূর্ণ। তাঁহারা লেখেন, "সব জায়গা হইতেই শিবাজীর মৃত্যু সত্য বলিয়া সংবাদ আসিতেছে। কিন্তু এখনও কেহ কেহ ঐ সংবাদের প্রকৃত সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান। কারণ, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ বহুবার রটিয়াছে। সুতরাং আরও সঠিক সংবাদ না পাইলে আপনারা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবেন না।"

শিবাজীর মৃত্যুর আট মাস পরেও বোম্বাই কুঠির এক চিঠির ভাষা এইরূপ :—"এতবার শিবাজীর মৃত্যুসংবাদ সম্বন্ধে অলীক রটনা করা হইয়াছে যে কেহ কেহ তাঁহাকে অমর বলিয়া মনে করিতেছেন। যতদিন না তাঁহার রাজ্যের সম্পদ ও সমৃদ্ধির অবনতি আমারা স্বচক্ষে দেখিতে পাইব ততদিন পর্য্যন্ত তাহার মৃত্যুর সংবাদ বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ ইহা ঠিক যে তাঁহার মৃত্যুর পরে এমন কেহ থাকিবে না যে শিবাজীর ন্যায় কৃতিত্বের সহিত রাজ্যের সমৃদ্ধি অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবে।"

কিন্তু শিবাজী মহারাজা সত্যই মৃত। রায়গড় প্রাসাদে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনে যিনি একদিনের জন্যও বিশ্রাম করেন নাই সেই কর্ম্মযোগী নেতা····নিশ্চল ও নীরব।

বিশাল জনতা আর্ত্তনাদ করিয়া মহারাষ্ট্রের মুক্তিদাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। পুরোহিতদিগের মন্ত্রোচ্চারণ, রাজপ্রাসাদের অধিবাসীদের শান্ত শোক প্রকাশ, ভূত প্রেত দূরে রাখিবার জন্য মুঠি মুঠি সরিষা

(১) এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু সাময়িক উপযোগী উক্তির ভিতর শিবাজীর মৃত্যুর দিনের প্রতি বৈশিষ্ট্য আরোপ ও বাক্যাংশ গঠন দ্রষ্টব্য।

নিক্ষেপন, মধ্যে মধ্যে "জয় শিবাজী মহারাজার জয়ে"র ধ্বনি—প্রভৃতি সমুদয় হিন্দুশাস্ত্রীয় অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অনুষ্ঠান পালিত হয়। এদিকে প্রাসাদের বাহিরে উচ্চ ভূমিতে এরূপভাবে শ্মশান প্রস্তুত করা হয় যাহাতে চিতার আগুন বহুদূর হইতে দেখা যায়। এইরূপ অবস্থার মধ্যে কাঠ কাটা ইত্যাদির শব্দ চারিদিকে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু শিবাজী যে ক্ষুদ্র কক্ষে শায়িত ছিলেন সেখানে ঐ সব শব্দ বিশেষ প্রবেশ করে নাই। তাঁহার বিছানার গদি সুগন্ধ বিল্বপত্রে আচ্ছাদিত আর গাত্রাবরণ গোলাপের পাপড়িতে শোভিত। যে চোখের দীপ্তির সম্বন্ধে সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ মন্তব্য করিতেন উহা চিরতরে নির্ব্বাপিত। যে মুখ মণ্ডল প্রায় সর্ব্বদাই হাসিতে উদ্ভাষিত হইত উহা এখন সরু ও আনত। যে জিহ্বার নিস্বতবাণী এতদিন সকলকে বিমুগ্ধ, আশ্বাসিত ও অনুপ্রেরিত করিত উহার নীচে একখানা পান্নার টুকরা রক্ষিত।

অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত অনুচরেরা শিবাজীর দেহ একখানা শ্বেত বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে। শিবাজীর মুখমণ্ডলের উপরিস্থ বস্ত্রে একটি গোল ছিদ্র করা হয় এবং উহার মধ্য দিয়া কয়েক ফোটা পবিত্র জল তাঁহার মুখে দেওয়া হয়। শোকের চিহ্নস্বরূপ অনুচরেরা তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করে এবং নখ খুব ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলে। মৃতের বিধবাদিগের কর্ত্তিত কেশ তাঁহার পদতলে রাখিয়া তাঁহার দেহের উপর পুনরায় গোলাপের পাপড়ি ছড়াইয়া দেওয়া হইল। তারপর তাঁলাকে একটি অতি বৃহৎ পাল্কীতে করিয়া আবদ্ধ অন্ধকার ঘর ও শোকার্ত্ত নারীদিয়গর নিকট হইতে দূরে প্রাসাদের বাহিরে অপরাহ্ণের ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ আলোতে আনয়ন করা হয়। এপ্রিল মাসের তীব্র রোদে তীক্ষ্ণ ঘাসগুলি গেরুয়া-বর্ণ, পাতাহীন রৌদ্রদগ্ধ নগ্ন বৃক্ষ শ্রেনী। প্রাসাদের প্রাচীর হইতে পাহাড়ের উপরে কেবল ধূসর রঙের পাথর, গাঢ় নীল পর্ব্বতশিখর এবং ছায়া সমন্বিত গিরিসঙ্কট ও বহুদূরে বিশাল সমুদ্রের ঝক্‌মকানি দেখা যাইতে ছিল। শোকাতুর জন সমুদ্রের মধ্য দিয়া শিবাজীর শবদেহ যখন বহন করা হইতেছিল তখন হিন্দুদিগের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সকলে কণ্ঠরোধ করিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বনের মধ্যে ঝড়ের হাওয়ার যেরূপ শব্দ হয় জনতার দীর্ঘশ্বাসে প্রায় সেইরূপ শব্দ

শোনা যাইতে লাগিল।

মস্তক উত্তর দিকে রাখিয়া শিবাজীর দেহ চিতায় স্থাপন করা হয়। উত্তরে মহাকাল তাহার পরিণীতা বধূ হৈমবতীর সহিত সগৌরবে অধিষ্ঠিত। চিতা প্রদিক্ষণ করিয়া সকলে ধান ও নারিকেল ছড়াইয়া দেয়। তারপর চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হয়। দেহ ভস্মীভূত হওয়ার পর শোকার্ত্ত জনতা আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিবার অনুমতি পায়। তখন তাহারা মুখে হাত রাখিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল। এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ; আকাশে তারার মালা।

সমাপ্ত